পুরোনো ঢাকার সাংস্কৃতিক জীবনের কয়েকটি দিক:

উনিশ ও বিশ শতক

এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে এম ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

গবেষক

শায়লা পারভীন

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়

465980

Dhaka University Library

465980

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

B
RB
954.922
PAP

s. P

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা-পত্র

'পুরোনো ঢাকার সাংস্কৃতিক জীবনের কয়েকটি দিক: উনিশ ও বিশ শতক' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এই অভিসন্দর্ভের কোন অংশ কোন আকারে কোন ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা প্রকাশনার জন্য অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা প্রতিষ্ঠানে আমি উপস্থাপন করিনি। অভিসন্দর্ভটি এম. ফিল. ডিগ্রির নিমিত্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করলাম।

স্বাক্ষর

শায়লা পারভীন

(শায়লা পারভীন)
এম. ফিল. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নাম্বার: ৪৪/২০০৪-০৫
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

465980
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, শায়লা পারভীন, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে "পুরোনো ঢাকার সাংস্কৃতিক জীবনের কয়েকটি দিক: উনিশ ও বিশ শতক" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছে। অভিসন্দর্ভটির মৌলিক উপকরণ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহিত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত এবং গবেষকের একক গবেষণার ফসল। আমার জানা মতে অন্য কোন ব্যক্তি কোনপর্যায়ে এই গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না। গবেষক এই গবেষণাকর্মটি পূর্ণাঙ্গভাবে বা আংশিকভাবে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করেনি। আমি অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পান্ডুলিপি পাঠ করেছি এবং তা ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য জমা দেওয়ার সুপারিশ করছি।

465980

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

স্বাক্ষর

(ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন)
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রসংশা আল্লাহ্ সুবহানাহুতা'য়াল্লার যিনি আমাকে এই অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করার শক্তি ও সামর্থ্য দান করেছেন। পুরোনো ঢাকার আদিবাসী সমাজে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। মূলতঃ এই দায়বদ্ধতা ও আগ্রহ থেকেই আমার ঢাকা বিষয়ক গবেষণার সূত্রপাত। এই আগ্রহকে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণায় রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে ভূমিকা রেখেছেন আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. মুনতাসীর মামুন। ঢাকার সংস্কৃতি নিয়ে নানামুখী ধারণা তৈরি, সঠিক দিক নির্দেশনা, তথ্যের নিয়মতান্ত্রিক বিশ্লেষণ এবং সার্বিক সহযোগিতা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। তাঁর অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদের কারণেই আমার গবেষণা কর্ম অভিসন্দর্ভ আকার গ্রহণ করতে পেরেছে। স্যারের প্রতি রইল অপরিসীম কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। বিভিন্ন সময় নানা ধরণের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য প্রিয় শিক্ষক ড. রাণা রাজ্জাকের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ এবং ঋণী।

মাঠ পর্যায়ে তথ্য ও আলোকচিত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যারা স্বতস্ফূর্তভাবে সহায়তা করেছেন তাদের মধ্যে বিরেশ চন্দ্র সাহা, বিদ্যুত কুমার নাগ, আনন্দময় সুর, তোরনী ঘোষ, নেপাল বাবু, রামানন্দ দাস, সুমন্ত চন্দ্র দাস, সুধারানী সুর, সাকিয়া জামাল, বশিরন বেগম, শাহীন বেগম, নাসিমা পারভীন, আফসানা, আহাম্মদি আক্তার, আরফাননেসা, আয়মননেসা, নুরুন্নাহার বিবি, গুলশানারা, হাজি আলতাফ হোসেন, আনার বেগম প্রমুখ অন্যতম। তাঁদের প্রতি সবিশেষ আমি ঋণী।

লেখক রফিকুল ইসলাম রফিক আমাকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞ শিল্পপতি আনোয়ার হোসেন, শাহিন মালিক, নাজির হোসেন নাজির, ঢাকা কেন্দ্রের পরিচালক আজিম বক্স, হাজি আবদুস সালাম ও আলাউদ্দিন মালিকের প্রতি। তাঁদের সমর্থন ও উত্তরোত্তর সহযোগিতা আমাকে এগিয়ে যাওয়ার পাথেয় দিয়েছে।

গবেষণার স্বার্থে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কাজ করেছি। সে সকল গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং যাঁরা গবেষণা সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ খুঁজে পেতে, কোন কোন ক্ষেত্রে ফটোকপির কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। তথ্য সংগ্রহকারী গ্রন্থাগারের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের সেমিনার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, জাতীয় গণ গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, ঢাকা কেন্দ্র গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার, আজাদ মুসলিম পাবলিক লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী গ্রন্থাগার, ন্যাশনাল লাইব্রেরী কলকাতা, বাংলা আকাদেমি কলকাতা।

কারিগরী সহায়তা প্রদানের জন্য আমার পরিজন মির্জা আবদুল খালেদ, আশা, স্থপতি সাবিহা তুন নাহার, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক সাঈফ হোসেন এবং আমার কন্যা জারিন জাভেরিয়ার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

গবেষণায় মূল্যবান সহযোগিতা করেছেন আমার প্রিয় স্বামী জাহিদ হোসেন। আমার কন্যাদ্বয় জারিন জাভেরিয়া ও জায়নাব জুয়াইরিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অভিসন্দর্ভ রচনাকালীন সময়ে আমার সকল ব্যস্ততা মুখ বুজে সহ্য করার জন্য। পরিশেষে আমার মা সেলিমা রহমান ও আমার জন্ম শহর ঢাকার কথা স্মরণ করছি, আমার গবেষণা প্রচেষ্টায় নীরবে উৎসাহ ও সমর্থন যুগিয়ে যাওয়ার জন্য।

শায়লা পারভীন

ঢাকা, অক্টোবর, ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্রঃ

অতিসন্দর্ভে ব্যবহৃত অপ্রচলিত শব্দাবলীর অর্থ	১-১১
প্রথম অধ্যায়	১২-৩৬
তত্ত্ব-কাঠামো ও নির্ধারকসমূহ	
দ্বিতীয় অধ্যায়	৩৭-১১৮
জন্ম সংক্রান্ত লোকাচার	
তৃতীয় অধ্যায়	১১৯-১৮৩
বিবাহ সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান	
চতুর্থ অধ্যায়	১৮৪-২৩৫
মৃত্যু সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান	
পঞ্চম অধ্যায়	২৩৬-২৪৪
উপসংহার	
পরিশিষ্ট-১	২৪৫
পরিশিষ্ট-২	২৪৬
পরিশিষ্ট-৩	২৪৭
পরিশিষ্ট-৪	২৪৮
পরিশিষ্ট-৫	২৪৯-২৫০
পরিশিষ্ট-৬	২৫১-২৫৯
পরিশিষ্ট-৭	২৬০
পরিশিষ্ট-৮	২৬১
পরিশিষ্ট-৯	২৬২
পরিশিষ্ট-১০	২৬৩-২৬৪
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	২৬৫-২৭৬
তথ্যপ্রদানকারীর তালিকা	২৭৭-২৮১

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রমালা	২৮৩-৩৬৩
জন্মসংক্রান্ত	২৮৩-২৯৮
মুসলিম বিবাহ	৩০০-৩৩৩
হিন্দু বিবাহ	৩৩৪-৩৬৩

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত অপ্রচলিত শব্দাবলীর ব্যাখ্যাঃ

অন্নপ্রাশন- শিশুদের প্রথম আহার্য গ্রহণের অনুষ্ঠান, মুখে ভাত।

আইপান- ময়দা বা চালের গুড়া, পানি ও হলুদের মিশ্রণ।

আইপানের ছাপ- আইপান মাখা হাতের মাঙ্গলিক ছাপ।

আইরা- এক ধরণের অসুখ। মাতৃদুগ্ধ পানকারী শিশুর মা অন্তঃসত্ত্বা হলে সেই শিশুর এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।

আউঝাঘর- সূতিকাগৃহ বা প্রসব গৃহ।

আগকা ঠোয়া- Bed Sore.

আগভাত- ভাতের হাঁড়ি থেকে প্রথম তোলা ভাত।

আগুনে মুছুরি- চালের তৈরি প্রদীপ বিশেষ।

আটাইয়া নাইয়র- আট দিনের জন্য পিত্রালয়ে নববধূর বিয়ের পর দ্বিতীয়বার গমন।

আড়ালি পাখি- কাল্পনিক পাখি।

আতপান- পানচিনি।

আবশ্যিক- মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ অন্তবর্তী সময়কালে পালনীয় অশৌচ।

আবির- লাল রং ও সিঁদুরের মাঝামাঝি রং।

আভভিস- মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ অন্তবর্তী সময়কালে পালনীয় অশৌচ।

আভাস- মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ অন্তবর্তী সময়কালে পালনীয় অশৌচ।

আয়ো- সধবা।

আয়োস্থ- সধবা।

আলতাপাত্তা- আলতায় রাঙ্গানো তুলা।

আসমনের জল- হিন্দুদের পূজাদি কর্মের পূর্বে দেহশুদ্ধি করণের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত জলের সাথে অন্যান্য উপাচার মিশিয়ে বিধি অনুযায়ী মন্ত্র পড়ে যে পবিত্র জল তৈরি করে।

আহাদনামা- আরবদের লেখা ধর্মীয় কবিতা।

ইন্দ্রহলুদ- শাঁখারীদের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান।

Dhaka University Institutional Repository

ঈদ-তেহার- ঈদ-পার্বণ।

উকিল বাপ- মুসলমানদের বিয়ের প্রধান স্বাক্ষী।

উত্তর শিরানা- মৃতাসন্ন ব্যক্তিকে উত্তর দিকে মাথা আর দক্ষিণ দিকে পা দিয়ে শোয়ানো।

একজ্বালা ভাত- একজ্বালে রান্না করা জাউভাত বা সবজি খিচুরি।

ওখরা- গুড় মিশ্রিত খই।

ওভিস- মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ অন্তবর্তী সময়কালে পালনীয় অশৌচ।

কলার খোল- কলাগাছের কান্ড দিয়ে তৈরি এক ধরণের পাত্র। এর মধ্যে মৃতের নামে উৎসর্গকৃত পিন্ড রাখা হয়।

কাংনা- রাখী।

কাঁচাপেট- গর্ভোৎপত্তির প্রথম তিন-চার মাস।

কাঙ্গোই দাঁত- চিরুনির ন্যায় ফাঁকা ফাঁকা দাঁত।

কাচপড়া- এক প্রকার বিশেষ রক্ষাকবজ। একটি কালো কায়তুনে বেশ কয়েকটি জায়গায় দোয়া-কালাম পড়ে ফুঁ ও গিঁট দিয়ে কাচপড়া তৈরি করা হয়।

কান ছেদাই- কান ফুড়ানি।

কানাভূত- অশরীরী প্রেতাত্মা।

কারা- এক ধরণের পথ্য।

কাল অশুচ- হিন্দুদের পিতামাতা ইত্যাদি গুরুজনের মৃত্যুর পর বর্ষব্যাপী পালনীয় অশৌচ।

কাল রাইত- নবজাতক বা নবদম্পতির জন্য অশুভ রাত।

কাল্ঠুটি- কালো ঠোটের অধিকারী নারী।

কালদৃষ্টি- ভূত-শয়তান ও অশুভ আত্মার লুব্ধ দৃষ্টি।

কালাশুচ- হিন্দুদের পিতামাতা ইত্যাদি গুরুজনের মৃত্যুর পর বর্ষব্যাপী পালনীয় অশৌচ।

কুমোরের চাক- এক ধরণের পোকা বিশেষ।

কুর্সী নামা- বংশ পরিচয়।

কুলিয়া- ধোপা ও গোয়ালাদের বিবাহ পরবর্তী গঙ্গা পূজার উপাচার।

কুশাসন- ধান গাছের খের দিয়ে তৈরি এরপ্রকার মাদুর বিশেষ।

Dhaka University Institutional Repository

কোরা- এক ধরণের কাল্পনিক দন্ড বিশেষ যা লোহার চাইতে শক্ত আর আগুনের চেয়েও গরম বলে ধারণা করা হয়।

খবরানা পিঠা- বিয়ের পর দ্বিতীয় বার কনেকে নাইয়র নেয়ার খবর জানিয়ে তার পিত্রালয় থেকে শ্বশুড়ালয়ে যে পিঠা পাঠানো হয়।

খাটোলা- বাঁশের তৈরি শব বহনকারী মই বা মাচা।

খেলকা- পুরাতন শাড়ির তৈরি নবজাতকের পরিধেয় বস্ত্র।

গয়াগঙ্গা- ঋষিপুত্র কর্তৃক মৃতাত্মার চূড়ান্ত মুক্তির উদ্দেশ্যে শেষ পিন্ডদান অনুষ্ঠান।

গানাওয়ালি- শাঁখারীদের সামাজিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনকারী নারী।

গাল হাসা- গালে টোল পরা।

গীতগাওনি- গানাওয়ালি।

গুরিদ- বার্তা বাহক, ঢাকার পঞ্চায়েতের অন্যতম সদস্য।

গোদভারাই- শ্বশুড়ালয়ে নববধূর প্রথম রজোদর্শন উপলক্ষে পালিত অনুষ্ঠান।

গোলগোলা- এক ধরণের পিঠা। স্থানীয়দের অনেকে একে গুলগুলা-ও বলে থাকে।

গোসলয়ালা- লাশকে গোসল প্রদানকারী পুরুষ।

গোসলয়ালি- লাশকে গোসল প্রদানকারী নারী।

ঘাটকাম- হিন্দু সমাজে পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়ের মৃতাশৌচ শেষ হওয়ার পর নদীর ঘাটে নখ দাড়ি চুল কাটা, স্নান ইত্যাদি কার্য সম্পাদন।

ঘাটপিন্ড- মৃতের উদ্দেশ্যে নদীর ঘাটে পিন্ডদান।

ঘোড়ার নাল- ঘোড়ার ক্ষুর।

ঘোলা প্রসাদ- নারায়ণ পূজার মূল প্রসাদ।

চংগ- শব বহনকারী বাঁশের তৈরি মই বা মাচা

চতুর্থা- মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনে মৃতের বিবাহিত কন্যা কর্তৃক পালিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান।

চাপড়ি- চাল-ডাল পাটায় বেটে পেয়াজ, মরিচ, হলুদ সহযোগে তৈরি রুটি জাতীয় খাবার।

চাহারাম- মৃত্যুর পর চার দিনের অনুষ্ঠান।

চিতাপুরুব- শবদাহের প্রাক্কালে শ্মশানে মৃতের উদ্দেশ্যে পিন্ডদান।

চিরল দাঁত- কাঙ্গোই দাঁত।

Dhaka University Institutional Repository

চুল তোলনী- শিশুর মাথা মুন্ডন অনুষ্ঠান।

চৈতালি- চৈত্র মাসে জন্ম নেয়া শিশু।

চোখাচোখির মতি- কালো রঙয়ের মধ্যে সাদা ফোঁটা অঙ্কিত এক রকমের বিশেষ পুতি যা শিশুদের কুনযর থেকে রক্ষা করে।

চোঙ্গা- মই।

চোরাচুন্নী- শিশুখাদক অশুভ আত্মা।

চোরাভাত- মুসলমান পরিবারে পরিজনের মৃত্যুর উনিশ বা একুশদিনে দিন মৃতাত্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত খাবার।

ছইরা পূজা- ষষ্ঠীপূজা।

ছইরা রাইত- ছয় ষষ্ঠীর রাত।

ছটফটানি ব্যারাম- মৃগী রোগ।

ছটি উঠা- প্রসবনিত শুচিতা লাভ।

ছটি- প্রসবজনিত অশৌচ, সূতিকাশৌচ।

ছটিঘর- সূতিকাগৃহ বা প্রসব গৃহ।

ছটিয়ালি- সূতিকাগৃহে প্রসূতি ও নবজাতকের পরিচর্যাকারী, প্রসূতি।

ছয় ষষ্ঠী- প্রসবের ষষ্ঠ দিনের রজনীতে অনুষ্ঠেয় হিন্দুদের বিশেষ মঙ্গলকর্ম।

ছান- স্নান।

ছুত ছাওয়া- অপবিত্র দেহের ছায়া।

জননাশৌচ- সূতিকাশৌচ, হিন্দু শাস্ত্র বিধানে সন্তান জন্মের ফলে পালনীয় অশৌচ।

জনম পায়খানা- সদ্যোজাত শিশুর কালো বর্ণের আঠালো মল।

জয়জোকার- হিন্দুদের মাঙ্গলিক ধ্বনি।

জাবরা পেট- প্রসূতির স্ফিতপেট।

জামাই খেদাইনা পিঠা- মালপোয়া।

জিওল মাছ- যে সকল মাছ সহজে মরে না, বহুদিন বাঁচে এবং জিইয়ে রাখা যায়, সে সকল মাছকে জিওল মাছ বলা হয়। শিং, মাগুর, কৈ, টাকি, সইল মাছ হল জিওল মাছের অন্তভূক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

জিয়স মানুষ- যে নারীর গর্ভে আসা প্রথম দ্রূণের গর্ভপাত ঘটেনি অথবা প্রথম সন্তান মারা যায়নি, তাকে জিয়স মানুষ বলা হয়।

জুড়াবন- খোপায় পরার অলংকার।

জোকার- জয়জোকার; হুলুধ্বনি।

জোড়া ওপাস- বিবাহ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নারায়ণ পূজায় বর/কনের মা-বাবা'র একত্রে উপাস থাকা।

জোড়া কায়েম- দীর্ঘস্থায়ী দাম্পত্য জীবন।

জোড়া তেলাই- বর ও নববধূকে একত্রে বিয়ের কুলা দিয়ে আশীর্বাদ করা।

টোকাটাকি- এক ধরণের প্রতিরক্ষামূলক লোকাচার যা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে ব্যক্তি বিশেষ নযরমুক্ত হয়।

টোটকা- টোটকা একটি লোকাচার যা সম্পাদনের মধ্য দিয়ে কার্যসিদ্ধ হয়।

টোপা- মাটির ছোট হাঁড়ি।

ডাক শেখানো- মুলমানদের বিয়ের পরদিন নববধূর সঙ্গে বরের আত্মীয়দের পরিচয় পর্ব।

ডালনা- দুই বা পাঁচ রকম সবজি দিয়ে রান্না করা তরকারি।

তালকিন- দীক্ষা, শিক্ষা, ধর্মোপদেশ।

তিনকুল- সুরা ইখলাস তিনবার পাঠ করা।

তিন দেনকা ফুল- মুসলমান পরিবারে মৃত্যুর পর পালিত তিন দিনের অনুষ্ঠান।

তিনোসোন্ধ্যা- মাগরিবের আযানের সময়।

তেতালিয়া- উপর্যুপরি তিন কন্যা সন্তানের পর জন্ম নেয়া পুত্র সন্তান। বর্ণ ও স্থানভেদে এদেরকে তেতুইলা-ও বলা হয়ে থাকে।

ত্রয়ো- সধরা।

থালখিলানি- বালিকাবধূর প্রথম রজোদর্শন উপলক্ষে শ্বশুড়ালয়ে পালিত লোকাচার।

থুকথুকি- ব্যক্তিবিশেষ ও অপদেবতার অনিষ্টকারী কুদৃষ্টি প্রতিরোধে ইশারায় থুথু ছিটানো।

দধিমঙ্গল- শ্রাদ্ধের পরদিন ঋষিপুত্র কর্তৃক আচরিত অনুষ্ঠান বিশেষ।

দশামঙ্গল- সাহা ও শাঁখারীদের বিয়ের সর্বশেষ অনুষ্ঠান।

দাউখা- যার দাঁতের মাড়ি অপেক্ষাকৃত উচু।

দাওয়ান- আচকান।

দানদাহেজ- যৌতুক।

Dhaka University Institutional Repository

দায়িক- ঋণ।

দুধের পট্টি- জ্বরের মাত্রা কমাতে এক প্রস্থ কাপড় স্তননিশ্রিত দুধে ভিজিয়ে শিশুর মাথার তালুতে স্থাপন।

দুলদুল ঘোড়া- মহরমের মিছিলে সজ্জিত ইমাম হোসেনের প্রতীকী ঘোড়া।

ধরা- মৃতের পুত্ররা মৃতাশৌচকালে কাপড়ের ফিতায় লোহার চাবি দেয়া যে মালা গলায় পরিধান করে।

ধুমধাম- সাড়ম্বরে মুসলমানির অনুষ্ঠান উৎযাপন।

নযরগযর- অশুভ বা লুব্ধ দৃষ্টি।

নযরগোটা- এক রকম গাছের গোটা বিশেষ।

নয়নতারা- কাজলদানি।

নয়য়াশা- গর্ভবতীর নয় মাসের সাধভক্ষণ।

নাওথি- গোয়ালাদের বিয়ের নয় দিনের দিন উদ্‌যাপিত অনুষ্ঠান।

নাওবার- ঘাটকাম।

নাওয়াশা- নয়য়াশা।

নানদোসি- ননদের স্বামী।

নায়নাতকুর- নাতি নাতনি।

নার- জরায়ু; নাড়ি।

নালান- গোসল।

নালানয়ালা- লাশকে গোসল প্রদানকারী পুরুষ।

নালানয়ালি- লাশকে গোসল প্রদানকারী স্ত্রী।

নিমগুকা রুটি- বাকরখানি।

নুরনামা- উর্দুতে লেখা ধর্মীয় উপাখ্যান।

নেউতা- নিমন্ত্রণ।

নেউতাবাটা- নিমন্ত্রণে ব্যবহৃত রূপার বাটা।

নেহারি- বিয়ের পরদিন সকালে কনের শ্বশুড়ালয়ে উকিলবাপ কর্তৃক প্রেরিত নাস্তা।

পঞ্চ আমরিত- গোয়ালা সমাজে গর্ভবতীর গর্ভ শোধনের পঞ্চম মাসে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের তৈরিকৃত চর্ণমিত পান করানোর অনুষ্ঠান।

পনির রুটি- পনির মিশ্রিত বাকরখানি।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ আদমি- কথাপাকা অনুষ্ঠান।

পাঁচ ফল- ঋষি, শাঁখারী ও মুসলমান সমাজে প্রথম গর্ভধারণের পঞ্চম মাসে গর্ভবতীর জন্য সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান বিশেষ।

পাঠ্‌ঠা- চুমকির তৈরি ফিতা।

পান্নি কাগজ- পাতলা স্বচ্ছ কাগজ।

পারের কড়ি- পরপারে যাওয়ার পূণ্যরূপ কড়ি।

পিন্ড- হিন্দুদের পিতৃলোক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্নের দলা বা গ্রাস।

পিন্ডদান- হিন্দুগণ কর্তৃক পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধে মন্ত্রপূত অন্নপিন্ড অপর্ণ।

পিন্ডদানকারী- হিন্দু সমাজে মৃতের উদ্দেশ্যে পিন্ডদান করে যে; পিন্ডদানের অধিকারী।

পূর্ণবেয়া- ধোপাদের মাঝে প্রথম গর্ভধারণের পঞ্চম মাসে গর্ভবতীর জন্য সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানবিশেষ।

পেলেন্দি- বর-কনের গায়ে মাখানো হলুদ ঝড়ে পরার পর সেই পরিত্যক্ত হলুদের মুষ্টি।

পোলাতি দাওয়াই- সূতিকা রোগের ভেষজ ঔষধ।

ফাপা- Oral Ulcer.

ফিরা নাইয়র- কনের পিত্রালয়ে প্রথম নাইয়র শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্বশুড়ালয়ে ফিরে আসার অনুষ্ঠান।

ফিরানি- ফিরা নাইয়র।

ফিরোল্টা- ফিরা নাইয়র।

ফেটা- পাগড়ী।

বচ্ছরান্তি- মৃত্যুবার্ষিকী।

বছরান্তি- মৃত্যুবার্ষিকী।

বাজি মারা- বিজয় অর্জন।

বাতপাক্কা- পানচিনি; কথাপাকা।

বাদুকের ওসুদ- কালদৃষ্টিতে আক্রান্ত নারীর প্রতিষেধক ঔষধ।

বামনপোতিয়া- গলায় নাড়ি পেঁচানো অবস্থায় ভূমিষ্ঠ শিশু।

বালাবালি- গায়ে হলুদ।

বিশাবিবি- বিশ সন্তানের জননী।

বিসমিল্লানে সাবাক- বিসমিল্লাহখানি; মুসলমান শিশুর ধর্মীয় কেতাব পাঠের সূচনা অনুষ্ঠান।

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধি- মৃতের জন্য অনুষ্ঠিত হিন্দুদের আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ।

বৈতরণী- হিন্দু মতে স্বর্গ ও মর্ত্যের সীমানায় অবস্থিত একটি নদী।

বৈষ্ণব মেলা- জননাশৌচ ও মৃতাশৌচ থেকে ঋষি পরিবারের শুদ্ধিতা লাভের অনুষ্ঠান।

বোরশি- মৃত্যুবার্ষিকী।

ভাজাপোড়া- সাহা'দের মাঝে প্রথম গর্ভধারণের পঞ্চম মাসে পালিত সাধভক্ষণ।

ভিগারুটি- এক ধরণের খাদ্য বিশেষ।

মঙ্গলবাইরা- মঙ্গলবারে জন্ম নেয়া শিশু।

মৎসমুখী- সাহা ও শাঁখারী পুত্র কর্তৃক পালিত শ্রাদ্ধের পরের দিনের অনুষ্ঠান।

মৎস্যমুখীতা- মৃতাশৌচকাল অতিবাহিত হলে মৃতের পরিজনের মাছ খাওয়ার অধিকার লাভ।

মরণঠোসা- Bed Sore.

মরাবাড়ি- যে গৃহে ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যু ঘটে।

মাইয়্যেত- লাশ।

মাচ্ছিভাত- মাছভাত।

মাড়োয়া- চতুষ্কোন বিশিষ্ট মঞ্চ যেখানে বিয়ের বিভিন্ন মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়।

মারোচা- মারোয়া।

মালসা- পিতলের ছড়ানো পাত্র।

মাহ্‌রাম- স্বামী বা স্ত্রী এবং যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ।

মিঠাভাত- চাল, ঘি, মাওয়া ও গুড় সহযোগে তৈরি এক ধরণের খাবার বিশেষ।

মুখাগ্নি- হিন্দুদের শবদাহকালে শাস্ত্রবিধি অনুসারে শবের শিরঃস্থানে (মুখে নয়) অগ্নি দান বা স্পর্শ।

মুন্দানা- সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে শিয়াদের পালিত অনুষ্ঠান।

মুর্দার খাবার- তিন সবজি সহযোগে রান্না করা তরকারি।

মৃতাশৌচ- মৃত্যুর পর যে অশৌচ পালন করা হয়।

মৃতাশৌচকাল- মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ অন্তবর্তী সময়কালে পালিত অশৌচ।

মেরাসিন- ঢাকার সামাজিক অনুষ্ঠানে অন্দরমহলে সংগীত পরিবেশনকারী নারী।

মোতাসা- ঘটক।

মোনাক্কা- বড় আঙ্গুরের শুকনা কিসমিস।

Dhaka University Institutional Repository

রাইঢ়া কাপড়- বিধবার পরিধেয়।

রাঢ়ি- বিধবা।

রাঢ়ি কাপড়- বিধবার পরিধেয়।

রামাবলী- হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চাদর।

লগ্‌গন- গায়ে হলুদ।

লাগান- গায়ে হলুদ।

লাল ট্যাবলেট- ঠোটের প্রসাধনী।

লুটকি- চুল্লীতে পোড়া কাঠ।

ল্যাটপেটি- বিপদাপদ।

শনিবাইরা- শনিবারে জন্ম নেয়া শিশু।

শপ্‌কে দেনা- গোয়ালা ও ধোপাদের বিয়েতে কনেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমপর্ণ।

শীসকা ডালি- পাতাবিহীন কাঁটাযুক্ত গাছ।

শুভরাত্রি- ফুলশয্যা, বাসররাত।

শ্মশানবন্ধু- যে ব্যক্তি শবানুগমন করে শ্মাশানে গিয়ে দাহকার্যে সাহায্য করে।

শ্মশানবাসী- শ্মশানবন্ধু।

ষষ্ঠী- সন্তানের রক্ষয়িত্রী হিন্দুদেবী।

ষষ্ঠীকা আসান- হিন্দুদেবী ষষ্ঠীর পূজার আসন।

ষষ্ঠীবাড়ি- ছয় ষষ্ঠীর রাতে নবজাতকের শিয়রে রক্ষিত সামগ্রি।

সতর- লজ্জাস্থান আচ্ছাদন; ইসলামি শাস্ত্র মতে পুরুষ ও নারীর দেহের নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত ঢেকে রাখার নাম।

সত্যগুণীন- ভূত-প্রেত ও চোরা ছাড়াতে পারদর্শী ব্যক্তি।

সফুরত- মুসলমান সমাজে কনে বিদায়ের প্রাক্কালে বর ও তার অভিভাবকের কাছে কনেকে আনুষ্ঠানিভাবে সমপর্ণ।

সাংগ- বাঁশের তৈরি শব বহনকারী মই।

সাত পর্দা- গর্ভঝিল্লি।

Dhaka University Institutional Repository

সাত হা মীম- পবিত্র কুরআন শরীফের ৪৬ পারায় সাতটি আয়াতের শুরু আরবী বর্ণ হা ও মীম দিয়ে। উক্ত আয়াত সমূহ সাত হা মীম নামে পরিচিত।

সাতোয়াশা- প্রথম গর্ভধারণের সাত মাসে পালনীয় সাধভক্ষণ।

সাপি- গরম হাঁড়ি ধরার কাপড়।

সাফুরাত- সফুরত।

সায়াকুল- পবিত্র কুরআন শরীফের দ্বিতীয় পারা।

সালুন- রান্না করা তরকারি।

সিতলি- উপর্যুপরি তিন পুত্র সন্তানের পর জন্ম নেয়া কন্যা সন্তান।

সূতিকা- প্রসবোত্তরকালীন অসুখ।

সেরবেরেন- দুধ, পোলাও চাল, চিনি, কিসমিস, কেওয়া বা জাফরান সহযোগে তৈরি ফিরনি জাতীয় খাবার।

সোনাবস্ত্র- ঋষিদের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান।

সোহাগরাত- ফুলশয্যা, বাসর রজনী।

স্বস্তিকা- মাঙ্গলিক বজ্র চিহ্ন, বিবাহের মাঙ্গলিক চিহ্ন।

হদ্দহদ্দি- শাঁখারীদের বিয়েতে একই দিনে গায়ে হলুদ ও বিয়ের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন।

হলদি- গায়ে হলুদ।

হাইংগা- শ্মশানবন্ধু।

হাইটা- শ্বশুড়ালয়ে আগমনের পর নববধূ কর্তক পালিত লোকাচার।

হাইরা- আইরা।

হাংগর- শব বহনকারী বাঁশের তৈরি মই বা মাচা।

হাকরার ভাত- শ্রাদ্ধকালীন সময়ে মৃতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত খাবার।

হাজেরি নাস্তা- বাড়িতে লাশ অবস্থানকালীন সময়ে আত্মীয় স্বজন কর্তৃক নিয়ে আসা বাকরখানি ও মিষ্টি।

হাটুইরা রাইত- ছয় ষষ্ঠী রাত্র।

হাতপান- পানচিনি।

হাতোশা- প্রথম গর্ভধারণের সাত মাসে পালনীয় সাধভক্ষণ।

হাদলার বিষ- প্রসবোত্তরকালীন অসুখ।

Dhaka University Institutional Repository

হায়তনের গাঁঠি্ঠ- ছটিঘরে ব্যবহারের জন্য আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে সংগৃহিত পুরোনো কাপড়ের পুঁটলি।

হায়েজ নেফাস- আদ্যঋতু।

হারসানদাল- বরযাত্রায় অভ্যাগত নারীদের অভ্যর্থনা।

হাসলি- নবজাতক শিশুর গলার দু'পাশের হাড় (collar bone) সরে যাওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

তত্ত্ব-কাঠামো ও নির্ধারকসমূহ

স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে পরিচিত ঢাকা উপমহাদেশের ঐতিহাসিক শহরগুলির মধ্যে অন্যতম। বাণিজ্যিক, ভূ-রাজনৈতিক ও বিভিন্ন কৌশলগত কারণে ঢাকা সুপ্রাচীনকাল থেকেই পূর্ব ভারতের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আসছে এ কথা আজকাল সকলেই স্বীকার করে থাকেন। এ কারণে সুদীর্ঘকাল জুড়েই এই অঞ্চল ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা পরিচয়ে পরিচিত হয়েছে, তুলে ধরেছে নিজস্ব স্বকীয়তা। ঢাকার রাজনৈতিক ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটেছিল ১৬০৮ সালে (মতান্তরে-১৬১০) যখন ঢাকা শক্তিশালী মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ব ভারতীয় তথা বাংলার রাজধানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এর পর থেকেই লিখিত ও ঐতিহাসিক বিবরণীতে ঢাকার ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যায়। মোগল, নবাব, ব্রিটিশ, পাকিস্তান আমল পেরিয়ে ঢাকা আজ শুধু স্বাধীন বাংলার রাজনৈতিক খেতাবই অর্জন করেনি, এর পাশাপাশি পরিণত হয়েছে নানা জাতির, ধর্মের, সংস্কৃতির মানুষের মিলনকেন্দ্র। এই মিলনমেলায় বহু সংস্কৃতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে নতুন সংস্কৃতি, এক কথায় ঢাকাই সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি ঢাকাকে করেছে মহিমান্বিত, সাক্ষী হয়ে আছে গৌরবজনক ইতিহাসের। শত বাজার, মাহফিল, জলসা, দরবার হারিয়ে গেছে, দালান ও অট্টালিকা ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু ঢাকার সংস্কৃতি এখনো এর গৌরব ও প্রাচীনতার স্মারক হয়ে টিকে আছে। কিন্তু দুঃখজনক এই সংস্কৃতি নিয়ে গঠনমূলক ও নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা হয়নি বললেই চলে। আলোচ্য প্রস্তাবনায় ঢাকার সামাজিক জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস নিয়েছি। গবেষণাটিকে মৌলিক ও নিয়মতান্ত্রিক করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট করে জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ে সংক্রান্ত পুরোনো ঢাকায় প্রচলিত বিভিন্ন রীতি ও আচার অনুসন্ধান ও আলোচনা করা হয়েছে। ঢাকার সংস্কৃতির ইতিহাস পূনর্গঠন, সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াকে নির্ণয় করার জন্য আলোচ্য গবেষনায় পুরোনো ঢাকার অধিবাসীদের মাঝেই গবেষনাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

ঢাকার সংস্কৃতির উদ্ভব এবং এর ক্রমবিকাশ নিয়ে তাত্ত্বিক গবেষণার অভাব রয়েছে। এর পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ এ বিষয় সংক্রান্ত মাঠ পর্যায়ে জরিপ বা অনুসন্ধান এখন পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়নি বললেই চলে। এ পর্যন্ত ঢাকা সম্পর্কিত গবেষণা ও প্রকাশনায় মূলত বস্তুগত নিদর্শন ও

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত ইতিহাসকেই মূল বিষয় ধরা হয়েছে। প্রচলিত ঐতিহাসিক গবেষণার মানদন্ড ও কাঠামোর কারণেও ঢাকা সম্পর্কিত গবেষণা এর সাধারণ সংস্কৃতি ও লোকজ ধ্যানধারণাকে আলোচনা করার সুযোগ পায়নি। ঢাকা শহর নিয়ে এ পর্যন্ত যে ক'টি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে অধ্যাপক আব্দুল করিমের *Dacca the Mughal Capital*, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের *ঢাকা স্মৃতি- বিস্মৃতির নগরী*, *উনিশ শতকের ঢাকা*, *স্মৃতিময় ঢাকা*, ড. শরীফ উদ্দিন আহমদের *ঢাকার ইতিহাস ও নগর জীবন*, আহমদ হাসান দানীর *Dacca: A Record of Changing Fortunes* অন্যতম। কিন্তু এসমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশেরই বিষয়বস্তু হল নগরটির প্রাচীনকালের ধ্বংসাবশেষ, স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন আর মোগল ও তৎপরবর্তী আমলের নগর জীবন ও তার ধারাবাহিক ইতিহাস। ঢাকা তথা পুরোনো ঢাকার সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা কার্য হয়েছে খুবই কম। সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা হবে বহুমাত্রিক আরো পরিস্কার করে বলা যায় সম্বনিত বিষয়ভিত্তিক (cross disciplinary)। সংস্কৃতি কাঠামোবদ্ধ কোন ধারণা নয়। সংস্কৃতিকে অনুসন্ধান করতে হয় ক্ষেত্রীয় অনুসন্ধানে প্রাপ্ত উপাত্তের আলোকে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানাদিক, বিষয়, ধারণাগুলি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবৈশিক পরিপ্রেক্ষিত দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই প্রভাব ও প্রভাবকেন্দ্রীক বিভিন্ন ধরণের অভিযোজনে ফুটে উঠে সংস্কৃতি ও এর ধারা উপধারা। আলোচ্য গবেষণায় ঢাকার সংস্কৃতি, এর স্বরূপ এবং এর বিবর্তনমুখী ধারাকে দেখা হয়েছে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এর মূল লক্ষ্য হল সংস্কৃতির উদ্ভবকে নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত মৌলিক উপাত্তের আলোকে। মানুষ তৈরি করে সংস্কৃতি তাই ঢাকাই সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য আলোচ্য গবেষণায় মূল বিষয় ধরা হয়েছে ঢাকার মানুষকে। এখানে সেই মানুষদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে যাদের ঘিরে অথবা যারা প্রত্যক্ষ করেছে ঢাকার সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তন। যারা বিভিন্নভাবে অভিযোজিত করেছে ঢাকার সংস্কৃতির ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে। আমরা এই মানুষদের জীবনকে, জীবনের বিভিন্ন ধাপকে সংস্কৃতির আধার হিসেবে দেখতে চেয়েছি। তবে গবেষণার সীমিত পরিসরের কারণে সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থাকে নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। জীবন ও সংস্কৃতির মৌলিক কিছু বিষয় যেমন জন্ম, বিয়ে ও মৃত্যু সংক্রান্ত আচার ও সংস্কৃতিকে আলোকপাত করে ঢাকার সংস্কৃতির রূপ ও বৈশিষ্ট্যকে খোঁজা হয়েছে। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলি (জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু) সম্পর্কিত তথ্য, উপাত্ত আচার-অনুষ্ঠান আলোচনার মধ্য দিয়েই সম্ভবত বের হয়ে আসবে সংস্কৃতির মৌলিক রূপ যা এখন পর্যন্ত ঢাকার গবেষণায় অনুপস্থিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমার অভিসন্দর্ভে যে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাই, সেগুলি হলো-

Dhaka University Institutional Repository

১. পুরোনো ঢাকার সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয়ের লক্ষ্যে সামাজিক জীবনযাত্রার বিভিন্ন বিষয়াদি বিশেষ করে জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ে সম্পর্কিত আচার সমূহের নথিভূক্তিকরণ।

২. পুরোনো ঢাকার সংস্কৃতির বিভিন্ন মাত্রা, ব্যপ্তি ও পরিধিকে ক্ষেত্রিয় (ধর্মভিত্তিক, সম্প্রদায়ভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক) পর্যালোচনার আওতায় অনুসন্ধান করা।

৩. পুরোনো ঢাকার সংস্কৃতির উৎসমূলে স্থানীয় ও বর্হিবাংলার প্রভাব আলোচনা সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সংস্কৃতির আকর অনুসন্ধান ও এর ক্রমবিবর্তন তুলে ধরা।

ঢাকা গুরুত্ব লাভ করে ১৬০৮ সালে (মতান্তরে- ১৬১০) মোগল রাজধানী স্থাপনের মধ্য দিয়ে। মূলত সেইসময় থেকেই ঢাকার ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যায়। ঢাকার আদি ইতিহাস এখনো অনেক ক্ষেত্রেই রহস্যাবৃত হলেও ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাত্তের আলোকে প্রাচীন ঢাকার অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা করা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রিষ্টীয় শতকের আগের বেশ কিছু সীসা, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রাপ্তি ঢাকাসহ এ অঞ্চলের সাথে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের বাণিজ্যিক সম্পর্কের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে।[১] ঢাকার পিলখানায় প্রাপ্ত সপ্তম শতাব্দীর গুপ্ত আমলের স্বর্ণমুদ্রা, তেজগাঁওয়ে পাওয়া একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর সেন আমলের 'হরি-শংকরা' প্রাক- মুসলিম ঢাকার পরিচয় তুলে ধরে।[২] সুলতানি আমলে নির্মিত নারিন্দায় অবস্থিত বিনত বখত বিবির মসজিদ (১৪৫৭)[৩], ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের পশ্চিমে অবস্থিত গিরদি কিল্লা বা নাসওয়ালার গলি মসজিদ (১৪৫৭)[8], মিরপুরের হযরত শাহ আলী বাগদাদীর মাজার (১৪৮০)[৫] এবং বঙ্গভঙ্গ প্রাঙ্গনে হযরত শাহ জালাল দক্ষিণীর মাজার (১৪৭৫-৭৬)[৬] ঢাকায় মুসলিম জনবসতির প্রামাণিকতাকে তুলে ধরে। ১৫৫০ সালে জোয়াও দ্য ব্যারেসের অঙ্কিত বাংলার প্রথম মানচিত্রে ঢাকাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে দেখানো হয়েছে।[৭] আবুল ফজলের বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরি' তে ঢাকা অঞ্চলের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। মোগল সম্রাট আকবরের নির্দেশে রাজপুত সেনাপতি মানসিংহ বার ভূইয়াদেরকে দমন করার জন্য ১৬০২ সালে ঢাকায় তার সদরদপ্তর স্থাপন করেন। এই সদরদপ্তর স্থাপনকে শহর প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে অনুমান করা হয়। কথিত আছে, তিনি ঢাকেশ্বরী মন্দিরটি সংস্কার সাধন করিয়েছিলেন। উর্দুবাজার ও পুরোনো মোগলটুলি তার স্মৃতিবহন করছে। প্রাক-মোগল ঢাকার বিস্তৃতি

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-১: প্রাক মোগল আমলের ঢাকা

উৎস: ওয়েব সাইট[৮]

ঘটেছিল পশ্চিমে বাবুবাজার থেকে পূর্বে সদরঘাট পর্যন্ত। মোগলরা ঢাকায় বসতি স্থাপনে উৎসাহ প্রদানের জন্য দান করেছিলেন লাখেরাজ সম্পত্তি।[৯] ফলে বিভিন্ন কারুশিল্পী ও পেশাজীবীদের পদবী ও অবস্থানের ভিত্তিতে শহরের পূর্ব দিকে শাঁখারী বাজার, তাঁতীবাজার, সূত্রাপুর, কুমারটুলি, গোয়ালনগর, কামারনগর, বানিয়ানগর, জালুয়ানগর ইত্যাদি এলাকা প্রাক-মোগল আমলেই গড়ে উঠেছিল। ঢাকার মোগল রাজধানীতে উত্তরণ সামরিক, প্রশাসনিক সদরদপ্তর ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে এর গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেয়। অতি দ্রুত ঢাকার লোকসংখ্যা ও বিস্তৃতি বাড়তে থাকে। পুরোনো দুর্গকে (বর্তমান কেন্দ্রিয় কারাগার) কেন্দ্র করে পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে গড়ে উঠে নতুন মোগল ঢাকা। নগরীর প্রতিরক্ষাব্যুহ সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে ইসলাম খান পুরোনো দুর্গটিকে পুন:নির্মাণের পাশাপাশি বুড়িগঙ্গা ও দোলাইখালকে

সংযুক্ত করে একটি নতুন খাল খনন করেছিলেন। এ কৃত্রিম খালটি নগরীর পুরোনো আর নতুন এলাকাগুলোকে পৃথক করেছিল। মূলতঃ মোগল রাজধানীর প্রারম্ভিককাল থেকেই ঢাকা নগরী পুরোনো ও নতুন এলাকায় বিভক্ত হয়ে পড়ে।[১০] সুবাদাররা বাস করতেন পুরোনো কেল্লা, লালবাগ দুর্গ, পোস্তা, বড় কাটরা ও ছোট কাটরায়। মোগল কর্মকর্তাদের বাসগৃহ ছিল বখশীবাজার, আজিমপুর বা

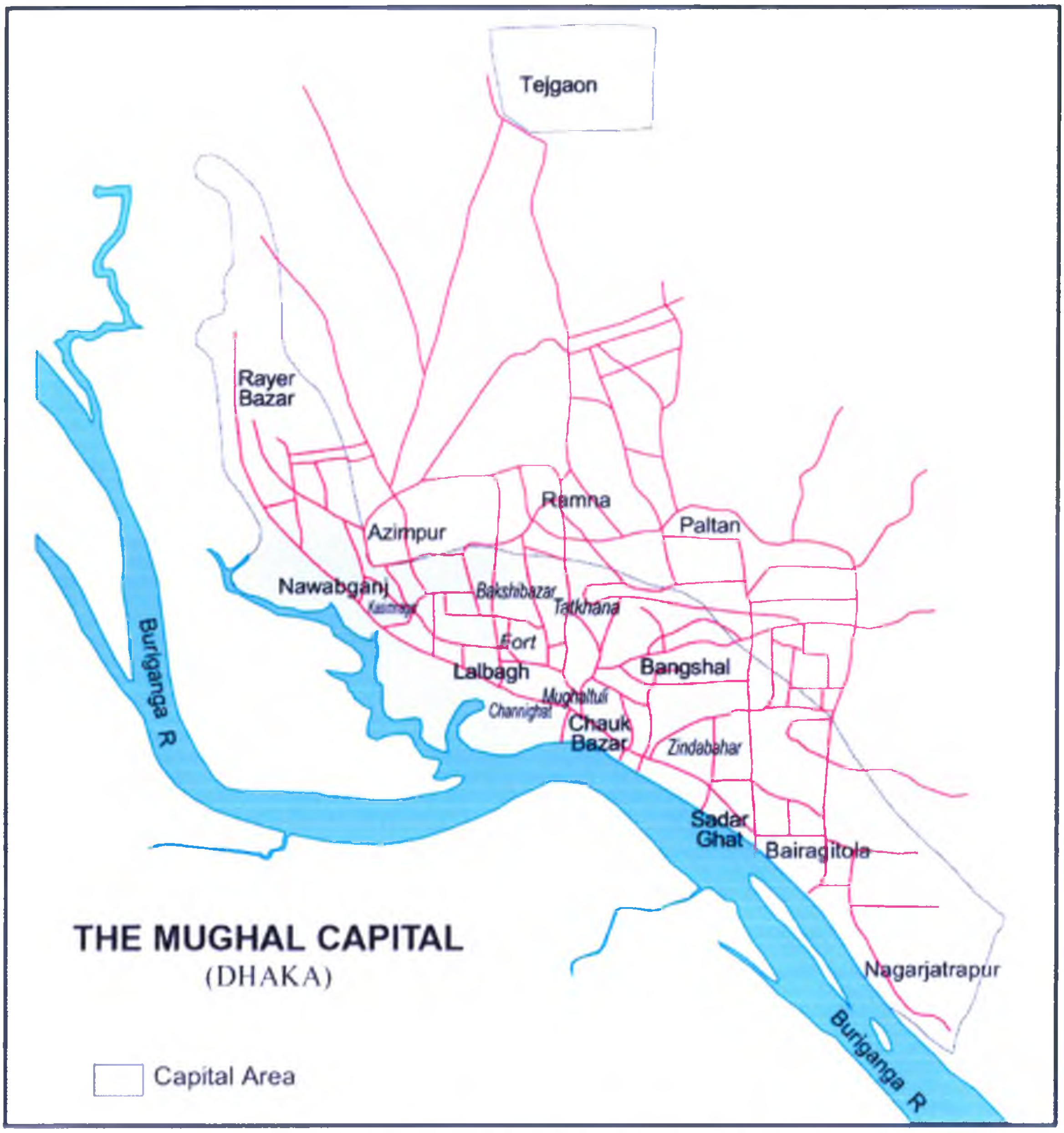

চিত্র-২: মোগল আমলের ঢাকা, উৎস: ওয়েব সাইট[১১]

Dhaka University Institutional Repository

নাওয়াবপুরে। মোগল পদমর্যাদাহীন ধনীদের এলাকা ছিল বেচারাম ডেউড়ি, আগা সাদেক ও আলী নকি ডেউড়ি। ব্যবসায়ীগণ পূর্ব-পশ্চিম উভয় দিকেই গড়ে তুলেছিলেন তাদের বাসগৃহ। চকবাজার, বেগমবাজার, রহমতগঞ্জ, নিমতলী, হাজারিবাগ, চাঁদনীঘাট, পিলখানা, ইসলামপুর, মাহুতটুলি, মোগলটুলি, কায়েতটুলি,আতিশখানা ইত্যাদি এলাকা মোগল আমলে গড়ে উঠেছিল। সতের শতকের শেষ দিকে ঢাকা সর্বাধিক বিস্তার লাভ করেছিল। এই সময় ঢাকা নগরীর পরিধি ছিল চল্লিশ মাইল।[১২] এ সময় শহর পূর্বে ডেমরা খাল থেকে পশ্চিমে মিরপুর এবং দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা থেকে শুরু করে উত্তরে টঙ্গী পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।[১৩] তবে, অধিকাংশ বসতি ছিল নদীর তীর জুড়ে পুরোনো ঢাকায়। ফুলবাড়িয়া ছাড়িয়ে মিরপুর পর্যন্ত কিছু কিছু অংশে বসতি থাকলেও অধিকাংশ এলাকা জুড়েই ছিল বাগান, জলাজঙ্গল আর ক্যানাল।[১৪]

নায়েব নাজিমদের শাসনকালে ঢাকার প্রসার স্থিমিত হয়ে পড়ে। ১৭০৪ সালে বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হলে[১৫] প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু তখনো নিয়াবত ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার অস্তিত্ব টিকে ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রত্যক্ষভাবে শাসনভার গ্রহণের পর থেকে ঢাকার ক্ষয় শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় উনিশ শতকের গোড়ার মধ্যেই এ শহর প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।[১৬] প্রশাসনিক ব্যবস্থা ব্যাহত হবার পাশাপাশি ইংরেজদের বাণিজ্যিক আগ্রাসনে ওলন্দাজ, ফরাসি ইত্যাদি ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ব্যবসায়িক কর্মকান্ড স্থিমিত হয়ে আসে। আঠার শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রথমভাগে ঢাকার বড় বড় ব্যবসায়ী ও ব্যাংকাররা শহর ত্যাগ করে চলে যায়। ঢাকার সেটেলমেন্ট অফিসার এফ.ডি.এসকলি লিখেছেন- "১৮৩৭ সালের মধ্যে শহরের অভ্যন্তরে জমিজমা ও বাড়ি-ঘরের দাম ভীষণভাবে কমে গিয়েছিল এবং বাসিন্দারা অনেকেই তাদের বিষয় সম্পত্তি পানির দামে বিক্রি করে দিয়েছিল।"[১৭] ১৮৫৯ সালে ঢাকার জনসংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছিল ৫১,৬৩৬ জনে।[১৮] ১৮০১-১৮৪০ সালের মধ্যে শহরের কাছাকাছি অনেক ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল নারিন্দা, ফরিদাবাদ, উয়ারি ও আলমগঞ্জের বেশির ভাগই পরিত্যক্ত হয়। এছাড়া ফুলবাড়িয়া, দেওয়ান বাজার, মনোহর খাঁন বাজার, ঢাকেশ্বরী, আজিমপুর ও এনায়েতগঞ্জ এলাকা সম্পূর্ণ জনবিরল হয়ে পড়ে। এই সময় শহরের পরিধি শুধুমাত্র সংকুচিতই হয়ে পড়েনি, ঢাকা নোংরা, জঙ্গলাকীর্ণ, অস্বাস্থ্যকর একটি নগরে পরিণত হয়। তবে উল্লেখ্য, অর্থনৈতিক প্রয়োজনে উনিশ শতকেই আবার ঢাকা শহরেরর নগরায়ণ প্রক্রিয়ার উন্নয়নে নতুন মাত্রা লাভ করে। অচিরেই ঢাকা বাংলা প্রদেশের দ্বিতীয় বৃহতম শহর আর পূর্ববাংলার প্রশাসনিক,

Dhaka University Institutional Repository

বাণিজ্যিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র হিসেবে পুনুরুৎজ্জীবিত হয়। এরই সাথে ঢাকা বহুমাত্রিক আঙ্গিকে বিকশিত হতে থাকে। আঞ্চলিক ও জেলাভিত্তিক বিভিন্ন সামরিক-বেসামরিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ঢাকাকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে বাংলা প্রদেশের দ্বিতীয় বৃহতম প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত করে। রেলওয়ে স্থাপন ও ষ্টিমার চালু করার ফলে ঢাকা পূর্ব বাংলার বাণিজ্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠে। ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত পৌরসভা ঢাকায় বিভিন্ন ধরণের ভৌত কাঠামোগত উন্নয়ন এবং নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, কলের পানি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রোগ-ব্যাধির প্রতিরোধসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ঢাকাকে উনিশ শতকের শেষ ভাগে আধুনিক ও উন্নত বাসযোগ্য নগরে পরিণত করে। এছাড়া গণতান্ত্রিকভাবে পৌর নির্বাচনের মাধ্যমে ঢাকার স্থানীয় সরকার গঠনের প্রক্রিয়াও এসময়ে আরম্ভ হয় যা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামো পুনর্বিন্যাসে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঢাকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। স্কুল কলেজ স্থাপনের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা ও সমাজোন্নয়নমূলক সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এইসময় ঢাকায় ব্রাহ্ম আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। ১৮৫৬ সালে ছাপাখানা স্থাপন সংবাদ-সাময়িকপত্রের সংখ্যাই বৃদ্ধি করেনি, এটাকে কেন্দ্র করে ঢাকায় সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল। প্রায় একই সময়ে ঢাকায় নাট্য চর্চাও বিকাশ লাভ করেছিল তাৎপর্যপূর্ণভাবে। সব মিলিয়ে ঢাকার জীবনে একটা জাগরণ ঘটেছিল যার পূর্ণ বিকাশ কাল ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ এর মধ্যে ধরে নেয়া যায়।[১৯] ঢাকায় বহুমাত্রিক কর্মকান্ড সংগঠনের কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে এখানে ইউরোপীয়, বর্হিবাংলা ও পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত অধিবাসীদের সমাগম ঘটেছিল। এদের মধ্যে জমিদার, ইংরেজি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, ইউরোপীয় কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, শ্রমিক শ্রেণী ছিল অন্যতম। এই বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠীর বাসস্থানের প্রয়োজন মেটাতে গড়ে উঠে নতুন নতুন আবাসিক এলাকা। ১৮২০ এর দশকে ব্রিটিশ ঢাকার প্রশাসনিক কার্যালয় মোগল দুর্গ এলাকা থেকে সদরঘাট ও বাবুবাজারের কাছে স্থানান্তর করা হয়। সদরঘাট, বাংলাবাজার এবং উত্তরের অঞ্চলগুলি নতুন নগর কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে। পরবর্তীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শহরের কেন্দ্রস্থলটি জনাকীর্ণ হয়ে পড়লে নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই স্থানটি ছেড়ে খোলামেলা শহরতলীর দিকে বসতি স্থাপনে উৎসাহি হয়ে উঠে। প্রথমদিকে শহরের কেন্দ্রস্থলের নিকটবর্তী এলাকাসমূহের নিচুজমি, জলাশয় ও গর্ত ভরাট করে নতুন নতুন আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা হয়। এই সমস্ত এলাকার মধ্যে তাঁতীবাজার, গোয়ালনগর, কামারনগর, লক্ষীবাজার, সূত্রাপুর, আরমানিটোলা ও রায়সাহেব বাজার এলাকার উত্তরাংশে অবস্থিত

Dhaka University Institutional Repository

এলাকার উত্তরাংশে অবস্থিত জায়গাগুলি উল্লেখযোগ্য। আরো পরে, অর্থ্যাৎ আশি থেকে নব্বই দশকের মধ্যে ঢাকা পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকেই সম্প্রসারিত হয়। পশ্চিমে এনায়েতগঞ্জ, হাজারীবাগ, নওয়াবগঞ্জ এবং চৌধুরীবাজার এলাকা গড়ে উঠে। অপরদিকে, শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে একটু দূরে শহরতলিতে উয়ারি, গেন্ডারিয়া, টিকাটুলি, স্বামীবাগ, নারিন্দা গড়ে উঠে মধ্যশ্রেণীর আবাসিক এলাকা হিসেবে। এখানে উল্লেখ্য যে, আশির দশকে পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা হিসেবে উয়ারি গড়ে উঠেছিল।[২০] এসব আবাসিক এলাকায় গড়ে উঠা বাড়িগুলিতে প্রচলিত কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছিল। মধ্যশ্রেণীর রুচির পরিবর্তন পুরোনো ঢাকার আবাসিক এলাকা থেকে এসব এলাকাকে আলাদা করেছিল।

শহর ঢাকার উন্নয়নে বিশেষ মাত্রা যোগ হয় ১৯০৫ সালের দিকে। পূর্ব বাংলা ও আসামের নতুন রাজধানী ঢাকাকে উপযুক্ত রাজধানী শহর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে নানারকম

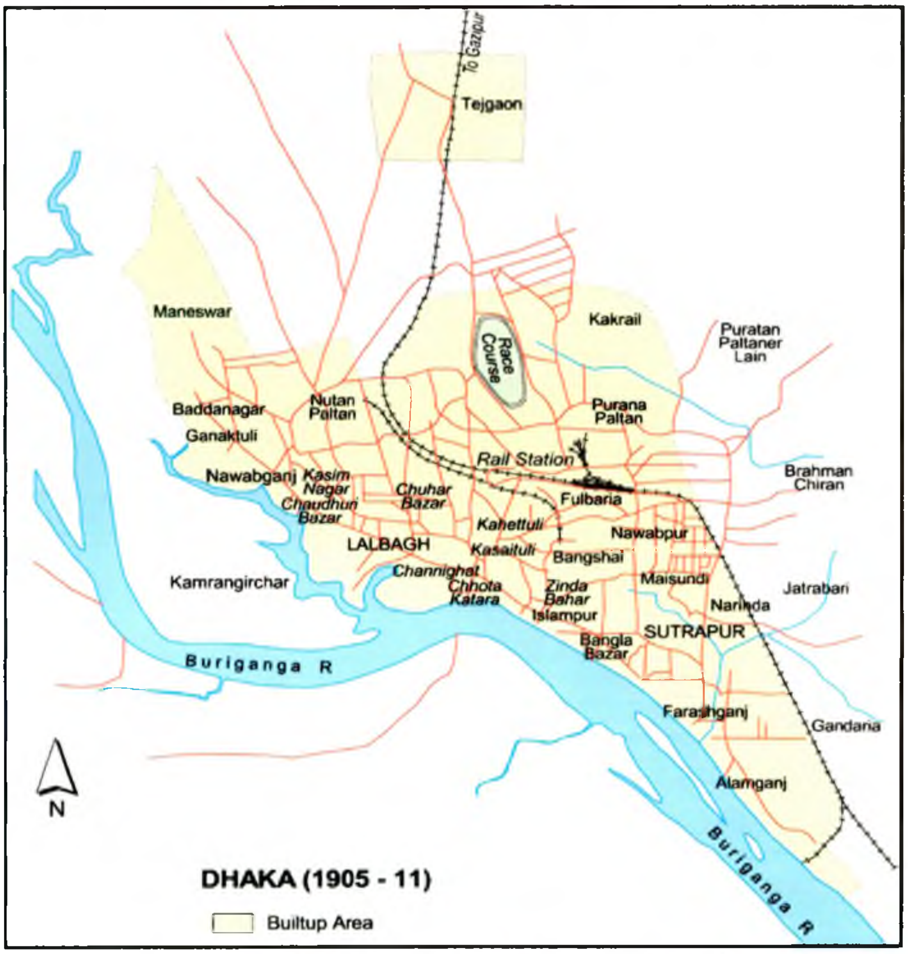

চিত্র-৩: ব্রিটিশ আমলের ঢাকা, উৎস: ওয়েব সাইট[২১]

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নমূলক কার্যকম সংগঠিত হয়। সরকারি অফিস, কর্মচারিদের বাসভবন, প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ এসব কিছুকে কেন্দ্র করে রমনায় এক মনোরম ও আধুনিক উপশহর গড়ে উঠে। এছাড়া পশ্চিমে আজিমপুর অঞ্চলে গড়ে উঠে সরকারি আমলাপাড়া।[২২] পুরোনো শহরের পাশে পরিকল্পিতভাবে নতুন শহর গড়ে তোলার প্রক্রিয়া মূলতঃ এসময় থেকেই শুরু হয়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে ঢাকা আবার একটি জেলা শহরে পরিণত হয়। তবে বঙ্গভঙ্গ রদ এবং নবগঠিত পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ বাতিলের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় থেকেই ঢাকা পূর্ব বাংলার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জগতের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বেড়ে উঠে।[২৩] ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়ে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান নামক দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এবার পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হল ঢাকা। তৎকালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাসহ অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতা ঢাকা শহরের সংস্কৃতির গুণগত পরিবর্তন ঘটায়। এসময় উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা রাতারাতি তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারায়।[২৪] স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরপরই বিপুল সংখ্যক হিন্দু জনগোষ্ঠী দেশ ত্যাগ করে কলকাতাসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে অভিবাসন করে। অপরদিকে, সেসময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলিম মোহাজেরদের ঢাকায় আগমন ঘটে। বিপুল সংখ্যক মুসলিম উদ্বাস্তুর আগমনে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা রাতারাতি ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। মিরপুর, মোহাম্মদপুরে মোহাজের কলোনী স্থাপনের পাশাপাশি নবাবপুর, ঠাটারীবাজার, বনগ্রাম, আমলীগোলা, মদনমোহন বসাক রোড, ওয়ারী এলাকায় তাদের বাসস্থান গড়ে উঠে। এসময় নবগঠিত রাজধানী ঢাকার উন্নয়নে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। সরকারি কর্মচারীদের জন্য কলোনী তৈরি করা হয় আজিমপুর, ঢাকেশ্বরী, শান্তিনগর, মতিঝিল, ধানমন্ডি, ইস্কাটন, মিন্টোরোড ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক ভবন গড়ে উঠল মতিঝিল ও তেজগাঁওয়ে। প্রধান বিপনিকেন্দ্ররূপে নিউমার্কেট ও ষ্টেডিয়াম মার্কেট তৈরি হল। নাগরিক সুবিধা সম্বলিত আবাসিক জমিসমূহ প্রথমে ধানমন্ডিতে আর তার অনেক পরে গুলশান ও বনানী এলাকায় বরাদ্দ করা হয়।[২৫] ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণের পৃথক অস্তিত্বের চেতনা তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটে।[২৬] এরই পরিপ্রেক্ষিতে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করে। নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজধানী হল ঢাকা। স্বাধীনতা পরবর্তী ঢাকা মেট্রোপলিটন ও সার্বজনিন শহরই নয়, মেগাসিটিতে রূপান্তরিত হল।

চিত্র-৪: বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, উৎস- ওয়েব সাইট[২৭]

বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল নগরী ঢাকায় 'পুরোনো ঢাকা' বিষয়টি ভৌগোলিকতার বাইরে একটি ধারণাগত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এর পিছনে একুশ শতকের সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ ও প্রাযুক্তিক উন্নয়ন বিশেষভাবে কাজ করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পুরোনো ঢাকা হিসেবে পরিচিত বখশি বাজারে এখন নতুন ঢাকার কায়দায় বহুতল ভবন/ এপার্টমেন্ট গড়ে উঠেছে। সেখানে বসবাস করছে দেশ ও বিদেশ থেকে আগত বহু সংস্কৃতির মানুষ। যাদের মাধ্যমে পুরোনো ঢাকায় বিস্তার করেছে নতুন ঢাকার সংস্কৃতি। আবার পুরোনো ঢাকার উচ্চবিত্ত শ্রেণী নতুন ঢাকার গুলশান, বারিধারায় বসবাস করে ধারন করে চলেছে নিজস্ব সংস্কৃতির আকর। নতুন ঢাকায় জায়গা করে নিচ্ছে পুরোনো ঢাকা। এর মাঝখান দিয়ে নতুন ঢাকা-পুরোনো ঢাকা সংস্কৃতির মেলবন্ধনে বিকাশ লাভ করেছে আপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন মাত্রার নতুন একটি সংস্কৃতি। এসকল কারণে পুরোনো ঢাকার সংস্কৃতির রূপরেখা শহর ঢাকার ভৌগলিক বিস্তারের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কিত নয়। সময়ের পরিক্রমায় এটি একটি ধারনাগত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তদুপরি ঢাকার দক্ষিণে অবস্থিত বুড়িগঙ্গা বরাবর ঢাকার পূর্ব-পশ্চিমমুখী শহরের বিস্তারকে প্রচলিত অর্থে পুরোনো ঢাকা বলা হয়। সতের-আঠার শতকে গড়ে উঠা পৃথিবীর অন্যান্য শহরের মত ঢাকাও গড়ে উঠেছিল নদীর তীর ঘেষে। মোগল রাজধানীর ব্যাপ্তিকে ধরে আজকের "পুরোনো ঢাকার" ভৌগোলিক পরিসীমা সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যেতে পারে। মোগল ঢাকার পূর্বপ্রান্ত আজকের সুত্রাপুর, নারিন্দা, পশ্চিম প্রান্ত ধানমন্ডির জাফরাবাদ, উত্তরে রমনা এবং দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী। বহুতা নদীর পাশ দিয়ে লম্বালম্বি শহরটি বিশ শতকের মধ্যভাগেই উত্তর দিকে প্রলম্বিত হয়েছে, তৈরি করেছে নতুন ঢাকা।

শহুরে সংস্কৃতি ও গ্রাম্য সংস্কৃতির মূল পাথর্ক্য রয়েছে দার্শণিক ও চারিত্রিক ক্ষেত্রে। গ্রামের কৃষি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থা সাধারণত একমুখী উৎপাদন নির্ভর সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ ঘটায়। অপরপক্ষে শহুরে সংস্কৃতির বুনন জটিল, নানামুখী কর্মকান্ড ও দর্শণের আওতায় অভিযোজিত হয়ে থাকে। এ কারণে গ্রামের উৎপাদনমুখী সমাজ ব্যবস্থা যেখানে কাল ও পাত্র ভেদে প্রায় একই ধরনের সংস্কৃতির স্বরূপ তুলে ধরে সেখানে শহুরে সংস্কৃতির আকর নির্ভর করে নির্দিষ্টভাবে ঐ শহর, তার পারিপার্শ্বিকতা এবং অবশ্যই বসবাসকারী জনসাধারণের উপর। আলোচ্য গবেষণায় পুরোনো ঢাকার সংস্কৃতিকে দেখা হয়েছে শহুরে সংস্কৃতির আওতায় বিকশিত ও অভিযোজিত একটি ধারা হিসেবে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে ক্রম আবর্তিত হয়েছে। একটি শহুরে সংস্কৃতি হিসেবে ঢাকা সৃষ্টিলগ্ন থেকেই চারিত্রিকভাবে জটিল ও গুণগতভাবে বৈচিত্রময়। তদুপরি এই বৈচিত্র ঢাকায় অধিকতর বহুমুখী হয়েছে রাজনৈতিক পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে। পরপর চার বার রাজধানীর মর্যাদা পাওয়া ঢাকা বিভিন্ন সময়ে নানা সংস্কৃতির আওতায় এসে আত্তীকরন করেছে নিজস্ব সংস্কৃতির স্বরূপ। সংস্কৃতির এই বুনটের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল আঠার ও উনিশ শতকে। রাজনৈতিক উত্থান পতনের এই সময়কালে বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে ঢাকা অবলোকন করেছে সংস্কৃতির বিভিন্ন পরিক্রমা। এসময় ইউরোপীয় চিন্তা ও চেতনার সংস্পর্শে যখন সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রায় ও পরিক্রমায় আসছে আমূল পরিবর্তন তেমনি ঢাকার জনবসতি ও অবকাঠামোগত বিষয়গুলোতে ঘটেছে নানা ধরণের সংযোজন ও বিয়োজন। এসময় ঢাকার ওয়ারীতে গড়ে উঠেছে বাংলার প্রথম স্যাটেলাইট টাউন যা সম্ভবত প্রথম নতুন ঢাকার সূচনা করে পুরোনো ঢাকার বিপরীতে। নতুন ও পুরোনো ঢাকার এই পরিবর্তন ছিল মূলত ভৌত কাঠামোয় পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত রূপকে কেন্দ্র করে। এসময় বা আন্দোলনসহ নানা ধর্ম সংস্কার

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন ঢাকার জীবনযাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। ঘটনাবহুল এই সময়ে (উনিশ-বিশ শতক) ঢাকার সংস্কৃতি তাই ধারণ করেছিল জটিল, বহুমাত্রিক ও ক্রম পরিবর্তনশীল একটি স্বরূপ। এই জটিল সংস্কৃতিকে তাত্ত্বিক কাঠামোয় ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে 'পুরোনো ঢাকার সংস্কৃতি' প্রাথমিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচ্য গবেষণায় নির্দিষ্ট মাঠ কর্মে প্রাপ্ত উপাত্ত নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই মাঠকর্ম অনুসন্ধান নির্ভর যা ঢাকায় বসবাসকারী মানুষের জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ সংক্রান্ত তথ্যাদির ঐতিহাসিকতা নিয়েয়ে আলোচনা করেছে উনিশ ও বিশ শতক সময়কালে।

মোগল রাজধানী হিসেবে পরিচিতি গড়ে উঠলেও বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস থেকে ধারণা করা হয় ঢাকার জনবসতি আরো প্রাচীন। নদীমাতৃক বাংলায় ভৌগোলিক কৌশলগত অবস্থানের কারণেই হোক, আদি ঐতিহাসিক কাল থেকেই ঢাকা ছিল একটি সুবিধাজনক স্থান। মহাস্থানগড়-বগুড়া ও লালমাই- কুমিল্লা দুটি আদি ঐতিহাসিক জনপদের মর্ধ্যবর্তী অবস্থানে ঢাকার উপস্থিতি প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের এই ধারণাকে আরো শক্তিশালী করেছে। সুতরাং মধ্যযুগে ইসলাম খানের মোগল বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকাকে নির্বাচন করা কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনা বা বিষয় ছিল না। রাজধানী পূর্ব মোগল ঢাকার একটি থানা হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায় আকবরনামায়। এই থানাকে কেন্দ্র করে রাজধানী শহর ঢাকার বিস্‌তৃতি ঘটেছিল মোগল আমলের প্রারম্ভিক কালে। এই থানা ছিল মূলত সেনাছাউনী, সামরিক ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন সুরক্ষিত এলাকা যা বর্তমান ক্যান্টনমেন্টের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এই ক্যান্টনমেন্টের পাশে গড়ে উঠেছিল বেসামরিক বসতি, সামরিক প্রয়োজনে সেখানে বিভিন্ন পেশাজীবীদের গমনাগমন ঘটেছিল। এই পেশাজীবীদের মধ্যে তাঁতী, শাঁখারী, কামার, কুমার, সূত্রধর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই সময়কালেই ঢাকা মোগল রাজধানী হবার গৌরব অর্জন করে।

সেনাছাউনী সম্বলিত থানা-শহর থেকে রাজধানী শহরে উত্তোরণের ক্ষেত্রে ঢাকায় আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। এই পরিবর্তনে মূখ্য ভূমিকা রেখেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য যা ঐ সময়কালে একটি রাজধানীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হতো। ব্যবসায়িক যোগাযোগের উপর ভিত্তি করেই ঢাকায় ইউরোপীয়, আরমেনীয়, পাঠান, তুর্কী, মারোয়ারী, মোগল ও উত্তর ভারতীয় হিন্দুসহ সকল বিদেশী ও ভারতীয় বনিক, ব্যবসায়ী ও ব্যাংকার সবাই ঢাকায় আসতে শুরু করে।[২৮] এছাড়া প্রসাশনিক প্রয়োজনে বিভিন্ন সুবাদারদের সঙ্গে আমীর, ওমরা সহ বিভিন সংস্কৃতির পেশাজীবিদের

আগমনতো ছিলই। বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষেরা নিজস্ব ভাগ্য অন্বেষণে এই ঢাকায় এসে একদিকে যেমন ঢাকার বাণিজ্যিক গুরুত্বকে বাড়িয়ে তুলেছিল, তেমনি সূচনা করেছিল একটি সংমিশ্রিত সাংস্কৃতিক ধারা যা বিভিন্ন সংস্কৃতির জটিল মেলবন্ধনে গড়ে উঠেছিল। এই ধারায় বহির্ভারত, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক উপাদানের সম্মিলন দেখা যায়। পরবর্তীতে এই ধারাই ঢাকাই সংস্কৃতি হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠে। ঢাকাই সংস্কৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই মোগল ধারার প্রভাব শক্তিশালী হলেও নানাভাবে এই সংস্কৃতি বহির্ভারত ও স্থানীয় রীতিকে যত্ন সহকারে লালন করেছে।

উনিশ-বিশ শতকে ঢাকার মুসলিমরা শিয়া ও সুন্নী, এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। ঢাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সুন্নী হলেও সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে শিয়া সংস্কৃতি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। সতের শতকে ঢাকার শাসনকর্তা মুকরম খানের (১৬২৬-২৭) সময় ঢাকায় শিয়াদের আগমন ঘটে।[২৯] শাহ্ সুজার আমলে শিয়াদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত, তিনি নিজেও শিয়া হয়েছিলেন।[৩০] তার শাসনামলেই ১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে মীর মুরাদ নামে একজন শিয়া ঢাকায় বিখ্যাত হোসেনী দালান ও ইমামবাড়া নির্মাণ করেন।[৩১] ভাগ্যান্বেষণে ঢাকায় আগত শিয়ারা মোগল আমলেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজপদ লাভের মাধ্যমে সমাজে নিজেদের অভিজাত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল।[৩২] সুবাদারদের প্রতিনিধি নায়েব-নাজিমরাও ছিল শিয়া সম্প্রদায়ভূক্ত। ফলে তাদের সময় থেকেই শিয়া সংস্কৃতি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। সুন্নীতো বটেই, ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায়ও শিয়া সংস্কৃতিতে সমভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

উনিশ শতকে ঢাকার সমাজে সুন্নীদের বিশেষ করে নতুন নবাব পরিবারের আধিপত্য বৃদ্ধি পায়। অবশ্য তারাও ছিল প্রচলিত সংস্কৃতির প্রতি উদার। ফলে প্রচলিত সংস্কৃতির চর্চা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। নবাব আব্দুল গণি মুহররম, ঈদ ছাড়াও হিন্দুদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব কালীপুজা ও জন্মাষ্ঠমীর অনুষ্ঠানে অর্থ দান করতেন।[৩৩] জন্মাষ্ঠমীর মিছিলের পুরোভাগে তিনি জয়দেবপুরের রাজার সঙ্গে হাতির পিঠে থাকতেন।[৩৪] নবাব পরিবার হুসেনী দালানের মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত হয়েছিল। সঙ্গত কারণেই নবাব পরিবারের উপর অর্পিত হয়েছিল হুসেনী দালানের রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

নতুন নবাব পরিবারের কর্তা আলি মিয়া ছিল ঢাকায় অভিবাসী কাশ্মীরি সুন্নী মুসলিম। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর ধন সম্পদ অর্জন করেছিলেন। তিনি জমিদারি কেনার পাশাপাশি ঢাকার নাগরিক সমাজে বেশ প্রভাবশালী ব্যাক্তিত্বে পরিণত হন। নায়েব-নাজিমদের বংশ লুপ্ত হলে, ব্রিটিশ সরকার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আলি মিয়া ও তার পরিবারকে বংশানুক্রমিক 'নবাব' উপাধি দান করেছিল। নবাব পরিবার ঢাকার মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য কিছু দিনের মধ্যেই ঢাকার পঞ্চায়েত বেশ সুনাম অর্জন করেছিল। পাঁচ বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত পঞ্চায়েত সদস্য 'পাঁচ লায়েক বেরাদর' নামে পরিচিত ছিল। দলের প্রধান নির্বাচিত সর্দার বা মির-ই-মহল্লা যার নেতৃত্বে পরিচালিত হত পঞ্চায়েত। সর্দারের দায়িত্ব গ্রহণের দিন মহল্লার সবাই চাঁদা তুলে সর্দারকে পাগড়ি উপহার দিত। পঞ্চায়েতের সকল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সর্দারকে সহযোগীতার জন্য ছিল নায়েব সর্দার (উপ-সর্দার), লায়েক বিরাদার (দুইজন বয়োজ্যেষ্ঠ) আর গুরিদ (বার্তাবাহক)। মহল্লার বাসিন্দাদের পারিবারিক জীবনের সকল ঘটনা বা উৎসব যথা-জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যু পরবর্তী অনুষ্ঠান এই পঞ্চায়েত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হত।[৩৫] সামাজিক অনুষ্ঠানের তদারকি ছাড়াও পঞ্চায়েতের একটি প্রধান কাজ ছিল মহল্লার সব ধরনের বিবাদের মিমাংসা করা।[৩৬]

ঢাকার সংস্কৃতিতে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানগুলির মিথস্ক্রিয়া ছিল অত্যন্ত সাবলিল। বাংলার মুসলমানদের আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথায় পূর্ব পুরুষদের সংস্কার অনেক ক্ষেত্রেই বজায় ছিল। উদাহরণস্বরূপ, তারা জানত সন্তান জন্মের ষষ্ঠ রাত্রিতে হাটুইরা রাইত পালন করতে হয়। রোগ-শোক ও বিপদাপদে তারা লোকজ দেব-দেবীর শরণাপন্ন হত। এছাড়া তারা বসন্ত রোগের আরোগ্য দেবী শীতলা মায়ের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে নানা ধরনের আচার পালন করত। স্থানীয় মুসলমানদের সাথে বহিরাগত মুসলমানদের বিয়ে শাদীর ফলে এই সংস্কারগুলি তাদের মধ্যেও সংশ্লেষিত হয়েছিল। অবশ্য অভিবাসী মুসলিমরা তাদের সাথে করে অনেক ধরণের আচার-দর্শন নিয়ে এসেছিল, যেমন- সুফি ও পীরবাদ।[৩৭] অনুকূল পরিবেশ পেয়ে পীর-মুরিদ প্রথা এখানে বিশেষ প্রসার লাভ করে।[৩৮] এছাড়া হিন্দু-মুসলিম দীর্ঘ সহাবস্থানজনিত কারণে উভয়ের সংস্কৃতির সমন্বয়ে এখানে একটি মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। হিন্দু-মুসলিম উভয়েই পীরের দরগায় মানত করত, শিরনি চরাত। ঘটা করে উরস পালন করত। উনিশ শতকে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় ঢাকাতেও ইসলাম শুদ্ধিকরণের আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এনায়েত আলী

ও কেরামত আলীর নেতৃত্বে ঢাকা জেলার সংস্কারবাদীরা ক্রিয়াশীল ছিল। সংস্কারবাদীরা লোকদের মাজার ও দরগায় (দরবেশের সমাধি সৌধ) যাওয়া, উরস পালন, কাওয়ালী গান গাওয়া, মানত, মিলাদপড়া, শিয়াদের মুহররম পালন করা,[৩৯] শবেবরাতে রুটি বিতরন, বিবাহ অনুষ্ঠানে মারোচা নির্মাণ ও নাচগান করা, নবজাতকের জন্ম উপলক্ষে অনুষ্ঠান পালন করা[৪০] প্রভৃতি থেকে বিরত করার চেষ্টা করেছিলেন। ঢাকার সংস্কারবাদীরা আহলে হাদীস নামে পরিচিতি লাভ করে। ঢাকার ঐতিহ্যবাদী মুসলিমদের অধিকাংশই এই আন্দোলনে ছিল নিরুৎসাহী।

ঢাকার আধিবাসীদের মাঝে 'সুখবাস' ও 'কুট্টি' দুটি সম্প্রদায়ের কথা জানা যায়। কুট্টিরা ছিল খাস বাঙালি, আরও স্পষ্টভাবে বললে বলতে হয় বাংলাভাষী। ঢাকার বিভিন্ন পেশাজীবীদের মধ্যে শ্রমজীবী শ্রেণী।[৪১] কুট্টিদের অধিকাংশ ছিল অশিক্ষিত ও দরিদ্র। কিন্তু ঢাকায় তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।[৪২] কুট্টিদের জাত হিসেবে ছোট (কুট্টি) বা নিম্নবর্গীয় (সাবঅলটার্ন) মনে করা হত।[৪৩] কুট্টিরাও ছিল বহিরাগত অর্থাৎ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মোগল বা মোগলোত্তর সময়ে ঢাকায় আগত অভিবাসনকারি।

কুট্টি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত মতভেদ রয়েছে। বলা হয় কুঠি শব্দ থেকে কুট্টি শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। সাধারণত 'কুট্টি' বলতে ঢাকার সেইসকল আধিবাসীদের বোঝানো হয়, যারা 'কুঠি' বানাতে রাজমিস্ত্রির কাজ করত।[৪৪] আঠার শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকেই রপ্তানী বাণিজ্যে চাল ছিল একটি অন্যতম পণ্য। ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্র পূর্ববঙ্গের ঢাকায় রপ্তানীকারকরা গ্রামাঞ্চল থেকে ধান কিনে এনে মজুত করত। স্থানীয় শ্রমিকরা ধান থেকে চাল তৈরির কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। এই ধান কুটিয়েদের 'কুট্টি' বলা হত।[৪৫] ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে লিন্ডসে রিপোর্ট, ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে কালেক্টর ডে রিপোর্ট ও ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে কালেক্টর ওয়াল্টারের রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, ১৭৭০, ১৭৮১, ১৭৮৪, ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মহা দুর্ভিক্ষের সময় বৃহত্তর বিক্রমপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন এসে ঢাকার দোলাই নদী, পান্ডু নদী ও আরামবাগের খালের দুই তীরের নিম্নভূমিতে বসতি স্থাপন করে।[৪৬] এরা ভিক্ষাবৃত্তিকে পছন্দ করেনি। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ পরিবেশ থেকে আগত এই জনগোষ্ঠীর অনেকেই ধান কোটাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিল। এই কুট্টিরা শুধু ধান কোটা নয়, উনিশ শতকের শেষের দিকে ঢাকা শহরের চালের খুচরা বাজার নিজেদের দখলে আনতে সক্ষম হয়।[৪৭] মতান্তরে, যারা শহরে ধান, ডাল কিংবা সুরকি অথবা যেকোন ধরণের কোটার আজ করত, তাদেরকে কুট্টি

Dhaka University Institutional Repository

বলা হত।[৪৮] কোটাকুটির কাজ ছাড়াও কুট্টিরা শহরে বিভিন্ন ধরণের পেশাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ১৮৩৮ সালে লোক গণনার সময় ঢাকা শহরের অধিবাসীদের পেশাভিত্তিক তালিকা করা হয়। তাতে ১৩৮ ধরণের পেশাজীবীদের মধ্যে কুট্টিদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য।

'সুব্বাসী' শব্দটি 'সুখবাসী' শব্দ থেকে বুৎপন্ন।[৪৯] ঢাকার অপর আদিবাসী সম্প্রদায় 'সুব্বাসী' বা 'সুখবাস' ছাড়াও 'ঘুশবাস'[৫০] বা 'খোশবাস',[৫১] 'খুশনাশিন'[৫২] নামেও বিশেষিত হয়ে আসছে, যার অর্থ সুখে বসবাসকারী। সুব্বাসী বা খোশবাসরা বর্হিবাংলা থেকে ঢাকায় আগমনকারী অভিবাসীদের বংশধর। মোগল আমলে প্রশাসনিক, সামরিক ও বাণিজ্যিকসহ নানা কারণে এরা ভারতের আগ্রা, দিল্লিসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে ঢাকায় বসতি স্থাপন করে। এদের অধিকাংশের ভাষা ছিল হিন্দুস্থানি। তবে আগমনকারীদের মধ্যে উর্দুভাষীদের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। সুখবাসীরা ছিল ঢাকা শহরের অভিজাত সম্প্রদায়। তারা একদিকে ছিল শিক্ষিত, ধনী, রুচিশীল, মার্জিত, শৌখিন, অন্যদিকে তাদের অনেকেই ঢাকায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। হাকিম হাবিবুর রহমান তার 'ঢাকা পাচাশ বারস পহেলে' গ্রন্থে সুখবাস সম্পর্কে বলেন-"খোশবাস বা সুখ, ঢাকায় বসবাসকারী সেইসব লোক যারা মুগল গভর্নরদের সঙ্গে এখানে আগমন করেন এবং যাদের ভাষা উর্দু এবং সাধারণতঃ পরিশীলিত রুচি ও সংস্কৃতির অধিকারী।"[৫৩]

মোগল আমলে ধোলাইখাল ঢাকা শহরকে দুভাগে ভাগ করে রেখেছিল। একসময় এই খালের পূর্ব দিকে বাস করত কুট্টিরা আর পশ্চিমে সুখবাসীরা। রায়সাহেব বাজার, নারিন্দা, সুরিটোলা, মৈশুন্ডি, বংশাল, নাজিরা বাজার, কাজি আলাউদ্দিন রোড, নয়া বাজার, সোয়ারিঘাট, মালিটোলা, মুকিম কাটারা ইত্যাদি এলাকায় কুট্টিদের আবাস গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে, চকবাজার, বেগমবাজার, ইসলামপুর, উর্দুরোড, চুরিহাট্টা, লালবাগ, হোসেনি দালান, খাজে দেওয়ান ইত্যাদি এলাকা ছিল সুব্বাসীদের নিবাস। এছাড়া মিশ্র এলাকা হিসেবে গড়ে উঠে সূত্রাপুর, কলতা বাজার, লক্ষী বাজার, ধোলাই খাল। বর্তমানে পুরোনো ঢাকাতো বটেই ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় এরা একত্রে বসবাস করছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে কুট্টিরা তাদের অবস্থা ও অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। কালক্রমে উভয় শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি হয়। সেইসাথে তাদের পূর্বকার অবস্থান ও সংস্কৃতিগত প্রেক্ষাপট প্রায় বিলুপ্ত হবার পাশাপাশি এলাকাভিত্তিক পরিচয়ও লোপ পায়।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু জনগোষ্ঠী পুরোনো ঢাকার অপর উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায়। ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায় বহু পূর্ব থেকেই চতুর্বর্ণ প্রথায় অভ্যস্থ ছিল- ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও শুদ্র। শুদ্রদের আবার দুই ভাগ উচ্চ ও নিম্ন।[৫৪] আরাধ্য দেবতার দিক থেকে শহরের বাসিন্দারা বৈষ্ণব হলেও কালি, দুর্গা ও কৃষ্ণের উপাসকে বিভক্ত ছিল।[৫৫] উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ায় ঢাকার হিন্দু সমাজে ব্যবসায় ও কারিগররা ছিল বৈষ্ণব ধর্মাম্বলীরা। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রভাবশালী অংশ ছিল ব্রাহ্ম।[৫৬]

মোগল ও মোগলোত্তর কালে জীবিকার অন্বেষণে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ঢাকায় আগত হিন্দু অভিবাসীরা কালক্রমে বাঙ্গালীদের সাথে মিশে গেলেও তারা স্থানীয় বর্ণক্রমে প্রবেশ করতে পারেনি। এরফলে হিন্দু সম্প্রদায় জাতপাত সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছিল।[৫৭] সৃষ্টি হয়েছিল জাতপাত সংক্রান্ত নতুন রীতিনীতি। হিন্দু সম্প্রদায়ে গড়ে উঠেছিল পেশাভিত্তিক বর্ণ সমাজ। রাজধানী ঢাকার প্রারম্ভিক কাল থেকেই হিন্দু পেশাজীবি ও শিল্পিশ্রেণী নিজ নিজ পেশা অনুসারে সংঘবদ্ধভাবে একই মহল্লায় বসবাস শুরু করে। উনিশ শতকে আধা হিন্দু জাতগুলোকে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। নতুন পেশা গ্রহণ করায় সুপ্রতিষ্ঠিত জাতগুলি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেছে। সেইসাথে লুপ্ত হয়ে গেছে অনেক বর্ণ ও পেশা। পেশা ছিল বর্ণের ভিত্তি। সে পেশার লোকজন মিশে গেছে অন্য পেশার সঙ্গে। তবে এখনো হিন্দু সমাজে জাতি/বর্ণ/ পেশাগত বিভেদ একেবারে দূর হয়নি।[৫৮] সেকারণে তাদের আচার পালনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ঢাকার বর্ণভিত্তিক প্রতেক্যের পুরোহিত ব্রাহ্মণও আলাদা।

সীমাবদ্ধতা:

১.গবেষণার সময় সল্পতা।

২.জাতিভেদ প্রথার কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বর্ণের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে দীর্ঘসূত্রীতা।

৩.তথ্য সংগ্রহের সঠিকতা যাচাই বাছাইয়ে সীমাদ্ধতা।

৪.তথ্য নমুনায়ন ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি ও নীতিমালার অনুপস্থিতি।

অধ্যায় বিভাজন:

Dhaka University Institutional Repository

পুরোনো ঢাকার দুই বিশেষ সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমান। এক্ষেত্রে দুই সম্প্রদায়ের জীবনের তিনটি পর্যায় জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভ পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়সমূহে রয়েছে-

প্রথম অধ্যায়ঃ এই অধ্যায়ে অভিসন্দর্ভের তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতকে আলোচনা করা ও বিষয়ভিত্তিকভাবে এই প্রেক্ষিতসমূহকে অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে ব্যখ্যা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। সেই আলোকে ঢাকার ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। পুরোনো ঢাকার সীমানা, অধিবাসীর সংজ্ঞা, তার বৈশিষ্ট্য, কাঠামো, সাংস্কৃতিক জীবন এবং সাংস্কৃতিক একক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ এই অধ্যায়ে উনিশ ও বিশ শতকে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের শিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে প্রচলিত লোকবিশ্বাস ও লোকাচারসমূহের প্রকৃতি ও এর তাৎপর্য আলোচনা করা হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভে জন্মকেন্দ্রিক বিষয়সমূহের আলোচনা চার পর্যায়ে বিভক্ত- এক. গর্ভধারণ পূর্বক, দুই. গর্ভধারণকালীন, তিন. প্রসবকালীন, চার. প্রসবোত্তর লোকাচার। প্রথম পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হল রজোদর্শনকালীন লোকাচার, বন্ধ্যাত্ব, গর্ভদোষ, গর্ভোৎপত্তির লক্ষণ ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্যায়ে গর্ভকালীন সতর্কতা, সাধভক্ষণ, গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গের পরিচয় ইত্যাদি প্রনিধাণযোগ্য। তৃতীয় পর্যায়ে সহজ প্রসবের লৌকিক পদ্ধতিসমূহ ও প্রসবকালীন বিভিন্ন লোকাচারসমূহের আলোচনা। চতুর্থ পর্যায়ে শিশু ভূমিষ্ঠকালীন লোকাচার থেকে শুরু করে অশুচ ঘরে পালিত আচার, অন্নপ্রাশন ও শিশু শৈশবের বেড়ে উঠাকে উপলক্ষ করে নানাবিধ সাংস্কৃতিক হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ এই অধ্যায়ে বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে হিন্দু ও মুসলিমদের পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা, বিভিন্ন উপকরণের সংস্থান, উপকরণ ও আচারের কার্যকারণ ইত্যাদি। অধ্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপনের মূল লক্ষ্য ছিল একটি আচরিক কর্মকান্ড হিসেবে 'বিয়ে' সংক্রান্ত ধারণার আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যায়ন এবং কালক্রমে এই ধারণাটির হিন্দু-মুসলিমের সামগ্রিক ক্ষেত্রীয় সংশ্লেষণ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়: এই অধ্যায়ে পৃথকভাবে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মৃত্যু ও শেষ কৃত্যাদিতে বিভিন্ন প্রথা ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মূল্যবোধ, ধর্মের সংশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য আলোচ্যের মধ্যে মৃত্যু পূর্বকালীন আচার, মৃতের সৎকার, পরিবার সদস্যদেও পালনীয় কর্তব্য ইত্যাদির আলোচনা করা হয়েছে। ধর্মীয় , সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: পূর্ববর্তী তিনটি অধ্যায়ের তথ্য ও উপাত্ত পর্যালোচনাপূর্বক আলোচ্য অধ্যায়ে অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি:

গ্রন্থাগার জরিপ: গবেষণার বিষয়বস্তু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, বই পুস্তক ও গবেষণা প্রবন্ধ অধ্যয়নের জন্য গ্রন্থাগার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সরেজমিন জরিপ: গবেষণার লক্ষ্যে পরিচালিত জরিপটি পদ্ধতিগতভাবে জনজরিপ কেন্দ্রিক (Demographic type)। এ কারণে জরিপটি পরিচালিত হয়েছে পুরোনো ঢাকার স্থানীয় ও আদি অধিবাসীদের মধ্যে যারা বর্তমানে পুরোনো ও নতুন উভয় ঢাকায় বাসিন্দা। এর ফলশ্রুতিতে গবেষনায় ভৌগলিক ব্যপ্তি সমগ্র ঢাকা।

প্রশ্নপত্র প্রস্তুত ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ: প্রশ্নপত্র তৈরির ক্ষেত্রে open end and close end পদ্ধতির সময় ও ব্যবহার উপযোগী পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণে একক সাক্ষাৎকার, যৌথ সাক্ষাৎকার, FGD (Focus group discussion) ইত্যাদি কৌশলগুলি প্রণয়ন করা হয়েছে।

নমুনায়ন: বহু পর্যায়ী নমুনায়নের (multi stage) মাধ্যমে জনবসতি (পুরোনো ঢাকার বাসিন্দা) ও প্রশ্নপত্র প্রণয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। জনজরিপে গবেষকের সিদ্ধান্ত (Judgement sampling) বিভিন্ন পর্যায়ে (উপাত্ত সংগ্রহের ধরণ, প্রকৃতি, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন) মূল ভূমিকা পালন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ: প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তকে গবেষণার লক্ষ্যে প্রক্রিয়াজাতকরণে তথা সংস্কৃতির ইতিহাস ও প্রক্রিয়াকে নির্ণয় করার জন্য ঢাকার তৎকালীন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্য নির্দেশঃ

১. সায়েদা ফাতিমা, (২০১০), নগর ঢাকা ও তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ১৯১১ পর্যন্ত, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যাঃ৩১-৩২, পৃঃ২০৪

২. ড. এ. এইচ দানী, (২০০৫), *কালের সাক্ষী ঢাকা*, আবু জাফর অনূদিত, খোসরোজ কিতাব মহল, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃঃ১১।

৩. এফ. বি. ব্রাডলী বার্ট, (২০০৬), *প্রাচ্যের রহস্য নগরী ঢাকা*, রহীম উদ্দিন সিদ্দিকী অনূদিত, সাহিত্য প্রকাশনালয়, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃঃ১৫৬-১৫৭।

৪. রফিকুল ইসলাম, (২০০১), *ঢাকার কথা ১৬১০-১৯৪৭*, আহামদ পাবলিশিং হাউস, জিন্দাবাহার, ঢাকা, পৃঃ১২।

৫. *Banglapedia*, Bangla and English combind CD Edition- 2007.

৬. Abdul Momin Choudhury, (2006), *`Site and Surrounding; Hundred years of Bangabhaban*, Press wing Bangabhaban, Dhaka, p: 3.

৭. আলী ইমাম, (২০০৯), *জাহাঙ্গীর নগর থেকে ঢাকা*, সৃজনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃঃ ১৫।

৮. Dhakatown.net. (2009). *Dhaka city map* . Retrieved September 13, 2012, from Dhakatown.net: http://www.dhakatown.net/images/DhakaMaps/012-Dhaka%20map%20pre-Mughal%20rule.gif

৯. মুনতাসীর মামুন, (২০০১), *উনিশ শতকের ঢাকা*, অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃঃ৯।

১০. প্যাট্রিক গেডেডস, (১৯৯০), *ঢাকা নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রতিবেদন ১৯১৭*, ঢাকা নগর জাদুঘর, গ্রীণরোড, ঢাকা, পৃঃ২১।

১১. Dhakatown.net. (2009). *Dhaka city map* . Retrieved September 13, 2012, from Dhakatown.net: http://www.dhakatown.net/images/DhakaMaps/013-Dhaka%20city%20Mughal%20Capital.gif

১২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. আবদুল করিম, (২০০৩), *মোগল রাজধানী ঢাকা*, ড. মোহাম্মদ মুহিবউল্ল্যাহ ছিদ্দিকী অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ:১০-১১।

১৪. মুনতাসীর মামুন, (২০০৩), *ঢাকা সমগ্র-১*, অন্যন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ:২২৪।

১৫. সিরাজুল ইসলাম, (২০০৭), 'রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট,' অন্তর্ভুক্ত: *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭০৪-১৯৭১), সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, ১ম খন্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, নিমতলী, ঢাকা, পৃ:১।

১৬. মুনতাসীর মামুন, (২০০৬), *উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সমাজ*, সাহিত্য বিলাস, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ:৭৯।

১৭. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, (২০০১), *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ঢাকা, ধানমন্ডি, পৃ:৬।

১৮. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, (২০০৭), 'নগরায়ন এবং নগর সংস্কৃতি', অন্তর্ভুক্ত: *সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, কে.এম মোহসীন ও শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, নিমতলী, ঢাকা, পৃ:৪০৮।

১৯. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সমাজ*, পৃ:২১৩।

২০. ফিরোজা ইয়াসমীন সম্পাদিত, (২০১০), *ঢাকাই উপভাষা প্রবাদ-প্রবচন কৌতুক ছড়া*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, নিমতলী, ঢাকা, পৃ:১২।

২১. Dhakatown.net. (2009). *Dhaka city map* . Retrieved September 13, 2012, from Dhakatown.net: http://www.dhakatown.net/images/DhakaMaps/015-%20Dhaka%20city%20capital%20of%20E%20bengal%20assam%201905-11.gif

২২. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১, পৃ:১৫৬।

২৩. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, (২০০৭), 'নগরায়ন এবং নগর সংস্কৃতি', অন্তর্ভুক্ত: *সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, কে.এম মোহসীন ও শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, নিমতলী, ঢাকা, পৃ:৪১৪।

Dhaka University Institutional Repository

২৪. আহমেদ কামাল, (২০০৭), 'স্বাধীনতার সময়ে পূর্ববাংলা', অন্তর্ভুক্ত:, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, ১ম খন্ড, পৃ:৩১৫।

২৫. প্যাট্রিক গেডেডস, পূর্বোক্ত, পৃ:২৬।

২৬. বদরুদ্দীন উমর, (২০০৭), 'ভাষা আন্দোলন', অন্তর্ভুক্ত: *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, ১ম খন্ড, পৃ:৩৩৭।

২৭. Entourage-bd.com. (2007). *Dhaka City.* Retrieved September 13, 2012, from Entourage-bd.com: http://entourage-bd.com/bangladesh/map/dhk-map-big.jpg

২৮. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১, পৃ: ১৫।

২৯. ওয়াকিল আহমদ, (১৯৯৭), *উনিশ শতকে বাঙ্গালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ: ৪৩৭।

৩০. গোলাম মুরশিদ, (২০০৬), *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, সূত্রাপুর, ঢাকা, পৃ; ৪৪।

৩১. মো: আখতারুজ্জামান, (২০০৭), 'ধর্মীয় চিন্তা ও অনুশীলন', অন্তর্ভূক্ত: *সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, কে. এম মোহসীন ও শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত, পৃ: ২৮২।

৩২. মুনতাসীর মামুন, ঢাকা সমগ্র-১, পৃ: ১৯২।

৩৩. মুনতাসীর মামুন, (২০০৪), *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ১ম খন্ড, অন্যন্যা, বাংলা বাজার, ঢাকা, পৃ: ২৩।

৩৪. মুনতাসীর মামুন, (২০১০), *ঢাকার স্মৃতি-৯*, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা, পৃ:৩২।

৩৫. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১, পৃ: ২১।

৩৬. মুনতাসীর মামুন, ঢাকা সমগ্র-১, পৃ: ১০৮।

৩৭. রানা রাজ্জাক, (২০০৭), 'সাংস্কৃতিক জীবনে বিবর্তন', অন্তর্ভূক্ত: *সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, কে. এম মোহসীন ও শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত, পৃ: ১২৪।

৩৮. নজরুল ইসলাম, (১৪০২), *বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা, পৃ:৬০।

৩৯. রানা রাজ্জাক, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪০. জেমস ওয়াইজ, (১৯৯৯), *পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, প্রথম খন্ড, ফওজুল করিম অনূদিত, মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, আইসিবিএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃঃ ৫১।

৪১. শায়লা পারভীন, (২০১০), 'ঢাকাই প্রবাদ-প্রবচন', অন্তভূর্ক্তঃ *ঢাকাই উপভাষা প্রবাদ-প্রবচন কৌতুক ছড়া*, ফিরোজা ইয়াসমিন সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, নিমতলী, ঢাকা, পৃঃ ২৩৪।

৪২. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা সমগ্র-১*, পৃঃ ১০৭।

৪৩. মনিরুজ্জামান, (২০১০), 'পবির্তনশীরল ঢাকাই উপভাষা', অন্তভূর্ক্তঃ *ঢাকাই উপভাষা প্রবাদ-প্রবচন কৌতুক ছড়া*, ফিরোজা ইয়াসমিন সম্পাদিত, পৃঃ ১৫২।

৪৪. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, (প্রধান সম্পাদক), (১৯৬৫), *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ৭৬।

৪৫. মুন্‌শী রহমান আলী তায়েশ, (২০০৭), *তাওয়ারিখে ঢাকা*,ড.এ.এম.এম. শরফুদ্দীন অনূদিত ও সম্পাদিত, দিব্য প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃঃ ৭৮।

৪৬. হাকিম হাবিবুর রহমান, (১৯৯৫), *ঢাকা পাচাস বারাস পহেলে*, হাশেম সূফী অনূদিত, ঢাকা ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, পৃঃ ২৫।

৪৭. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১*, পৃঃ১১৮।

৪৮. নাজির হোসেন, (১৯৯৫), *কিংবদন্তির ঢাকা*, ৩য় সংস্করণ, থ্রিষ্টার কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ, ঢাকা, পৃঃ ২৯।

৪৯. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, (২০০৮), *ঢাকার ইতিবৃত্ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি*, গতিধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃঃ ৪৩।

৫০. Syed Md Taifoor, (1956), *Glimpses of Dhaka,* Dhaka, p. 52.

৫১. মুনতাসীর মামুন, (২০০৯), *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ২য় খন্ড, অন্যন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃঃ ৫৪।

৫২. মনিরুজ্জামান, 'পরিবর্তনশীল ঢাকার উপভাষা', ঢাকাই উপভাষা প্রবাদ-প্রবচন কৌতুক ছড়া, পৃঃ ১৪৩।

৫৩. হাকিম হাবিবুর রহমান, (২০০৫), *ঢাকা পাচাস বারাস পহেলে*, ড. মোহাম্মদ রেজাউল করিম অনূদিত, প্যাপিরাস, ঢাকা, পৃঃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

৫৪. রংগলাল সেন, (২০০৩), 'ঢাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা', অন্তর্ভূক্তঃ *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরীঃ বিবর্তন ও সম্ভাবনা*, ইফতিখার-উল-আউয়াল সম্পাদিত, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা, পৃঃ ৭৯।

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ৭৯,মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা সমগ্র-১*, পৃঃ ৬৪।

৫৬. রংগলাল সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

জন্ম

মানুষ সৃষ্টি করেছে সভ্যতা, স্বীকৃতি দিয়েছে ইতিহাসের। আজকের সমাজ ও সংস্কৃতির বিনির্মাণে মানব জন্ম ভূমিকা রেখেছে সর্বাগ্রে ও সর্বান্তকরণে। আধুনিক সভ্যতা স্মরণ করেছে প্রাক সভ্যতাকে, যেখানে ইতিহাসের পূর্বের অভিজ্ঞতাবাদের আবিষ্কারিক হিসেবে মানুষ সময়কে বদলে দিয়েছে। সংজ্ঞায়িত করেছে স্থান, কাল, পাত্র সামঞ্জস্যে সবকিছুকে। মানুষের জন্ম তা-ই মানুষের সভ্যতার সূতিকাগার। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষ নিজ স্বীকৃতি অর্জন করেছে নিজের কাছ থেকেই। মানব জন্ম মানুষের ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাস। সংস্কৃতির বিবতর্ন জানার লক্ষ্যে এ কারণে সবার আগে জানতে হবে মানুষের জন্ম ইতিহাসকে। যে ইতিহাস নানা পথ পরিক্রমায় নানাভাবে নিজ পরিচয় ও প্রক্রিয়াকে তৈরি করেছে ও তুলে ধরেছে। সততই এই প্রক্রিয়া স্থান, কালভেদে বিচিত্র ও বিশেষায়িত। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা ধারণ করে আছে সমকালীন সর্বোচ্চ আনুষ্ঠানিকতা, আচার ও তত্ত্বাবধান। সৃষ্টির সেরা মানুষ আর তাই তার জন্ম সমাজ ও সভ্যতায় অধিকার করে আছে সর্বোচ্চ সম্মান ও রীতির। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য খ্রিষ্টীয় যুগে শিশুর জন্মকে উপাসনালয়ে ব্যাপটাইজ করতে হত, যা তৎসমাজে সর্বোচ্চ স্বীকৃত ছিল। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই আচার ও সংস্কৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ মানুষ শিশু জন্মের স্বীকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। যথাবিহিত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি (বিবাহ প্রথা) ব্যতিরেকে জন্মানো শিশুকে স্বীকৃতি দেয়নি মানুষ, ধর্ম ও সমাজ। বিশেষ করে সভ্যতার শুরু থেকেই ধর্ম ও প্রথা নিয়ন্ত্রণ করেছে সমাজ ও সভ্যতাকে। এই নিয়ন্ত্রণ স্থান ও কালভেদে ভিন্ন হলেও এর নিয়ন্ত্রণ বরাবরই অধিপতিশীল। আমাদের আলোচ্য গবেষণায় যে সমাজ ও সংস্কৃতির আওতায় মানব জন্মকে আলোচনা করেছে তা-ও ধর্মীয় আবহে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। বিশেষত উনিশ শতকে যখন বাংলায় সনাতনী হিন্দু ধর্ম, ক্রমপ্রসারমান ইসলাম ও নবাগত খ্রিষ্টীয় ধর্মের প্রভাবে একটি আন্ত:সম্পর্কিত সমাজের দ্বান্দিক প্রেক্ষিত তৈরি হয়েছিল। তবে শেষোক্ত খ্রিষ্টীয় ধর্মের প্রভাব তখনো স্থানীয় সংস্কৃতিতে প্রকট হয়ে উঠেনি। খ্রিষ্টীয় যুগের হিন্দু ধর্ম, স্থানীয় লোকাচার, প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৈষ্ণব আন্দোলনের আন্ত:সংশ্লেষণে বিবর্তিত ও একটি সংস্কারমুখী ধর্মের স্বরূপ তৈরি করেছে। অপরদিকে এই স্বরূপ তৈরির প্রেক্ষাপট রচিত করেছে তখনো পর্যন্ত নতুন ধ্যান ধারণায় সিক্ত ইসলাম। নতুন বলা হচ্ছে এ কারণে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় ইসলামের আগমন ধর্মীয় ভাবধারায় ঘটেনি তা সূফিদের মাধ্যমেই হোক অথবা তরবারির মাধ্যমেই

Dhaka University Institutional Repository

হোক। তখনকার ধর্মীয় ভাবধারায় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রাধান্য পেলেও মুসলিম সমর নায়করা সমাজ ও সংস্কৃতি বিনির্মাণে স্থানীয় চর্চা ও অভ্যস্থতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ কারণে 'ইসলাম' পরবর্তীতে উনিশ শতকে ফরায়েজি আন্দোলনে নতুন করে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। অনেক ইসলামী আচার-আচরণ এ সময়ে ইসলামী পরিভাষায় পরিত্যাজ্য হয়েছে। এভাবেই এই সময়কাল পরিচিত হয়েছে পুরোনো একটি ধর্মের নতুন পরিকাঠামোতে। আমরা বর্তমান আলোচনায় পরস্পর দ্বান্দিক এই ধর্মের আওতায় বিকশিত মানব জন্মের বিভিন্ন আচার সংস্কার ও কুসংস্কার নিয়ে আলোচনা করব।

রজোদর্শনকালীন লোকাচার:

পুরোনো ঢাকার সমাজে পূর্বে কিশোরী কন্যার প্রথম রজোদর্শনকে উপলক্ষ করে পালিত হত বিভিন্ন ধরণের আনুষ্ঠানিকতা। ঢাকার ধোবানী ও মুসলিম নারীদের কেউ কেউ তাদের ঋতুমতী কন্যার জন্য এলাকার পাঁচ বাড়ি থেকে চাল বা খুদ চেয়ে আনত।[১] সেটা লবণ ছাড়া জাউভাতের মত রান্না করে রজ:স্বলাকে তিনদিন খাওয়ানো হত। সে ইচ্ছে করলে এর সাথে ঘি-চিনি মিশিয়ে খেতে পারত। তবে এসময় তাকে কোন প্রকার লবণাক্ত খাবার খেতে দেয়া হত না। মাসিক ঋতুস্রাবে দুর্গন্ধ ও বিভিন্ন ধরণের শারীরিক সমস্যা এড়াতে সাত দিন পর্যন্ত রজ:স্বলা মাছ, মাংস, ডিম, দুধ খাওয়া থেকে বিরত থাকত।[২] ধোবানীরা আদ্যঋতুর দ্বিতীয় দিনে ঋতুমতীকে স্নান করিয়ে পরিধেয় ওড়নায় অল্প পরিমাণ পান-সুপারি দিয়ে পেটের সাথে বেঁধে দিত। এরপর ঋতুমতীকে ঘরে এনে তার ওড়নার বাঁধন খুলে পান-সুপারি বের করে তা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হত। ঢাকার শাঁখারীরা কিশোরী কন্যার প্রথম ঋতুমতীতে ব্রাহ্মণের মন্ত্রপড়া দুধ-কলা খাইয়ে তাকে পরিশুদ্ধ করত।[৩] মুসলমানদের কারো কারো রেওয়াজ অনুযায়ী, কিশোরী কন্যার প্রথম রজোদর্শনের সংবাদ তার নানার বাড়িতে পাঠানো হত। সংবাদ পেয়ে তার নানা-নানী-মামা-খালারা তাকে দেখতে আসত। সাথে করে তার জন্য নতুন কাপড় আনত। আদ্যঋতুর তৃতীয় দিনে ঋতুমতী স্নান করে সেই কাপড় পরিধান করত। সেদিন ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজনদের নিমন্ত্রণ করত অনেকেই। অতিথিদের অনেকেই আবার রজ:স্বলার জন্য উপহার নিয়ে আসত। সবাই মিলে ক্ষীর রান্না করে রজ:স্বলাকে খাওয়াত।

অতীতে ঢাকায় বাল্যবিবাহ প্রথা চালু থাকায় সাত-আট বছরের শিশু কন্যার বিয়ে হয়ে যেত। বালিকাবধূ রজ:স্বলা না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা হত। শ্বশুড়বাড়িতে বালিকাবধূ শ্বশুড়-

Dhaka University Institutional Repository

শাশুড়ি কিংবা ননদের সাথে ঘুমাত। অনেকক্ষেত্রে পিতা-মাতা তার শিশু কন্যাকে রজ:স্বলা না হওয়া পর্যন্ত নিজ গৃহেই রেখে দিত। কিশোরী কন্যা প্রথম ঋতুমতী হলেই তার মা মেয়ের-শ্বশুড়ালয়ে গিয়ে বেয়াইনের মুখে লাল রং ছিটিয়ে দিয়ে আসত।[৪] পরদিন সকালবেলা বরের মা পুত্রবধূর জন্য নববস্ত্র, খুদ, ঘি আর ঝুড়িভর্তি বাজার (পাঁচ প্রকার প্রতিরকম মিষ্টি, ফল, মাছ, শাক ও সবজি) পাঠাত।[৫] বরের মা দুপুর বেলায় তার আট-দশ জন আত্মীয় স্বজনদের সাথে নিয়ে পুত্রবধূকে দেখতে আসত। সেখানে তাদের জন্য পোলাও-কোরমা রান্না করা হত। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সবাই মিলে রং খেলত। এ সময় রং খেলাকালে প্রতিবেশীদের সরব অংশগ্রহণ চোখে পরার মত ছিল।[৬]

বালিকাবধূ শ্বশুড়ালয়ে ঋতুমতী হলে এই খবর তার পিত্রালয়ে জানানো হত। সেখান থেকে লোক আসত তাকে পিত্রালয়ে নিয়ে যেতে। তারা মাথায় করে আনত একটি থালা। থালায় থাকত আতপ চাল, লাল রং, একটি সাদা শাড়ি আর এক লোটা পানি। ঋতুমতীর শ্বশুড়-শাশ্বড়ি তাদেরকে বলত- 'আপওনোকো দাওয়াত দিয়া হামোকা বাউকা জো বাচ্চা হুয়া।'[৭] লোটার পানিতে লাল রং গুলিয়ে সাদা শাড়িটি রাঙ্গানো হত। শুকিয়ে যাবার পর সেটি রজ:স্বলা পরিধান করত। লবনবিহীন আতপ চালের জাউ খেয়ে রজ:স্বলা-বধূ পিতৃগৃহে চলে আসত। পিত্রালয়ে সাতদিন অবস্থানের পর পুনরায় শ্বশুড়ালয়ে প্রত্যাবর্তন করত। সেদিন শাশুড়ি কর্তৃক পালিত হত 'থাল খিলানি' লোকাচার। এই লোকাচার পালনের উদ্দেশ্য কিশোরী বধূর 'আঁচল পাক' করা। প্রথম আদ্যঋতুর সাত দিনে বধূকে থাল খাইয়ে আঁচল পাক না করালে সেই বধূর শাড়ির আঁচলের নীচ দিয়ে কোন শিশু গেলে তার মাথায় খুজলিপাচরা হয় বলে বিশ্বাস প্রচলিত। এই ক্রিয়াকর্মটি তাদের কাছে একটি টোটকা হিসেবে পরিচিত। এই টোটকাটি প্রথমবার করলে পুণরায় পালন করার প্রয়োজন পরে না। থাল খিলানি অনুষ্ঠান উপলক্ষে আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করা হত। উক্ত অনুষ্ঠানে কিশোরী-বধূ সারাদিন রোজা রাখত। অপরাহ্নে বাড়ির অন্য ত্রয়োরা কিশোরী-বধূর গায়ে হলুদ ও মাথায় সোন্ধা-গিলা বাটা মাখত। মাগরিবের আযান দিলে কিশোরী-বধূকে স্নান করিয়ে মধু মিশ্রিত পান[৮] খাওয়ানো হত। এরপর বধূকে নতুন শাড়ি পরিয়ে মাথায় লম্বা ঘোমটা দিয়ে ঘরে আনা হত। এই সময় বধূ তার চোখ বন্ধ করে রাখত এবং চোখ বন্ধ রেখেই সে ঘরের মেঝেতে বিছানো শীতলপাটিতে বসত। তার মুখোমুখী সাতজন শিশুকে বসানো হত। বধূর সামনে একটি থালায় রক্ষিত থাকত পাঁচ রকমের মিষ্টি-ফল-পিঠা আর চালের খামির দিয়ে তৈরি একজোড়া বিপরীত লিঙ্গের পুতুল। কিশোরী-বধূ চোখ বন্ধ রেখেই পরপর তিনবার করে একটি পুতুল তুলে ধরত।

Dhaka University Institutional Repository

ছেলে ও মেয়ে পুতুলের মধ্যে প্রথমবার এবং অধিকবার যে লিঙ্গের পুতুল সে তুলে ধরবে, তার প্রথম সন্তান অনুরূপ লিঙ্গের হবে বলে ধারনা করা হত। বাড়ির এয়োরা থালায় রক্ষিত সব রকমের খাবার থেকে একটু একটু করে কিশোরী-বধূকে খাইয়ে দিত। বধূর খাওয়া শেষ হলে অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত সবাই থালা থেকে খাবার তুলে নিয়ে কাড়াকাড়ি করে খেত। এ নিয়ে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠত সবাই। অতিথিদের মধ্যে ঘনিষ্টজনেরা রাতভর গল্প গুজবে কাটিয়ে দিত।

বিয়ের পর শ্বশুড়বাড়িতে নববধূ প্রথম রজঃস্বলা হলে গোয়ালা শাশুড়ি ঠাকুর বাড়ি যায়। ব্রাহ্মণ ঠাকুরের দেয়া শুভ দিন, ক্ষণ অনুযায়ী আদ্যঋতুর তৃতীয়, চতুর্থ অথবা সপ্তম দিনে 'গোদভারাই'[৯] অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিরা সবাই মিষ্টি নিয়ে আসে।[১০] নববধূর পিত্রালয় থেকে মেয়ে আর মেয়ের জামাই-এর জন্য নববস্ত্র'র সাথে মিষ্টি, পান, সুপারি ও কলা পাঠানো হয়। এ পর্বাহ উপলক্ষে নববধূর উপবাস থাকার রীতি। ঐদিন সে নখ কেটে, মাথা পরিষ্কার করে ধুয়ে স্নান সেরে মায়ের দেয়া নতুন শাড়ি পরিধান করে। স্নানাগার থেকে লম্বা ঘোমটা টেনে বের হয়, যাতে তার চেহারা দেখা না যায়। ঘরে প্রবেশকালে দরজার সামনে রাখা জ্বলন্ত প্রদীপের মধ্যে সে খানিকটা সরিষাদানা নিক্ষেপ করে। এরপর প্রদীপটি উল্টে ফেলে বাম পায়ের গোড়ালি দিয়ে প্রদীপটি ভেঙ্গে চোখ বন্ধ করে ঘরে ঢোকে। ঘরের মেঝেতে পাতা শীতলপাটিতে তাকে শিশুদের পাশে বসানো হয়। নববধূ চোখ খুলে শিশুদের দিকে তাকায়। এই সময় তার স্বামীও শাশুড়ির দেয়া নববস্ত্র পরিধান করে স্ত্রীর পাশে উপবেশন করে। একটি থালায় করে পান, সুপারি, কলা ও ডাব এনে স্বামীর কাছে দেয়া হয়। স্বামী এই উপকরণগুলি স্ত্রীর কোঁচরে ঢেলে গোদভারাই করে থাকে।[১১]

বন্ধ্যাত্বঃ

বন্ধ্যাত্বের নানা কারণ সম্পর্কে পুরোনো ঢাকায় বিভিন্ন রকম ধারণা প্রচলিত আছে। সংক্ষেপে ধারণাগুলি নিম্নরূপঃ

ক. সাপের সঙ্গমের সময় কোন মানুষ সাপ মারলে তার কখনো সন্তান হয় না।[১২]

খ. নার-এ চিকনা (জরায়ুতে চর্বি) জমে গেলে গর্ভে সন্তান ধারণের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

গ. কোন নারীর উপর কালদৃষ্টির প্রভাব পরলে সেই নারী গর্ভে সন্তান ধারণ করে না বলে বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। ভূত-শয়তান ও অশুভ আত্মা কালদৃষ্টি হিসেবে পরিচিত। কোন নারী রজোরক্তের কাপড় না ধুয়ে ফেললে, সেই কাপড়ে লেগে থাকা রক্ত যদি কুকুর-বিড়াল-টিকটিকি চেটে খায় অথবা ভূত-শয়তান-অশুভ আত্মা এই কাপড় শুকলেই সেই নারী কালদৃষ্টিতে আক্রান্ত হবে। আদ্যঋতুকালীন সময়ে কালদৃষ্টিতে আক্রান্ত নারীর তলপেট ও কোমরে প্রচন্ড ব্যাথা হয়। রক্তস্রাবের রং হয় কালচে আর তা থেকে মাছের আশেঁর ন্যায় দুর্গন্ধ বেরোয়। বিয়ের পর সেই নারীর গর্ভে সন্তান আসা মাত্রই অশুভ প্রেতাত্মা ভ্রূণ নষ্ট করে ফেলে বলে সে গর্ভে সন্তান ধারণের ক্ষমতা হারায়।

ঘ. অতীতে পরিধেয় বস্ত্র ধূয়ে ছাদে শুকাতে দিলে সন্ধ্যার পূর্বেই সেগুলি ঘরে আনার রীতি ছিল। এমনকি পরিধেয় বস্ত্র রাতের বেলায় ঘরের বাইরেও রাখা হত না। প্রচলিত বিশ্বাস, ছাদে কিংবা ঘরের বাইরে পরিধেয় বস্ত্র রাতের বেলায় থাকলে চাঁদের আলোয় অশুভ আত্মা সেগুলি পরিধান করে ঘুরে বেড়ায়। সেইসাথে ঐ বস্ত্র পরিধানকারীর উপর অশুভ দৃষ্টি আপতিত হয়। এরফলে সেই নারী সন্তান ধারণের অক্ষমতাসহ নানা ধরণের সমস্যায় পতিত হয়।

গর্ভদোষ:

ক. প্রথম তৈরী পিঠা ও প্রথম খোলার খই খেতে নেই। খেলে গর্ভজাত বা ঔরসজাত সন্তান মৃতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়।[১৩]

খ. গর্ভবতী রাতের বেলায় কোন গাছ থেকে ফুল ছিড়লে তার গর্ভপাত ঘটে।[১৪]

গ. পোয়াতি ‘গোদ্যারা’ নৌকায় চড়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গেলে তার গর্ভপাত ঘটে।[১৫]

ঘ. স্বপ্নে ফল খেতে দেখা ভাল নয়। এতে গর্ভপাত ঘটার আশংকা থাকে।

ঙ. গর্ভবতী আনারস খেলে গর্ভপাত ঘটে। কোন কোন স্থানে অবশ্য গর্ভবতীকে পেঁপে খেতে দেয়া হত না। কারন পেঁপের কষে গর্ভপাত ঘটতে পারে।

চ. গর্ভবতী কাঁচাপেটে মরাবাড়ি কিংবা ছটিঘরে গেলে তার গর্ভপাত ঘটে।

ছ. গরুর হাড় ডিঙ্গিয়ে গেলে গর্ভবতীর গর্ভের শিশু মারা যায়।

জ. পুলের এপার ওপার হলেও গর্ভবতীর গর্ভপাত ঘটে থাকে।

ঝ. আমাবশ্যায় গর্ভে সন্তান এলে সেই সন্তান চোর হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঞ. ভরা পেটে সহবাসের পর গর্ভোৎপত্তি ঘটলে সেই শিশুটি জন্মগত বোবা, লেংড়া বা প্রতিবন্ধি হয়ে থাকে।

ট. আদ্যঋতুকালে ডিম, দুধ খেলে ঔরষজাত সন্তানের শ্বেতীরোগ হয়।

ঠ. গর্ভমাস এবং তার পরবর্তী দুইমাস গর্ভোৎপত্তির কথা অন্যান্য লোকদের জানালে গর্ভপাত ঘটার আশংকা থাকে।

গর্ভদোষ/ বন্ধ্যাত্ব নিরাময় পদ্ধতি:

বন্ধ্যা রমনী অন্যের শিশু প্রতিপালন করতে আনলে শীঘ্রই তার গর্ভে সন্তান আসে এই বিশ্বাস পুরোনো ঢাকার আদিবাসীদের মাঝে আজো বিরাজমান। এই পদ্ধতিটি তাদের কাছে একটি টোটকা হিসেবে পরিচিত। হিন্দু মেয়েরা বন্ধ্যাত্ব ঘোচাতে জৈষ্ঠ মাসে চাঁদের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীর দিনে জমাইষষ্ঠী পূজা দিয়ে থাকে।[১৬] সন্তান লাভের জন্য বন্ধ্যা নারী গলায় কাচপড়া বা তাবিজ পরিধান করে। বন্ধ্যা নারীকে মৌলভীর দেয়া পড়াপানি খাওয়ানো হয়। এর সাথে ফকিরের দেয়া কলাপড়া, আদাপড়া, ডিমপড়াতো আছেই। আদ্যঋতুর সপ্তম দিনে প্রতুষ্যে সূর্য উদয়ের পূর্বে স্নানের পর ঘরের উলতির নিচে দাঁড়িয়ে কলাপড়া খাওয়ার নিয়ম। কালদৃষ্টির প্রভাব কাটাতে অনেকে গিলার তৈরি বড়ি দিয়ে থাকেন যা 'বাদুকের ওসুদ' নামে পরিচিত। আদ্যঋতুর প্রথমদিন থেকে সপ্তমদিন পর্যন্ত প্রত্যেহ ভোরবেলায় খালি এই বড়ি সেবন করলে কালদৃষ্টির দোষ কেটে যায়।[১৭] কোথাও আবার তিন শনি-মঙ্গলবার এই বড়ি খালি পেটে সেবন করার নিয়ম। শোনা যায়, পূর্বকালে কাকডাকা ভোরে সূর্য্য উদয়ের প্রাক্কালে স্নান সেরে ভেজা কাপড়ে ঘরের উলতির নীচে দাড়িয়ে অঞ্জলি ভরে ভেজা চুলের পানি দিয়ে এই বড়ি গিলে খেতে হত।[১৮] আগে জরায়ুর চর্বি কমাতে গিলা সহযোগে ডালের বড়া তৈরি করে বন্ধ্যা নারীকে খাওয়ানো হত।

মোমেন চৌধুরীর তথ্যানুসারে, মল্লির রোগিনীকে শুভ বার দেখে গভীর রাত্রে তেমাথার আলে দাঁড় করিয়ে স্নান করাতে হয়। এসময় ধূপধূনা পোড়ে। স্নানান্তে রোগিনী তার শাড়ি-কাপড় ইত্যাদি উক্ত স্থানে রেখে সেদিকে আর না তাকিয়ে গৃহে ফিরে আসে। তারপর গলায় ও কোমরে কাল সূতা অথবা পাটের ডোর ধারণ করে।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধ্যা রমনী সন্তান লাভে ও মৃতবৎসা তার সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে কোন নবজাতকের নখ, চুল, কাপড়ের টুকরা অথবা শরীরের ময়লা লুকিয়ে সংগ্রহ করে। সংগৃহীত জিনিষ গুলো তাবিজে ভরে সেটি ফকিরবাবা তার গলায় পরিয়ে দেয়। এরফলে সেই নারীদের গর্ভোৎপত্তি ঘটে এবং তাদের সন্তানও মারা যায় না। যে নবজাতকের চুল, নখ, কাপড়ের টুকরা কিংবা গায়ের ময়লা চুরি করা হল লোকমতে, সেই শিশু নষ্ট হয়ে যায়। নষ্ট শিশু ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে মারা যায়। তবে শিশুর পরিবার সময়মত বুঝতে পারলে ফকির দ্বারা চিকিৎসা করালে সেই শিশু সুস্থ হয়ে উঠে।

যেসকল নারীর সন্তানরা দুই-তিন বছর বয়সে মারা যায়, তারা সমবয়সী শিশুর মায়ের পরিধেয় শাড়ির খানিকটা কেটে চুরি করে কাঁথা সেলাই করে রাখে। মৃতবৎসার নবজাতককে ছটিঘরে সেই কাঁথায় শোয়ালে তার সন্তান মরে না। যার শাড়ির টুকরা দিয়ে কাঁথা সেলাই করা হল তার সন্তান মারা যায়। তবে সে যদি এরূপ শাড়ি ব্যবহার না করে সেটি তুলে রেখে দেয় তাহলে তার শিশুর কোন ক্ষতি হবে না।[২০] অতীতে অনেকেই এরকম খুঁতযুক্ত ছেঁড়া বা কাটা শাড়ি পরিধান করা থেকে বিরত থাকত।

গর্ভধারণের লক্ষণ:

গর্ভধারণের পূর্বলক্ষণ বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রচলন ও দৃষ্টিকোণের ব্যাখ্যা নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

ক. ঘরের সিলিং, বাড়ির দেয়াল বা বাড়ির যেকোন স্থানে 'কুমোরের চাক' বাসা[২১] বাঁধলে বাড়ির বউ-ঝিদের মধ্যে কারো গর্ভে সন্তান আসবে মনে করা হয়। কুমোরের চাকের বাসা গোল আকৃতির থাকলে মেয়ে আর লম্বাটে হলে ছেলে হবে বলে ধারণা রয়েছে। বাড়িতে কুমারের চাক তৈরি হওয়া মাত্রই সবাই চাকটিকে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে উঠে।[২২] এই চাকটি ভবিষ্যত সন্তানের অবয়ব তুলে ধরে বলে সবাই এটিকে সতর্কাস্থায় রাখার প্রয়াস পায়।

খ. কোন বাড়ির উঠোনে, ছাদে কিংবা গাছে এক কাক অপর কাকের মাথায় ঠোকর দিলে বলা হয়ে থাকে 'এক কাউয়া আরেক কাউয়ার মাথা দেখে'।[২৩] এমনটি হলে ধরে নেয়া হয় সেই বাড়ির বউ-ঝিদের মধ্যে কেউ গর্ভবতী হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. ছোট শিশুরা উপুর হয়ে পায়ের ফাঁক দিয়ে পিছন দিকে দেখলে বলা হয়, সে তার অনাগত ভাই-বোনকে ডাকছে অর্থাৎ তার মা শীঘ্রই গর্ভবতী হয়ে উঠে।

ঘ. কোন নারী স্বপ্নযোগে ফল দেখলে সে শীঘ্রই গর্ভধারণ করবে বলে বিশ্বাস করা হয়।

ঙ. কোন নারী যদি স্বপ্নে দেখে, সাপ তার আশেপাশে কিংবা তাকে জড়িয়ে ধরে আছে, তবে সে নারী অচিরেই সন্তান সম্ভবা হয়ে উঠবে। এবং তার গর্ভস্থ সন্তানটি পুত্র হবে বলেও অনুমান করা হয়।[২৪]

গর্ভকালীন সতর্কতা:

পুরোনো ঢাকার আদিবাসীদের মাঝে গর্ভবতী রমনীকে নিয়ে নানা ধরণের লোকসংস্কার প্রচলিত। এর উদ্দেশ্য ছিল নির্বিঘ্নে এবং নিখুঁত অবয়ব নিয়ে ভাবী জাতকের জন্ম। সেইজন্য গর্ভধারিণীর ক্ষেত্রে খাদ্যাভাস, চলাফেরাসহ নানান বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে।

ক. বাড়িবন্ধন:

অশুভ শক্তির অপতৎপরতা প্রতিহত করতে গর্ভকালীন সময়ের প্রারম্ভেই বাড়ির চারকোণায় ফকির বা হুজুরের তাবিজ ঝুলানো হয়। এর সাথে হুজুরের দেয়া পেরেক-পড়া গেড়ে দেয়া হয় বাড়ির চারপাশের দেয়ালে। অতীতে একটি ছোট শিশুকে দিয়ে বাড়ির চারকোনায় প্রশ্রাব করিয়ে বাড়ি বান (বন্ধন) করা হত। এতে করে যাদুকারিনীর যাদুটোনা গর্ভবতী ও তার গর্ভজাত সন্তানের কোন ক্ষতি করতে পারে না বলে বিশ্বাস করা হয়।[২৫] আয়তাল কুরসি পড়ে ডান, বাম ও সামনের দিকে সশব্দে তিনতালি দিয়ে বাড়ি বন্ধ করে অনেকেই। তালির শব্দ যে পর্যন্ত যায়, সেই পর্যন্ত কোন অশুভ শক্তি ক্রিয়াশীল থাকে না।

লোকবিশ্বাস অনুসারে, আকাশে 'আড়ালি পাখি' গর্ভবতীর উপর দিয়ে উড়ে যদি ফুলবনে যায় তাহলে গর্ভজাত শিশুটি নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হয়। আর যদি আড়ালি পাখি গর্ভবতীর উপর দিয়ে উড়ে কাঁটাবনে যায় তাহলে গর্ভস্থ সন্তানটি ভূমিষ্ঠ না হয়ে মাতৃগর্ভেই শুকিয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে ঐ পাখি যদি কাঁটাবন থেকে ফুলবনে ফিরে আসে তাহলে শিশুটি পুনরায় মাতৃগর্ভে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ভূমিষ্ঠ লাভ করে। আড়ালি পাখি

Dhaka University Institutional Repository

যাতে গর্ভবতীর ধারে কাছে না আসতে পারে, সেজন্য বাড়ির ছাদে সীজ বা কাঁটাগাছ ও খুলিসহ কোরবানির গরুর শিং রাখা হত। এছাড়া কেউ কেউ পাজরের হাড়ও রাখত।[২৬]

খ. গর্ভবতীর 'শরীর বন্ধ' করণ:

গর্ভবতী মা যাতে কোন অশুভ শক্তি অথবা আত্মার দ্বারা আক্রান্ত না হয়, কোন দানব/অসুরের ছায়ায় আপতিত না হয় সেই লক্ষ্যে 'শরীর বন্ধ' করা হয়। এক্ষেত্রে একটি দিয়াশলাই-এর বক্সে এক কোয়া রসুন, একখন্ড কয়লা, একটি দিয়াশলাই-এর কাঠি, একটি কাঁটাতার ও একটি শুকনা মরিচ ভরে সেটি গর্ভবতীর শাড়ির আঁচলে বেঁধে দেয়া হয়। অনেকে ফকিরের দেয়া তাবিজ, হুজুরের দেয়া কাচপড়া গর্ভবতীর বাহু বা গলায় পরিয়ে তার শরীর বন্ধ করে থাকে। শিশু প্রসবের পরপরই এসব তাবিজ খুলে নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। ঢাকার হিন্দু মেয়েরা প্রসব যন্ত্রণা উঠার সাথে সাথে সব রকম তাবিজ খুলে ফেলে।

গ. চলাচল:

পূর্বে গর্ভবতীকে বাড়ির বাইরে বের হতে দেয়া হত না। কখনো ঘরের বাইরে বের হলে মাথায় কাপড় দিয়ে শাড়ির আঁচলের এককোনা কোমরে গুঁজতে হত। মাথার চুল সর্বক্ষণ বাঁধা থাকত। আসরের আযানের পর থেকে ফজর পর্যন্ত সে নিজ ঘরে অবস্থান করত। বিশেষ করে ভর দুপুরে ও আযানের সময় ঘরের বাইরে যাওয়া ছিল সম্পূর্ণ নিষেধ। গর্ভকালে রাতের বেলায় পোয়াতি প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটাতে কাঁসা, তামা, এলুমিনিয়াম বা মাটির হাড়ি ব্যবহার করত।

প্রচলিত বিশ্বাস, গর্ভাবস্থায় চিৎ হয়ে ঘুমালে ঘরের সিলিং-এ থাকা টিকটিকি গর্ভবতীর উপর দিয়ে গেলে তার গর্ভের শিশুটি শুকিয়ে টিকটিকির মত হয় যায়।[২৭] অর্থাৎ সেই শিশুটির গর্ভকালীন বৃদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটে। আবার কারো কারো ধারণা, গর্ভাবস্থায় চিৎ হয়ে ঘুমালে গর্ভস্থ শিশুটি বুকের উপর উঠে গেলে গর্ভবতী মারা যায়।[২৮]

অতীতে শনি ও মঙ্গলবারে পোয়াতিকে রাস্তায় বের হতে দেয়া হত না। শাঁখারীদের ধারণা, গর্ভবতী রাস্তায় বের হলে গর্ভের শিশুর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। আবার গর্ভাবস্থায় মাছের আশঁ ডিঙ্গিয়ে যেতে

Dhaka University Institutional Repository

নেই। পুরোনো ঢাকার কোথাও কোথাও গর্ভবতীর জবাই করা মুরগির রক্তের উপর দিয়ে হেটে যাওয়া নিষেধ। জবাই করার পর মুরগি যেভাবে ছটফটিয়ে মারা যায়, গর্ভকালে মুরগির রক্তের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে ভারী সন্তানের 'ছটফটানি ব্যামার' (মৃগী রোগ) হতে পারে।[২৯] পুরোনো ঢাকার কোন কোন স্থানে গর্ভবতীর পাশাপাশি তার স্বামী, বাবা, ভাইও গর্ভকালে নানারূপ বিধি-নিষেধ মেনে চলত। এক্ষেত্রে মুরগি জবেহ না করা তাদের অন্যতম একটি বিধি ছিল। নিষেধের কারণে ঈদ-উল আযহার সময় গর্ভবতী স্বামী অন্যদের দিয়ে তার পশু কোরবানী করত।[৩০] এখনো কোথাও কোথাও গর্ভবতীর স্বামী মৃতের খাটিয়া বহন করা থেকে বিরত থাকে। তাদের বিশ্বাস, মৃতের খাটিয়া বহন করলে কাঁধে অসহনীয় ব্যথা হয় যা সহজে কমে না। প্রথম সন্তান গর্ভকালে পিতা কাঁধে লাশ নিলে এমনটি হয় বলে মনে করে অনেকেই। পুরোনো ঢাকার মুসলমানদের কেউ কেউ গর্ভবতীর স্বামীকে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে যাওয়া নিষেধ বলে মনে করে। তবে মৃত ব্যক্তি অতি আপনজন হলে সে দুর থেকেই লাশ দেখে। লাশের কাছে যায় না।

ঘ. গর্ভকালীন খাদ্যভ্যাসঃ

গর্ভবতীর শসা, বাংগি, খিরা, মাছুয়া আলু, নারিকেলের পানি, ডাবের পানি, ডাউয়া ফল, শোলমাছ, বোয়ালমাছ, মেনি মাছ, চিতল মাছ, ফলি মাছ, পিরবদল মাছ, বাইন মাছ, মেরগা (মৃগাল) মাছ খাওয়া এবং কই-টাকি-খলা মাছের মাথা খাওয়া নিষেধ। লোকবিশ্বাস, গর্ভকালে চিতল মাছ, ফলি মাছ, শসা খেলে ভাবী সন্তানে চর্মরোগ হয়। পোয়াতি মেনি, কই ও শোল মাছ খেলে গর্ভস্থ শিশুর ত্বকে কালো ছোপের মত দাগ পরে। কারো কারো মতে, এ সময় শসা, বাংগি, খিরা খেলে গর্ভের শিশুর ঠান্ডা লেগে যায়। অনেকেই পোয়াতিকে টাকি, খল্লা ও কই মাছের মাথা খেতে দিত না, শিশু তার দুই চোখ কপালে নিয়ে জন্ম হবে এই ভয়ে। ধোপাদের বিশ্বাস, গর্ভবস্থায় মাছুয়া আলু খেলে চর্মরোগ হয়। তারা পোয়াতিকে ডাউয়া ফলও খেতে দিত না। এতে করে শিশুর মাথা গোলাকার না হয়ে ট্যামাড্যামা আকার ধারণ করে। গর্ভবতী বোয়াল মাছ খেলে নবজাতক শিশুর হা (ঠোঁট) বোয়াল মাছের ন্যায় দীর্ঘ হয় । কারো কারো ধারণা, গর্ভবতীর বাইম মাছ কিংবা পিরবদল মাছ ভক্ষণ ভাবী সন্তানকে অলস করে তোলে। গর্ভকালে নারিকেলের পানি পান করলে গর্ভের শিশুটি ছেলে হলে তার লিঙ্গ অস্বাভাবিক বড় হয়ে থাকে। পোয়াতির ডাবের পানি পান গর্ভস্থ সন্তানের চোখের মনি ঘোলা করে দেয়।

সাধভক্ষণঃ

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের সর্বত্রই গর্ভবতীকে সাধ খাওয়ানোর রীতি প্রচলিত আছে। মধ্যযুগের কাব্য থেকে সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়।[৩১] যে অনুষ্ঠানের সন্তানে সন্তানবতীর সাধ বা ইচ্ছানুযায়ী খাদ্যদ্রব্য খেতে দেওয়া হয়, তাই সাধভক্ষণ। ক্ষুধা-নিবৃত্তি ও আত্মতৃপ্তি ভ্রূণস্থ শিশুর জৈবিক ও মানসিক গঠনে ক্রিয়া করে থাকে। এর অভাব ও অপূর্ণতার প্রতিক্রিয়া হয় বিপরীত।[৩২] পুরোনো ঢাকার আদিবাসীরা পাঁচ, সাত ও নয় মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রসূতিকে সাধ খাইয়ে থাকে। স্থান, কাল, সম্প্রদায় ও বর্ণভেদে অনুষ্ঠান পালনের ধরণ ও নামকরণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বিস্তারিত নিম্নে আলোচনা করা হল:

ক. পাঁচ মাসের সাধভক্ষণ: প্রথম সন্তান মাতৃগর্ভে পাঁচ মাসে পদার্পণ করলে গর্ভবতীর জন্য যে বিশেষ আচারানুষ্ঠান পালিত হয়, তাকে ঢাকার ঋষি, শাঁখারী ও মুসলমানরা 'পাঁচফল' বলে থাকে। আবার ঢাকার গোয়ালাদের কাছে এটি 'পঞ্চ আমরিত', ধোপাদের কাছে 'পূর্ণবেয়া' আর সাহাদের কাছে 'ভাজাপোড়া' নামে পরিচিত। ব্রাহ্মণ ঠাকুরের শুভ-দিন-ক্ষণ অনুযায়ী এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে ঢাকার হিন্দুরা। পাঁচ মাসের সাধভক্ষণের আড়ম্বরতা সাত মাসের সাধভক্ষণ অপেক্ষা কম আনুষ্ঠানিকতাসম্পন্ন। নিমন্ত্রণ জানানো হয় খুব কাছের কয়েকজন আত্মীয়কে। আমন্ত্রিত অতিথিরা সবাই গর্ভবতীর জন্য শাড়ী-চুড়ি, মিষ্টি কিংবা পিঠা-পায়েস-আচার তৈরি করে নিয়ে আসে। এই পর্বে হিন্দু গর্ভবতী নারীদের উপবাস থাকার রীতি। ধোপা ও ঋষিদের মধ্যে অনুষ্ঠান উপলক্ষে পিত্রালয় থেকে গর্ভবতীকে নতুন বস্ত্র, প্রসাধন সামগ্রি ও ফুলের গহনা উপহার প্রদানের রেওয়াজ আছে। আচারানুষ্ঠান আরম্ভ হবার পূর্বে ধোপা ও ঋষি এয়োরা গর্ভবতীকে হলদিগিলা বাটা মেখে স্নান করিয়ে দেয়। এ সময় বাড়ির বয়স্ক নারীরা সবাই একত্রে সংগীত পরিবেশন করে। স্নানের পর গর্ভবতী নতুন বস্ত্র, ফুলের গহনা, কাঠের মালা আর গলায় ও কোমরে লাল কায়তুন ইত্যাদি পরিধান করে থাকে। ঋষি স্বামীরাও এই সময় শ্বাশুড়ির দেয়া নববস্ত্র পরিধান করে। ধোপাদের মধ্যে গর্ভবতীর স্বামীকে বিয়ের ধুতি-পাঞ্জাবী পরিধান করতে হয়। ঘরের মেঝেতে পাতা শীতলপাটিতে গর্ভবতী ও তার স্বামী পাশাপাশি উপবেশন করে। অতীতে ঋষিদের মধ্যে গর্ভবতীর স্বামী তার হাতের আংটি স্ত্রীর নাভীদেশ ছোঁয়াত। এরপর গভবতীর নাকের সামনে তুলে ধরা হত রান্না করা ক্ষীর। গর্ভবতী তা থেকে তিনবার ঘ্রাণ শুকত।[৩৩] ইদানিং এই আচার পালনে ব্যত্যয় দেখা যায়। তবে এখনো গর্ভবতীর কোঁচরে এয়ো কর্তৃক পাঁচ রকমের পাঁচটি আস্ত ফল ঢালার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। ঋষিদের এরূপ প্রথার সাথে কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় ধোপা নারীদের পালিত গোদভারাই

Dhaka University Institutional Repository

আচারানুষ্ঠানে। পাঁচ মাসের পূর্ণবেয়া অনুষ্ঠানে শীতলপাটিতে ধোপা ও তার গর্ভবতী স্ত্রী পাশে দুইজন বিপরীত লিঙ্গের শিশুসহ উপবেশন করে। তাদের সামনে থালায় থাকে একটি নারিকেল, এক ফানা কলা, পাঁচটি পান, দুইটি সুপারি, কলমি ডগা, আনার কলি ও একটি কাঁচা পয়সা। বোন, ভাবী, জা, ননদ, ও ননাসের মধ্যে যার প্রথম সন্তান ছেলে সে থালায় রাখা উপাচারসমূহ গর্ভবতী কোলে ঢেলে দিয়ে তার গোদভারাই করে। এরপর গর্ভবতী ও তার স্বামী শিশুদের দিকে একপলক তাকিয়ে চলে যায় দেবতাকে প্রণাম করতে। ঠাকুর ঘরে দেবতার আসনের সামনে প্রণামকালে গর্ভবতী বলে-'আচ্ছামতন যেসা মেরা বাচ্চা হো যায়।'[৩৪] দেবতা প্রণামের পর তারা বাড়ির ময়মুরুব্বীদের প্রণাম করে থাকে। এই সময় গর্ভবতী'র মা সামর্থ্য অনুযায়ী তার মেয়ের জামাইকে স্বর্ণের চেইন, বোতাম, আংটি বা ঘড়ি উপহার দেয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষে রান্না করা খাবারের প্রতিটি পদ দুইটি তুলে নিয়ে গর্ভবতী ও তাঁর স্বামীকে আলাদা খেতে দেওয়া হয়। গর্ভবতী সেই খাবার খেয়ে তার উপবাস ভাঙ্গে। আগে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের ভাত-মাছ বা লুচি-মিষ্টি-ডালনা-নিরামিষ দিয়ে আপ্যায়ন করা হত। বেশ কয়েক বছর ধরে ধোপারা এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে পোলাও-মাংস রান্না করে আসছে।

সাহা'দের মধ্যে, ঐদিন গর্ভবতী স্নানের পর নতুন শাড়ি পরে পিঁড়িতে বসে। তার পাশে বেজোড় সংখ্যক শিশুদের বসানো হয়। গর্ভবতীর সামনে একটি বড় থালায় রাখা থাকে প্রতিটি পাঁচ প্রকারের মিষ্টি, ফল ও ভাজাপোড়া (চাল, ছোলা, বাদাম, মটর, কদুবিচি ইত্যাদি ভাজা)। শিশুরা থালা থেকে খাবার তুলে গর্ভবতীকে খাইয়ে দেয়। অন্যদিকে , পাঁচফল অনুষ্ঠানে গর্ভবতীকে পাঁচ প্রকার ফল খাওয়ানোর রীতি পালন করে ঢাকার শাঁখারীরা। সেদিন অপরাহ্নে একটি থালায় প্রতিটি পাঁচ প্রকারের ফল, সন্দেশ ও মিষ্টি বাড়ির মন্দিরের দেবতাকে ভোগ দেয়া হয়। মন্দিরের মেঝেতে বিছানো শীতলপাটিতে পোয়াতিকে বসিয়ে ভোগের প্রসাদ থেকে প্রথমে পাঁচ প্রকারের কাটা ফল, এরপর মিষ্টি ও সন্দেশ খাওয়ানো হয়। গোয়ালা শ্বাশুড়িরা পর্বদিবসের পূর্বাহ্নে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজার আয়োজন করে। পূজা শেষে শাশুড়ি ব্রাহ্মণ ঠাকুরের তৈরিকৃত চর্ণমিত বাড়িতে নিয়ে আসে। গর্ভবতী স্নানের পর চর্ণমিত পান করে উপবাস ভাঙ্গে। গোয়ালাদের মধ্যে অনেকেই আবার ব্রাহ্মণকে নিজ বাড়িতে ডেকে আনে। ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়ে চর্ণমিত বানিয়ে গর্ভবতিকে নিজ হাতে খাইয়ে দেয়। মুসলমানদের মধ্যেও গর্ভবতী নারী অনুষ্ঠানের দিন গোসল করে একটি নতুন শাড়ী পরে শীতলপাটিতে বসে। তার সম্মুখে রাখা একটি বড় থালায় প্রতিটি পাঁচ প্রকারের ফল, মিষ্টি আর ক্ষীর থাকে। গর্ভবতী চোখ বন্ধ করলে বাড়ির ত্রয়োরা সেই থালাটি ঘুরায়।

Dhaka University Institutional Repository

গর্ভবতী চোখ বন্ধ রেখেই সেখান থেকে প্রথমে ফল এরপর মিষ্টি তুলে। লম্বাটে ফল বা মিষ্টি (কলা, কালোজাম, চমচম) তুললে, তাদের ধারণায় পুত্র হবে। অন্যদিকে, গোলাকার ফল বা মিষ্টি (বরই, আপেল, রসগোল্লা, লালমোহন) তুললে মেয়ে হবে। পরপর তিনবার ফল-মিষ্টি গর্ভবতীকে দিয়ে তোলানো হয়ে থাকে। এরপর গর্ভবতীকে ক্ষীর খাওয়ানো হয়। পূর্বকালে পাঁচফল অনুষ্ঠানে বাড়ির বর্ষীয়ান নারীরা গান পরিবেশন করত। কখনো অনুষ্ঠানে গান গাইতে মাঝে মধ্যে হিজরা মেরাসেনদেরও ডেকে আনা হত।

খ. সাত মাসে সাধভক্ষণ: প্রথম সন্তান গর্ভধারণের সাত মাসে পালনীয় সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানটি ঢাকার সাহা ও শাঁখারীদের কাছে 'সাতামিত' এবং ঋষিদের কাছে 'সত্যমিত' বা 'হাতোশা' নামে পরিচিত। অন্যদিকে, উর্দুভাষী ধোপা, গোয়ালা আর উর্দুভাষী মুসলমানরা একে সাতোয়াশা এবং বাংলাভাষী মুসলমানরা 'হাতোশা' বা 'সাতোশা' বলে থাকে। এই অনুষ্ঠানটি পালনের ক্ষেত্রে আড়ম্বরপূর্ণতা লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথিরা সবাই গর্ভবতীর জন্য শাড়ি-চুড়ির সাথে মিষ্টিও নিয়ে আসে। ধনিদের মধ্যে সাতোশা উপলক্ষে পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় থেকে গর্ভবতীকে শাড়ি-চুড়ি, প্রসাধন সামগ্রির পাশাপাশি স্বর্ণলংকারও উপহার দেওয়া হয়ে থাকে। পূর্বে মুসলমানরা সাতোশার আগের দিন রাতে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান করত। সে অনুষ্ঠানে গর্ভবতীর গায়ে হলুদ মাখা হত এবং হাতে মেহেদী পরাত। সারারাত মেরাসেন বা হিজরাদের নাচগান পরিবেশন হত-

'আমার আললাদি ঐ শাম,
লক্ষ টাকার সিন্নি দিমু
ছেলে যদি হয়।
যাব বটতলার হাটে,
কত রং বেরং-এর চুড়ি উঠেছে
আয়না বসানে।
চুরির মূল্য পাঁচআনা।
আমার যেতে দুইআনা।
কি দিয়ে পবার চুড়ি,
সাধ মিটলো না।'[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

পুরোনো ঢাকার হিন্দু গর্ভবতী নারীরা সাতোশার দিন উপবাস থাকে।[৩৬] অনুষ্ঠানের পূর্বে গর্ভবতী ও তার স্বামীকে বাড়ির ত্রয়োরা বাটা হলুদ-গিলা মেখে গোসল করিয়ে দেয়। ঋষি নারীরা কলস কাঁখে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বাজনা সহকারে রাস্তার কলপাড় বা পুকুরঘাটে গোসলের পানি ভরতে যায়। সাথে নেয় একটি পানথালি। পানথলিতে থাকে একটি জ্বলন্ত প্রদীপ, ধান, দূর্বা, পান, সরিষা তেল, আমপাতা, ফুল আর বাটা হলুদ-গিলা। কলসে পানি ভরাকালে পানথালিতে রাখা সমস্ত উপাচারসমূহ থেকে একটু করে নিয়ে কলসের মধ্যে রাখা হয়। এ সময় ত্রয়োরা সবাই একত্রে জোকার দিয়ে থাকে। জলপূর্ণ কলসের মুখ নতুন গামছা দিয়ে বেঁধে বাড়ি ফিরে আসে। সেই জলে গর্ভবতীকে গোসলের সময় 'গানাওয়ালি' বা 'গীতগাওনি'দের সঙ্গে বাড়ির বর্ষীয়ান মহিলারাও গান গায়। গোসল শেষে ঘরে প্রবেশকালে গোয়ালা ও ধোপা নারীরা গর্ভবতীর নযর নামায়। একটি জ্বলন্ত প্রদীপে খানিকটা সরিষাদানা ছেড়ে সেটি গর্ভবতীর মুখের সামনে ডানদিক থেকে বামদিক পর্যন্ত পাঁচবার ঘুরিয়ে নযর নামানো হয়ে থাকে। এরপর মাটিতে প্রদীপটি উল্টে রাখে আর সেটি গর্ভবতী তার বাম পায়ের গোড়ালি দিয়ে ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে। গর্ভবতীকে নতুন শাড়ি-ব্লাউজ-পেটিকোট পরানো হয়। ঋষি ও গোয়ালদের মধ্যে গর্ভবতীর স্বামী নতুন বস্ত্র পরিধান করে। ধোপাদের রীতি অনুযায়ী গর্ভবতীর স্বামী তাদের বিয়ের পরিহিত ধুতি-পাঞ্জাবী পরিধান করে। গর্ভবতীকে প্রসাধন সামগ্রি ও ফুলের গহনায় সজ্জিত করা হয়। এছাড়া গর্ভবতীর গলায় কাঠের মালা ও লাল কায়তুন এবং কোমরে লাল কায়তুন পরানো হয়। সাহা গর্ভবতীরা সাতোশাতে তাদের বিয়ের গহনা পরিধান করে। গর্ভবতীর কপাল থেকে গাল পর্যন্ত ঋষি মেয়েরা চন্দন, তিলকমাটি কিংবা টুথপেষ্টে ছোট ছোট ফোঁটা অংকন করে দেয়। ঢাকার সাহা'দের মধ্যে সাতোশার ক্রিয়াকর্মের সূচনালগ্নে মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। গর্ভবতীর শাশুড়ি সেদিন উপবাস থেকে মনসা পূজার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে। এসময় ব্রাহ্মণকে সহযোগিতা করাও তার প্রধান একটি দায়িত্ব। শাশুড়ি ঋতুমতি বা বিধবা থাকলে কিংবা জিয়স মানুষ না হলে বড় জা, ননাস, জেঠি মা, পিসি মা এদের মধ্যে কেউ একজন এই দায়িত্ব পালন করে। ঘরের মেঝেতে বিছানো শীতলপাটিতে পূজার আসন পাতা হয়। মনসা পূজার নৈবিত্ত রাখা হয় পানি-ভেজানো আতপ চাল আর উপচারে থাকে জলপূর্ণ মাটির ঘট (নারিকেল, হরিতকী, আর ফুলে সজ্জিত), পাঁচ রকম কাটা ফল ও মিষ্টি। একটি থালার মাঝেখানে ভিজানো আতপ চালের চারপাশে পাঁচটি আস্ত খোসা ছড়ানো সবরিকলা রাখা হয়। চালের উপরে ছিটিয়ে দেয়া হয় কুড়ানো নারিকের আর চিনি। মনসা পূজা শেষে ব্রাহ্মণ ঠাকুর মন্ত্র পড়ে একটি পিতলের মালসাতে এক বা আড়াই পোয়া দুধে

Dhaka University Institutional Repository

খোসা ছড়ানো আস্ত একটি সবরিকলা, চিনি, ঘি, মধু আর অতি সামান্য গোবর মিশান।[৩৭] সাতামিতে সাহা গর্ভবতীকে ব্রাহ্মণের মন্ত্র পড়া এই দুধ-কলা মিশ্রণ একজন জিয়স নারীকে দিয়ে খাওয়ানোই প্রধান রীতি। অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত সবাই প্রসাদ হিসেবে চালের নৈবিত্ত গ্রহণ করে। পরে দুটি কাপড়ে একটি পাথরের নোড়া অন্যটি একটি প্রদীপ আবৃত করে গর্ভবতীর সামনে রাখা হয়। গর্ভবতী প্রণাম করে তা থেকে যে কোন একটি তুলে নেওয়ার নিয়ম। যদি প্রদীপ তুলে তাহলে মেয়ে আর যদি নোড়া তুলে তাহলে ছেলে জন্ম হওয়ার বিশ্বাস রয়েছে। গর্ভবতী সেটি বাড়ির মুরুব্বীদের কোলে দিয়ে বলে-'আপনের নাতি/নাতনিকে ধরেন।'[৩৮] সেটি কোলে নিয়ে মুরুব্বীরা গর্ভবতীকে টাকা-পয়সা সালামী প্রদান করে। এসময় উপস্থিত সবাই আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে। একে অপরের গায়ে হলুদ মাখামাখি করে। এরপর শীতলপাটিতে গর্ভবতীর পাশে বেজোড় সংখ্যক শিশুদের বসানো হয়। শিশুদের হাতে গর্ভবতী তিনবার লুচি-মিষ্টান্ন খাওয়ার পর শিশুদের সাথে পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে ভাত খায়।

শাঁখারীরা বাড়ির অভ্যন্তরে মন্দির প্রাঙ্গণে সাতামিত অনুষ্ঠানটি উৎযাপন করে। একটি নতুন মালসাতে রাখা দুধ-কলায় ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়ে দিলে সেটি গর্ভবতীকে খাওয়ানো হয়। তিন চুমুকে দুধ আর তিন কামড়ে কলা খাওয়ার নিয়ম। এরপর শিশুরা থালায় রাখা কাটাফল ও সন্দেশ গর্ভবতীকে খাইয়ে দেয়। সেইদিন শুধুমাত্র লুচি, ফলমূল, মিষ্টি, নিরামিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে গর্ভবতী।

সাতোয়াশাতে গোদভারাই নামক লোকাচার পালন করে ঢাকার ধোপা ও গোয়ালারা। ননদ-জায়েদের মধ্যে সন্তানবতী নারী থালায় রাখা পাঁচ রকমের পাঁচটি আস্তফল পোয়াতির কোঁচরে ঢেলে দিয়ে গোদভরাই করে থাকে। গোদভারাই-এর পর গর্ভবতী তার সামনে বসানো দুইজন শিশুকে তাকিয়ে দেখবে। এরপর গর্ভবতী ও তার স্বামী দুটি ভিন্ন থালাভর্তি নানাপ্রকার খাবারসহ দুইভাগে শিশুদের সাথে নিয়ে খেতে বসে। তারা উভয়েই পাঁচ জন করে শিশুকে সাথে নিয়ে সেই খাবার খায়। তাদের খাওয়ার পর অতিথিরা সবাই আনন্দের সাথে থালার অবশিষ্ট খাবার খায়। খাওয়া শেষ হলে গর্ভবতী ও তার স্বামী ঠাকুরের আসনের সামনে গিয়ে প্রণাম করে।

সাতোশার দিন সকালে মুসলিম প্রসূতিরা হলুদ মেখে গোসল করে। অতীতে গোসল শেষে প্রসূতিকে ঘরের উলতির নীচে দাড় করিয়ে তার মাথায় ডাবের পানি ঢালা হত। এরপর তিন কদম হেটে ভেজা

Dhaka University Institutional Repository

কাপড়ে প্রসূতি ঘরের ভেতর প্রবেশ করত। প্রত্যেক কদমে প্রসূতি আসতাগফিরুল্লাহ দোয়া পড়ত। কোথাও কোথাও গোসলের পর প্রসূতির হাতে মেহেদী পড়ানো হয়ে থাকে। পূর্বে সাতোশার দিন প্রসূতিকে মাছ খেতে দেয়া হত না। কারণ প্রসূতির গায়ে হলুদ-মেহেদীর ঘ্রাণের সাথে মাছের ঘ্রাণ যুক্ত হলে অশরীরী আত্মারা প্রলুব্ধ হবে বলে বিশ্বাস করা হয়। বিকেলে বা সন্ধ্যার পর উদ্‌যাপিত হয় সাতোশা অনুষ্ঠান। প্রসূতি লাল শাড়ি, চুরি ও তার বিয়ের গহনা পরে। প্রসূতির স্বামী পরিধান করে সাদা পাঞ্জাবী, সাদা লুঙ্গী ও টুপি। প্রসূতি স্বামীর পাশে শীতলপাটিতে বসে। স্বামী-স্ত্রীর মুখোমুখী সাতজন সুশ্রী শিশুদের বসানো হয়। তাদের সামনে একটি খাদ্যপূর্ণ থালা রাখা হয়। থালায় থাকে ক্ষীর, চুইপিঠা, পুরিসাওয়ালি, পাঁচ রকম মিষ্টি ও ফল। এছাড়া চালের খামির দিয়ে তৈরি একজোড়া বিপরীত লিঙ্গের পুতুল, ফ্রক, শার্ট, পায়জামা, পাঞ্জাবী, সারোয়ার, ঝুনঝুনি, লিচু ইত্যাদি বানিয়ে থালায় রাখা হয়। থালায় রক্ষিত খাবার থেকে সব রকম একটু একটু করে প্রসূতি খায়। খাওয়া শেষে প্রথমে প্রসূতি ও পরে তার স্বামী চোখ বন্ধ করে পরপর তিনবার থালা থেকে পুতুল, মিষ্টি আর চালের খামির দিয়ে তৈরি খাদ্যগুলি তোলে। প্রথমবার পুতুল তোলার পর শিশুদের দিকে তাকানোর নিয়ম। ধারণা করা হয়, স্বামী-স্ত্রী যে লিঙ্গের পুতুল অধিকবার তোলে, সেই লিঙ্গের শিশুর জন্ম হয়। শার্ট, প্যান্ট, সাদা অথবা লম্বা মিষ্টি তুললে পুত্র সন্তান, অপরপক্ষে ফ্রক, কামিজ, লাল অথবা গোল মিষ্টি ধরলে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

মোমেন চৌধুরী বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঢাকার আদিবাসী মুসলিম প্রসূতির সাতোশার বিবরণে লিখেছেন- 'ঢাকার আদিবাসী সমাজে প্রচলিত সাতশা উপলক্ষে পোয়াতী ও তার স্বামীকে হলুদ গোসল করানো হত। পোয়াতী হাতে মেহেদী ও নাকে নথ পরে। তারপর নতুন শাড়ী পরে স্বামীর সঙ্গে বসে। এ সময় তারা চোখ বন্ধ করে থাকে। তাদের সামনে যে থালা দেওয়া হয়, তাতে থাকে পোলাও, মাংস, দই, ফিরনি, পাঁচটি মিষ্টি, পাঁচটি ফল ও পাঁচটি পিঠা। লম্বা ও গোল উভয় আকারের পিঠা থাকে। চোখ বন্ধ রাখা অবস্থাতেই তাদের পিঠা তুলতে বলা হয়। যদি লম্বা পিঠা তোলে তবে তাদের ছেলে হবে, গোল পিঠা তুললে মেয়ে হবে বলে বিশ্বাস পোষণ করা হত।'[৩৬]

গ. নয় মাসে সাধভক্ষণ: নয় মাসে পোয়াতিকে পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে ভাত খাওয়ানোর রীতি পালন করে পুরানো ঢাকার সাহা ও শাঁখারীরা। এই অনুষ্ঠানটি শাঁখারীদের কাছে 'নয়য়াশা' আর সাহাদের কাছে 'সাধ খাওয়ানো' নামে পরিচিত। সাহাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানটি পোয়াতির শ্বশুড়ালয় ও পিত্রালয় উভয়

Dhaka University Institutional Repository

জায়গাতেই পালিত হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানটির আড়ম্বরতা খুবই কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুব ঘনিষ্ট কয়েক জনকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ঐদিন পোয়াতি দুপুর পর্যন্ত উপবাস থাকে। অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে গর্ভবতী স্নান সম্পন্ন করে মা অথবা শ্বাশুড়ির দেয়া নতুন শাড়ি পরিধান করে। শীতলপাটিতে গর্ভবতীর চারপাশে বেজোড় সংখ্যক ছোট ছোট শিশুরা বসে। তাদের একটি বড় থালায় ভাতের সাথে মাছ, সবজি, ডাল, মিষ্টান্নসহ পাঁচ পদের খাবার পরিবেশন করা হয়। শিশুরা থালা থেকে খাবার তুলে দুই-চার লোকমা গর্ভবতীকে খাইয়ে দেয়। অত:পর গর্ভবতী নিজের হাতে পঞ্চব্যঞ্জ দিয়ে ভাত খায়।

সাতোশা কোন কারণে সম্পন্ন না হলে ঢাকার ধোপা, গোয়ালা আর মুসলমানরা নয় মাসের 'নাওয়াশা' অবশ্যই উদ্‌যাপন করে থাকে। অতীতে সৌখিন ও ধনী মুসলমানদের কেউ কেউ পাঁচফল, সাতোশার পাশাপাশি নয় মাসের নাওয়াশাও সাড়ম্বরে পালন করত।

গর্ভস্থ্ সন্তানের লিঙ্গের পরিচয়:

অনাগত সন্তানের পরিচয় জানতে চাওয়া সন্তান সম্ভবা পরিবার পরিজনদের কাছে অত্যন্ত আকাঙ্খিত বিষয়। এই আকাঙ্খার কারণে জন্ম নেয় নানাধরণের চিহ্ন ও লক্ষণের আলোকে অনাগত শিশুটির লিঙ্গীয় পরিচয় জানার পদ্ধতি। নিম্নে আলোচনা করা হল:

ক. স্বপ্ন: 'সাপ দেখলে বাপ হয়' পুরানো ঢাকার প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে গর্ভবতীর স্বপ্নযোগে সাপ দেখা, তার পুত্র সন্তান হবে বলে বিশ্বাস।[৪০] এমনকি স্বপ্নে চাঁদ, কুল বরই, ডাব, জিওল মাছ, গজাল মাছ, ফজলি আম দেখাও পুত্র সন্তান জন্মানোর লক্ষণ। পক্ষান্তরে, সোনা বা সোনার গহনা, ফুল, বরই, পেয়ারা, পুঠি মাছ, পাবদা মাছ, আপেল, বাঙ্গি, কিরাই দেখা কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে বলে বিশ্বাস।

খ. দৈহিক লক্ষণ: গর্ভকালে গর্ভবতীর শারীরিক লক্ষণ থেকেও গর্ভস্থ্ শিশুর লিঙ্গীয় বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা করা হয়ে থাকে। প্রসূতি মায়ের কোমর শুকনা, পেট চোখা হয়ে সামনের দিকে ঝুলে পরলে, নাভিস্থল প্রসারিত হয়ে খানিকটা ছড়িয়ে পরলে এবং নাভির নীচ থেকে নিম্নাঙ্গ পর্যন্ত একটি কালো দাগ প্রলম্বিত থাকলে তাকে ছেলে সন্তান সম্ভবা বলে মনে করা হয়। পক্ষান্তারে, গর্ভবতীর কোমর ও পেট গোলাকার থাকলে তার মেয়ে সন্তান জন্মাবে বলে ধারণা রয়েছে। প্রসূতির এই স্ফিতপেটকে স্থানীয়রা 'জাবরাপেট'

বলে থাকে। ঢাকার প্রচলিত প্রবাদ থেকে জানা যায়- 'জাবরা পেটে লাবরা মেয়ে হয়'।[৪১] আবার কন্যা সন্তান সম্ভবা নারীর শ্রী বৃদ্ধি আর পুত্র সন্তান সম্ভাবা নারীর অসুন্দর হবার লক্ষণ পুরানো ঢাকার আদিবাসী সমাজে প্রচলিত প্রবাদ- 'মাইয়ার মা সুন্দরনী আর পোলার মা বান্দরনী'[৪২] থেকেও প্রকাশ পায়।

গ. প্রসব বেদনা: বিশ্বাস আছে যে, কন্যা সন্তান প্রসবকালে প্রসূতির প্রসব বেদনা প্রথমে ডানদিক থেকে শুরু হয় আর এই ব্যথা ক্রমশ থেমে থেমে উঠে। এর সাথে প্রসূতির চোখে ঘুমঘুম ভাব থাকে। তবে পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠকালে প্রসব বেদনা প্রথমে ডানদিক থেকে শুরু হয় এবং তা বাড়তেই থাকে। এই বিষয়টি প্রবাদাকারে ঢাকার আদিবাসী সমাজে প্রচলিত রয়েছে- 'মাইয়ার ব্যাথা মিষ্টি মিষ্টি আর পোলার ব্যাথা ছিলবিলানি'।[৪৩]

ঘ. সহদোরের দৈহিক লক্ষণ: ছোট শিশুদের দৈহিক চিহ্ন প্রত্যক্ষের মাধ্যমেও তাঁর পরবর্তী সহদোরের লিঙ্গীয় বিষয়টি ধারণা করে নিত ঢাকার আদিবাসীরা। উদাহরনস্বরূপ, শিশুর মাথার পিছনে অর্ধগোলাকারভাবে খানিকটা জায়গায় চুল না থাকলে, একে পাগড়ি বলা হয়ে থাকে। কোন শিশুর এই রকম পাগড়ি থাকলে তাঁর পরবর্তী সহদোর হবে ভাই। অন্যদিকে শিশুর জিহবার আগা গোল আর এর মাঝখানে একটু কাটা থাকলে বোন জন্মায়। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী শিশুদের ঠিক পরবর্তী সহদোর হবে বিপরীত লিঙ্গের। এছাড়া কোন শিশুর 'কোমরে চোখ' থাকলে অর্থাৎ নিতম্বের উপর কোমরে দুইটি পাশেপাশি গর্তের ন্যায় থাকলে তার পিঠাপিঠি ভাই জন্মানোর লক্ষণ বলে ধারণা করা হয়।

ঙ. নাভিরজ্জু: সদ্যোজাত শিশুর নাভির সংলগ্ন রক্তসঞ্চালক শিরারজ্জুতে অবস্থিত গ্রন্থির আকার, বর্ণ আর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে আগত সন্তান সর্ম্পকে ধারণা নিয়ে থাকে পুরোনো ঢাকার আদিবাসী নারীরা। তারা নাভিরজ্জুকে নার, কেউ কেউ আবার বা(ম)ন পৈতাও বলে থাকে। তাদের ধারণা, নারের গিঁট (গ্রন্থি) পাশাপাশি থাকলে ঘনঘন সন্তান জন্মে। তবে গিঁট একটু দুরে থাকলে অপেক্ষাকৃত দেরিতে সন্তান জন্মায়। নারে কন্যা সন্তানের গিঁট হল কালো বা কালচে বর্ণের, অনেকটা গোল পুতির মতো দেখতে। একটু লম্বাটে আকৃতির, হালকা লালচে অথবা সাদা বর্ণের গ্রন্থিটি পুত্র সন্তানের গিঁট নির্দেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

চ. অন্যান্য: সহবাসের পর যে সকল নারী স্বামীর দিকে ফিরে ঘুমায় তাদের গর্ভে কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তবে সহবাসের পর স্ত্রী স্বামীর পিছন ফিরে বাম কাতে ঘুমালে সে পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে বলে মনে করা হয়। এছাড়া আমাবশ্যার পর কোন নারীর গর্ভোৎপত্তি ঘটলে, তাঁর গর্ভে ছেলে সন্তান জন্ম নেয়।

সহজ প্রসব:

ক. সদ্য প্রসূতি যার প্রসব বেদনা দীর্ঘায়িত হয়নি, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর কোন জটিলতা দেখা দেয়নি, তার হাতে বানানো পান গর্ভবতীকে খাওয়ালে প্রসব সহজ হয় বলে বিশ্বাস প্রচলিত।

খ. মেয়ে গর্ভবতী হলে পোয়াতির মা ছটি ঘরের জন্য পুরোনো কাপড় সংগ্রহ করে গাঠ্ঠি বেঁধে রাখত। একে বলা হয়ে থাকে 'হায়তনের গাঠ্ঠি'। প্রসব বেদনাকালে পোয়াতিকে দিয়ে খোলানো হত হায়তনের গাঠ্ঠি, বোতলের কাঁখ, ঘরের সমস্ত বন্ধ তালা। মনে করা হয়, এতে প্রসব সহজ ও দ্রুততর হয়।

গ. যেসকল নারী সহজে ও অপেক্ষাকৃত কম ব্যাথায় বাচ্চা প্রসব করে, তাদের ডেকে এনে প্রসব বিছানা তৈরি করা হত। এর ফলে গর্ভবতী সকল প্রকার প্রসবজনিত ব্যাথা ও প্রতিকূলতা থেকে মুক্তি লাভ করে।

ঘ. মধ্য এশিয়া বিশেষ করে সৌদি আরব থেকে মরিয়ম ফুল এনে প্রসব যন্ত্রণা কমানোর প্রচেষ্টা ছিল ঢাকায়। মরিয়ম ফুল কখনো নির্জীব হয় না। জলের পাত্রে তা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বিকশিত হয়। আবার জল থেকে তুলে নিলে সেটি পুনরায় সংকুচিত হয়ে পরে। ঢাকায় একসময় মরিয়ম ফুল বহুল পরিচিত ছিল এবং পাড়া মহল্লায় বিভিন্ন বাড়িতে মরিয়ম ফুল দেখা যেত। প্রসবকালে মরিয়ম ফুল বাড়িতে থাকলে তা পানিতে রাখা মাত্র বৃদ্ধি পেয়ে ছড়িয়ে পরত। ধারণা করা হয় এর সাথে সাথে মায়ের প্রসব দ্বারও ক্রমশ উন্মুক্ত হয়ে পরে।

ঙ. প্রসববেদনা উঠলে প্রসূতিকে খালাসনামার পানি খাওয়ানো হত।

চ. গর্ভবতী শ্বশুড়ালয় থেকে পিত্রালয়ে ছুটি ফেলার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে শ্বাশুড়ি কিছু প্রতীকী আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করত। গর্ভবতীকে দিয়ে শ্বাশুড়ি শ্বশুড়ালয়ের সমস্ত বন্ধ তালা চাবি দিয়ে খুলাত। বাড়ি থেকে বের হবার সময় গর্ভবতীকে সদর দরজায় পানি এমনভাবে ফেলতে হত যেন পানি দ্রুত গড়িয়ে পরে। প্রচলিত ধারণা, এতে করে প্রসব ব্যাথা উঠার সাথে সাথে বাচ্চা 'গড়গড়িয়ে' বেড়িয়ে আসবে অর্থাৎ শিশু ভূমিষ্ঠ হবে দ্রুত।

ছ. ভূমিকম্পের সময় নগ্ন দেহে কামড় দিয়ে যে মাটি তুলে রাখা হয়, প্রসব বেদনাকালে সেই মাটি পোয়াতিকে খাওয়ালে সে তাড়াতাড়ি সন্তান প্রসব করে।[৪৪]

প্রসবকালীন লোকাচার:

প্রসব বেদনার কথা বেশি লোককে জানালে প্রসূতির প্রসব কষ্ট তীব্র ও বিলম্বিত হয় বলে মনে করা হয়। হিন্দু নারীরা প্রসব বেদনা উঠা মাত্রই হাতের শাঁখা-পলা, গলা ও কোমরের কাইতন-তাবিজ-জরি খুলে ফেলে। সেই সাথে সিঁথির সিঁদুরও মুছে ফেলা হয়। মুসলমানদের মধ্যেও অবশ্য সন্তান প্রসবের পরপরই পরিধেয় জরি-তাবিজ খুলে ফেলার রীতি। পরিত্যক্ত তাবিজ হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নারীরাই নদীতে নিক্ষেপের মধ্যে দিয়ে 'ঠান্ডা'[৪৫] করে থাকে। পূর্বদিনে প্রসূতকে হালদার দোষ মুক্ত রাখতে, হাদলার বিষে আক্রান্ত নারীদের প্রসূতির কাছে আসতে, এমনকি ছুটি ঘরেও প্রবেশ করতে দেয়া হত না। হাদলার দোষে আক্রান্ত প্রসূতি প্রসব বেদনার চাইতেও আরো তীব্র ব্যাথায় ভোগে। এই ব্যাথা প্রসূতির কোমর ও তলপেট জুড়ে অনুভূত হয়। প্রসূতি যার কাছ থেকে হাদলার দোষের ছোঁয়া পায়, সে যে কটি সন্তান জন্ম দিয়েছে, সেই কয়দিন প্রসূতির ব্যাথা স্থায়ী হয়। এছাড়া প্রসব বেদনাকালে প্রসূতি তার হাতের তালু নাভিকূপের উপর রাখলেও হাদলার দোষে পীড়িত হয়ে পরার সম্ভাবনা থাকে। প্রসবে চাপ প্রয়োগ করতে শক্তি বৃদ্ধির জন্য অতীতে প্রসূতিকে সেদ্ধ ডিম, গরম দুধ, চা-বিস্কুট খাওয়ানো হত। প্রসব দ্রুত সম্পন্নের জন্য প্রসূতি ঘরের ভেতর হাঁটাহাঁটি করত। প্রসূতি পেটিকোটের ফিতা পেটের উপরের দিকে শক্ত করে বাঁধত। বর্তমানে প্রসব দ্রুত করানোর ক্ষেত্রে হাসপাতালে সেলাইন ও ডুস দেয়া হয়ে থাকে। প্রসবে জটিলতা তৈরি হলে সিজার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অতীতে ধাত্রীরা ছটিঘরে শিশু প্রসব করাত। জেমস ওয়াইজ বলেছেন-'পারিবারিক দাই-এর হাতে, যে দাই তার মা ও বোনদের প্রসব করিয়েছে, এমন একজনের হাতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে রমনীরা সন্তুষ্ট। সন্তান প্রসবকালে বিভিন্ন রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। প্রসূতি বিশ্বাস করে এই ক্রিয়াকলাপ ও রীতিনীতি মানা বা না-মানার উপর তার ভালমন্দ অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই সে এমন একজন দাই, যার উপর আস্থা রেখে ভরসা পাওয়া যায়।'[৪৬] তিনি আরো জানান-'ধাত্রীর কাজ হল, প্রসব বেদনা দেখা দিলে রোগীকে ডলাইমলাই করা ও তাকে নাড়ানো-চড়ানো যাতে সহজে সন্তান প্রসব হতে পারে।'[৪৭] প্রসবের পর শিশুর নাভিরজ্জু ধাত্রীরা তাদের বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে পেঁচিয়ে ধরত। এতে করে গর্ভফুল প্রসূতির বুকের উপর উঠে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। কেউ কেউ পিচ্ছিলতার কারণে নাভিরাজ্জু ধরতে পাতলা নরম কাপড় ব্যবহার করত। নাভিরজ্জু যাতে ছিঁড়ে না যায় এক্ষেত্রে সতকর্তা অবলম্বনের প্রয়াস নেয়া হত। ধাত্রীরা নাভিজ্জুর অভ্যন্তরে রক্তসমূহ শিশুর পেটের দিকে টেনে দিয়ে নাভিরজ্জুতে শক্ত করে গিঁট দিত। এরপর নাভিরজ্জু সূতা দিয়ে বেঁধে বাঁশের একটি ফালি[৪৮] আরো পরে ব্লেড কিংবা কেচির সাহায্যে কেটে ফেলা হত। শেষে নরম কাপড়ে নাভিকে পেঁচিয়ে ফেলা হত । নাভিরজ্জু ঠিকমত না বাঁধলে নবজাতক ঘন ঘন মল ত্যাগ করে বলে মনে করা হত। এতে করে অনেক সময় শিশুর মৃত্যু অত্যাসন্ন হয়ে পরে। গর্ভফুল নিঃস্রাব করতে ধাত্রীরা প্রসূতির পেটে হালকাভাবে মালিশ করত। গর্ভফুল পরতে দেরি হলে প্রসূতির মাথার চুল মুখ গহবরে ঢুকিয়ে দেয়া হত যাতে বমির চাপে গর্ভফুল পতিত হয়। এতেও না হলে প্রসূতিকে গিলা পড়া আর আখের গুড় পড়া খাওয়ানো হত। আগে অধিকাংশ বাড়িতে পায়খানার পাশে পরিত্যক্ত খালি জায়গা ছিল। সেখানে অথবা পরিত্যক্ত মাঠে ময়দানে কিংবা নদীর কিনারে পুরুষ মানুষের চোখ এড়িয়ে গর্ভফুল মাটিতে পুঁতে ফেলা হত। ঢাকার আরেক সিভিল সার্জন জেমস টেলরের গ্রন্থে উনিশ শতকে শিশু প্রসব সংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখিত আছে। তার উল্লেখিত বর্ণনা অনুযায়ী- 'এদেশে সন্তান প্রসব অতি সহজে ঘটানো হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে অবশ্য, ধাত্রীর অবহেলা অথবা তাদের অমার্জিত ও মাত্রাধিক্য হস্তক্ষেপের দরুন প্রসবের সাধারণ গতি বাধাপ্রাপ্ত বা বিলম্বিত হয়। ফলে স্থান বিশেষে ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা অথবা হাতের সাহায্যে প্রসব করানো হয়ে থাকে। যে সব ক্ষেত্রে প্রসূতির ফুল পড়ে না, অস্বাভাবিক প্রসব হয় এবং পূর্বাহ্নেই পর্দা ছিড়ে যায় ও প্রসবের বেগ হ্রাস পায়- সে সব ক্ষেত্রে প্রসব সম্ভবতঃই কষ্টকর হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

অস্বাভাবিক প্রসবের পূর্বাহ্নে হাত বের হয়ে আসার ঘটনাই বেশী। প্রসূতির সময়মত ফুল না পড়ার ঘটনা প্রায়শ:ই পরিলক্ষিত হয়। গর্ভাশয় থেকে রক্তক্ষরণের দুটো মাত্র ঘটনা আমি পেয়েছি এবং উভয় ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার কারণ ছিল গর্ভাশয়ের মুখে ফুল আটকা পড়া। এখানকার দেশীয় মেয়েদের মধ্যে প্রসূতি অবস্থায় বেশীর ভাগ মৃত্যুর ঘটনা প্রসবের পর উত্তেজক ঔষধ পত্র সেবনের ফলে ঘটে থাকে। বিভিন্ন উপকরণ মিশ্রিত ঔষধ পত্রাদি শহরে বিক্রি হয়ে থাকে এবং প্রসূতিরা তাদের শাদাস্রাব সম্পূর্ণ তিরোহিত না হওয়অ পর্যন্ত ঐ জাতীয় ঔষধ সেবন অত্যাবশক বলে মনে করে। এ ধরণের ঔষধ সেবন, সাংঘাতিক গরমের মধ্যেও বন্ধ ঘরের ভিতরে আগুন প্রজ্জলিত রাখার রীতি থেকে মাতৃগর্ভে প্রদাহের সৃষ্টি হয় এবং পরিণতি শোচনীয় হয়ে থাকে।'[৪৯]

জোকার ধ্বনি:

ঢাকার হিন্দুরা শিশু জন্মানোর পরপরই জোকার দিয়ে থাকে।[৫০] সাহাদের নিয়মানুযায়ী, পাঁচ বা সাত জন নারী একত্র হয়ে পুত্র সন্তানের জন্য বেজোড় আর কন্যা সন্তানের জন্য জোড় সংখ্যক জোকার দেয়। অন্যদিকে, শাঁখারী নারীরা ছেলে জন্ম হলে পাঁচবার আর মেয়ে জন্মালে তিনবার জোকার দেয়। গোয়ালা ও ধোপাদের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠের পর নবজাতকের দাদা-দাদী, নানা-নানী কর্তৃক কাঁসার থালা পেটানো রীতি প্রচলিত আছে। এর সাথে গোয়ালারা তিনবার আর ধোপারা পাঁচবার জোকার দিয়ে থাকে।

আযান প্রদান:

ইসলাম ধর্মে সদ্যোজাত শিশুর কানে আযান দেয়ার কথা বলা হয়েছে। পুরোনো ঢাকার মুসলিম পরিবারে নবজাতকের কানে আযান দেয়ার কাজটি মুলত: শিশুর দাদা, নানা বা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা সুসম্পন্ন করে থাকেন। পূর্বকালে পুত্র সন্তানের কানে আযান দেয়া হলেও কন্যা সন্তানের কানে দাদী, নানী অথবা ধাত্রী কলেমা পড়ত। লোকজ বিশ্বাস, জন্মের পর নবজাতক শিশু নাকি তার ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে শঙ্কিত থাকে। শিশুর কানে আযানের শব্দ গেলে সে তার ধর্মীয় পরিচয় সম্পর্কে অবগত হয়ে আনন্দিত হয়ে উঠে।[৫১] অতীতে পুরোনো ঢাকার কোন কোন স্থানে শিশু ভূমিষ্ঠ হলে চল্লিশদিন পর্যন্ত মাগরিবের সময় বাড়ির সদর দরজায় আযান দেয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। তাদের ধারণা, সন্ধ্যার সময় অশরীরী আত্মার চলাচল বৃদ্ধি পায়। আযানের শব্দ শোনা মাত্র তারা পলায়ন করে। ঢাকার মুসলিম মেয়েরা

Dhaka University Institutional Repository

মাগরিবের সময় তাদের নবজাতককে বিছানায় শুইয়ে রাখে না। নবজাতককে তখন কোলে নিয়ে দোয়া-দরূদ পড়তে থাকে।

নাড়িঃ

ঢাকার লোকদের বিশ্বাস রয়েছে, সন্তানের নাড়ি কেটে কর্তিত অংশটি চুল্লীর নিকট মাটিতে পুঁতে রাখলে নাড়ি তাড়াতাড়ি শুকায়।[৫২] নাড়ি শুকানোর জন্য সেখানে ব্যবহার করা হত জেনসেন ভায়েলা ও নারিকেল তেলে মিশ্রিত সিবাজল ট্যাবলেট গুড়া এছাড়া সময়মত বরিক পাউডারের সেক চলত নাড়ি শুকানো পর্যন্ত। অনেকে কাপড়ের ভেতর আযোয়ান বা যোইন ভরে ছোট পুঁটলি তৈরি করত। সেটি আইলার আগুনের তাপে নবজাতকের নাভিকূপে সেক দেয়া হত। অতীতে নবজাতকের নাভির অবশিষ্টাংশটি শুকিয়ে পরে গেলে শাঁখারী মেয়েরা ক্ষত স্থানে একটি কাঁচা পয়সা ছুঁয়াতো। এরপর চুলার একখন্ড পোড়ামাটিতে সিঁদুর চর্চিত করে তা আগুনের তাপে ক্ষতস্থানে সেক দেওয়া হত।[৫৩]

পূর্বে শিশুদের পরিত্যক্ত নাড়ি বিশেষ কোন স্থানে ফেলার প্রথা প্রচলিত ছিল। শিশুর চারিত্রিক ও পেশাগত জীবনে সেই বিশেষ স্থানের প্রভাব থাকে বলে মনে করা হত। মুসলমানদের অনেকেই দিনদার ও নেক সন্তান লাভের আকাঙ্খায় পরিত্যক্ত নাড়ি ফজরের নামাজের পূর্বে মসজিদ চত্বরে পুঁতে আসত। সাধারণত শিশুর নাড়ি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, খেলার মাঠ, উকিলের বাড়ি কিংবা আদালত প্রাঙ্গণে ফেলা হত। তবে কন্যা সন্তানের নাড়ি কলা গাছের নীচে পুঁতা হত। এর জন্য সে শীতল মেজাজের অধিকারী হয় বলে বিশ্বাস রয়েছে। গোয়ালাদের মতে, কলা গাছের নিচে কন্যা শিশুর নাড়ি পুঁতে দিলে সে শীতল মেজাজের পাশাপাশি লম্বা চুলের অধিকারী হয়ে থাকে।[৫৪]

শিশুর জন্ম সংক্রান্ত লোকবিশ্বাসঃ

ক. তেতালিয়াঃ উপর্যুপরি তিন কন্যা সন্তানের পর জন্ম নেয়া পুত্র সন্তানকে ‘তেতালিয়া’ বা ‘তেতুইলা’ বলা হয়ে থাকে। পুরোনো ঢাকার মুসলমানরা এইরূপ শিশুকে দুরন্ত স্বভাবজাত বলে মনে করে থাকে। তাদের মতে, তেতালিয়ার দুরন্তপনা বাবা-মাকে নানা সমস্যায় ফেলে থাকে। অন্যদিকে, হিন্দুদের কাছে এই ধরণের শিশু অশুভ লক্ষণযুক্ত। এদের জন্মের পর পিতার সংসারে আর্থিক বিপর্যয় ঘটে থাকে। হিন্দু

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে কথিত আছে- 'তিন বালার পর হইল বালি, ধনে করে ফালাফালি। তিন বালির পর হইল বালা, ধনে করে আলাঝালা।'[৫৫] এর প্রতিকারের উদ্দেশ্যে অতীতে ঢাকার হিন্দু-মুসলিমরা আত্মীয় স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশীদের মাঝে তেঁতুল ও গুড় বিতরণ করত। পুরোনো ঢাকার অন্যত্র এইরূপ শিশুকে দোষমুক্ত করতে পাটখড়ি দিয়ে ঘর তৈরি করা হত। মা শিশুকে কোলে নিয়ে ঘরটি ঘুরে আসার পর সেটি আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হত।[৫৬]

খ. সিতলি: পর পর তিন পুত্র সন্তানের জন্মের পরে যে কন্যা সন্তান জন্ম হয়, তাকে 'সিতলি' বলা হয়। সিতলি ভাগ্যবতী হবার কারণে তার জন্মের পর পিতার সংসারে আয়-উন্নতি ক্রমশ বৃদ্ধি পায় বলে লোকজ বিশ্বাস রয়েছে। অতীতে সিতলি জন্ম হলে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবসহ প্রতিবেশীদের মাঝে তিন কাঁটাযুক্ত মাছ[৫৭] ও শীতলপাটি বিতরণ করার রীতি প্রচলিত ছিল। অনেকে আবার মসজিদে শীতলপাটি ও মিষ্টি দান করত। মনে করা হত, এতে করে সিতলি শীতল মেজাজের হবে।

গ. রাজটিকা: মাঝেমধ্যে কপালের মধ্যবর্তী স্থানের খানিকটা জায়গায় হালকা গোলাকার অথবা অর্ধ গোলাকার রেখা লালচে বা কালচে বর্ণ ধারণ করলে, একে 'রাজটিকা' বা 'চাঁনকপাল' বলা হয়ে থাকে। পুরোনো ঢাকার লোক সমাজে এরা অত্যন্ত ভাগ্যবান হিসেবে পরিগণিত হয়। এদের জন্মের পরপরই পিতা-মাতার সংসারে আর্থিক সমৃদ্ধি উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পায়। 'রাজটিকা'ধারী কন্যা সন্তানের বিয়ের পর স্বামীর সংসারেও আয়-উন্নতি ঘটে। লোকজ বিশ্বাস অনুযায়ী, অতি ভাগ্যবান হবার কারণে এরা অনেক সময়ে হিংসুক ও যাদুকারিনীর অপতৎপরতায় আপতিত হয়ে নিজেদের রাজকপাল হারায়, এমনকি মৃত্যু মুখেও পতিত হয়ে থাকে। আবার তাদের কপালের প্রশংসায় মানুষ বিস্ময়াপন্ন হয়ে উঠলে নযর লেগে সেই সৌভাগ্য নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া রাজটিকার উপর অন্য কারো হাতের স্পর্শ হলে, সেই আধিকারীক অসুস্থ হয়ে পরে। জানা যায়, রাজভাগ্য হরণের উদ্দেশ্যে যাদুকারিনী তার ডান হাতের তর্জনী দ্বারা নিজ ললাট ও বাম হাতের তালুতে স্বস্তিকা অংকন করে। এরপর তর্জনীকে এমনভাবে চুষতে থাকে যেন ফেঁটে রক্ত ঝরে।[৫৮] অতীতে শিশুর ললাটের এই চিহ্নকে আড়াল করতে কাজলের টিপ দিয়ে ঢেকে ফেলা হত। যৌবনকালে অবশ্য চুল দিয়ে ঢেকে রাখার প্রয়াস চলত।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. সাপ শিশু: মাঠ পর্যায়ে একাধিক তথ্য প্রদানকারীর কাছ থেকে মানব গর্ভে সাপ জন্মানোর কথা জানা যায়। কারো কারো ধারণা, মানব নারীর গর্ভে জন্ম নেয়া সাপ সন্তানটি জিন জাতির অন্তর্গত। পাতালপুরে জিনদের মধ্যে কেউ কোন অপরাধ করলে ইন্দ্র রাজা তাকে সেখান থেকে অভিসম্পাত দিয়ে বহিষ্কার করে দেয়। এরফলে অভিশপ্ত জিনটি মানুষের গর্ভে সাপ, এক পাইয়্যা মোরগ অথবা মানুষের রূপেও জন্ম নিয়ে থাকে।[৫৯] পুরোনো ঢাকার লোক সমাজে কোন নারীর গর্ভে সাপ জন্মা হওয়া সৌভাগ্যের লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত। লোক মতে, 'সাপ জন্ম হলে বংশ উপরের দিকে উঠে' অর্থাৎ সাপ সন্তানের জন্ম তার বাপ-ভায়ের ধন ও মানের সমৃদ্ধি ঘটায়।[৬০] এ ছাড়াও সেই বংশের সাত পুরুষকে নাকি সাপে কাটে না।[৬১] সাপের সাথে সব সময় একটি মানব পুত্র সন্তানও জন্ম নিত। সাপ সন্তান মা ব্যতিত অন্য কারো কাছে আসত না। দুধ খাওয়ার সময় হলে সে তার জমজ ভায়ের সাথে মাতৃস্তন্য পান করত। কখনও আতংকিত হলে মা সাপ-সন্তানের জন্য স্তনের দুধ বাটি ভরে রেখে দিত।

ঙ. বামনপোতিয়া: যেসকল শিশু গলায় নাড়ি জড়ানো অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, তারা 'বামনপোতিয়া' বা 'বা(ম)ন পৈতা' নামে পরিচিত। এদের সম্পর্কে যে লোক ধারণা রয়েছে, তা হল- এরা স্বভাবজাত লাজুক প্রকৃতির। এদের শরীরে কুলার বাতাস, ঝাড়ুর বারি, কারো পায়ের লাথি লাগলে এরা অসুস্থ হয়ে যায়। তবে শিশুকাল অতিবাহিত হয়ে গেলে এসকল সমস্যা দূরীভূত হয়ে যায়।

চ. শনিবাইরা ও মঙ্গলবাইরা: শনিবারে জন্ম নেয়া শিশুকে 'শনিবাইরা' আর মঙ্গলবারে জন্ম হলে সেই শিশুকে 'মঙ্গলবাইরা' বলা হয়ে থাকে। এদের স্বভাবজাত দুরন্ত প্রকৃতির মনে করা হয়। অন্যদিকে, ঢাকার মুসলমানদের কাছে সোমবারে জন্ম নেয়া শিশু সভ্য হিসেবে পরিগণিত। সোমবার হচ্ছে শেষ নবীর জন্ম ও মৃত্যুবার। সেজন্য এখানে সোমবারকে নবীর বারও বলে থাকে অনেকে। আবার তাদের কাছে বৃহস্পতি ও শুক্রবারে জন্ম হওয়াও সুলক্ষণযুক্ত। উক্ত দিনগুলিতে সন্তান জন্ম হলে সেই সন্তান নেককার ও সৎচরিত্রের হয়ে থাকে।

ছ. মুরা বাচ্চা: শিশু জন্মের চল্লিশ দিন পর মায়ের ঋতুস্রাব না হয়ে পুনরায় গর্ভবতী হয়ে পরলে ঐ মাকে 'মুরা পেট' বলা হয়। মুরা পেটে যে শিশুর জন্ম হয় সেটি ঢাকার আদিবাসীদের কাছে 'মুরা বাচ্চা' নামে পরিচিত। লোক ধারণা, এই ধরণের শিশু অশুভ লক্ষণযুক্ত। পুরোনো ঢাকার লোকসমাজে এদের নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাদ আছে-'মুরা খায় বুড়া'।[৬২] অর্থাৎ এই সন্তানের আগমন পরিবারে দাদা-দাদী, নানা-নানীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়ায়। ভাগ্যগুণে যদি পরিবারের কোন বৃদ্ধের মৃত্যু না-ও ঘটে, তবে সেই পরিবারটি নানা রকম বিপদাপদে পতিত হয়। মুরা শিশু বেড়ে উঠার সাথে সাথে এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়।

জ. মইল্যাঃ সেই সকল শিশুদের 'মইল্যা' বলা হয়ে থাকে যাদের আগে পরে সহদোর ভাইবোন মারা গেছে। মইল্যাদের সম্পর্কে ধারণা রয়েছে তারা খুব জেদি ও আনোখা (স্পর্শকাতর)।

ঝ. সাত পর্দার ভেতর জন্মঃ কখন কখন গর্ভঝিল্লিসহ শিশুর জন্ম হয়। স্থানীয়রা এ অবস্থাকে বলে 'সাত পর্দার ভেতর জন্ম'। সাত পর্দার ভেতর জন্ম নেয়া শিশুদের কিসমতয়ালা (ভাগ্যবান) এবং স্পর্শকাতর মনে করা হয়। এদের গায়ে কুলার বাতাস, ঝাড়ুর বারি, কারো পায়ের লাথি লাগলে নাকি জ্বর আসে। অতীতে এইরূপ শিশুদের শনি ও মঙ্গলবারে ঘরের বাইরে বের হতে দেয়া দেয়া হত না। তুলা রাশির জাতক-জাতিকা যদি এদের পেটে পা রাখে, তাহলে তারা দোষমুক্ত হয়। অন্যদিকে, কারো শরীরে ব্যাথা বেদনার স্থলে এরা তাদের পা দিয়ে স্পর্শ করলে সেই ব্যাথার উপশম ঘটে।

ঞ. উল্টা বাচ্চাঃ মাথার পরিবর্তে পায়ের দিক থেকে ভূমিষ্ঠ শিশুকে 'উল্টা বাচ্চা' বলা হয়ে থাকে। উল্টা শিশুর জন্ম উভয়ের জন্যই ঝুঁকিপূর্ণ। বর্তমানে এরকম পরিস্থিতি তৈরি হলে সিজার করা হয়ে থাকে। অতীতে অভিজ্ঞ ধাত্রীর হাতে বাড়িতেই উল্টা শিশুর প্রসব সম্পন্ন হত। জানা যায়, অভিজ্ঞ ধাত্রীরা প্রসূতির পেটে তেল মালিশ করে উল্টা শিশুকে ঘুরিয়ে স্বাভাবিক প্রসবাস্থায় আনতে সক্ষম ছিল। এই রকম অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে অনেকেই ঘরের প্রবেশ পথে তাবিজ ঝুলিয়ে রাখত। সেই পথ দিয়ে প্রসূতির নিয়মিত গমনাগমনের ফলে গর্ভের উল্টা শিশু স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসে বলে বিশ্বাস করা হত। উল্টা শিশুর প্রসব করানোর কালে ধাত্রীরা প্রথমে শিশুর দুই পা বের করে, এরপর হাত দুটো ধরে আস্তে টেনে মাথাটা কায়দা করে বের করত। উল্টা শিশু প্রসবের ক্ষেত্রে সব সময় যে তারা সফল হত তা নয়। অনেক সময় প্রসব করানোর কালে শিশুর হাত ভেঙ্গে যেত। শিশুর দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে পরত। কখনো শিশু, আবার অনেক ক্ষেত্রে মা শিশু উভয়েই মারা যেত।

Dhaka University Institutional Repository

ট. জোড়া বাচ্চা: 'জোড়া বাচ্চা' (জমজ) হল মাতৃগর্ভ থেকে একসাথে দুটো শিশুর জন্ম। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতই এখানেও জমজ শিশুর ব্যাপারে অনাগ্রহ দেখা যায়। সেই কারণে মেয়েদের যেকোন জোড়া ফল বিশেষ করে জোড়া কলা খেতে দেয়া হয় না। এক ফুলে জন্ম নেয়া জমজ শিশুর স্বভাব-চরিত্র একই রকম আর দুই ফুলে জন্ম হলে ভিন্ন চরিত্রের হয় বলে মনে করা হয়।

ঠ. অপরিপক্ক শিশুর জন্ম: আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে সাত মাসের ভূমিষ্ঠ শিশুকে এখন ইনকিউবিউটরে রাখা হয়ে থাকে। অতীতে এই ধরণের নবজাতককে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন পরত। জানা যায়, উষ্ণতার জন্য তাদেরকে তুলার মধ্যে পেঁচিয়ে রাখা হত। নরম কাপড়ের সলতা পাকিয়ে এর একপ্রান্ত দুধে ডুবিয়ে সেটা দিয়ো ফোঁটা ফোঁটা দুধ শিশুকে খাওয়ানো হত।

ড. দেও বা রাক্ষস শিশু: দৈহিকভাবে বিকৃত শিশুরাই 'রাক্ষস' বা 'দেও (দৈত্য) বাচ্চা' হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। অতীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদেরকে লবন পানি খাইয়ে, এসিডে ঝলসে অথবা মাটিতে পুঁতে ফেলে হত্যা করা হত। নির্মম হত্যার বৈধতা দিতে তৈরি করা হত নানান গপ্পকাহিনী।

ঢ. অন্যান্য: আরবী সন অনুযায়ী মহরমের পরের মাসটি হচ্ছে তেজি। পুরোনো ঢাকার মুসলিম সমাজে কথিত আছে- 'তেজির চাঁন্দে বেজি হয়'।[৬৩] উল্লেখিত মাসে যেসকল শিশু জন্ম নেয় তারা অনেক জেদি ও একগুয়ে স্বভাবের হয়ে থাকে। আবার তাদের মতে, ভাদ্র মাসেও নাকি 'ভাদাইমা' জন্মে। অর্থাৎ ভাদ্র মাসে যাদের জন্ম তারা বাউন্ডুলে স্বভাবের হয়। তাছাড়া এদের জন্মের কারণে পরিবারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। অপরদিকে, রমজান ও মহরম মাসে জন্ম নেয়া শিশু নেককার ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়। চৈত্র মাসে যেসকল শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তারা 'চৈতালি' নামে পরিচিত। এরূপ শিশুরাও ভাগ্যবান হয়ে থাকে।

বছরের শুরুর মাসগুলোতে এক সন্তান জন্ম হওয়ার পর যদি ঐ একই বছরের শেষে আরো একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাদের মা অথবা বাবার মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটবে বলে বিশ্বাস রয়েছে।

বিশাবিবি:

Dhaka University Institutional Repository

পুরোনো ঢাকার মুসলিম সমাজে বিশ সন্তানের মা 'বিশাবিবি' নামে পরিচিত। প্রচলিত বিশ্বাস মতে, বিশতম সন্তানের জন্মের সাথেই বিশাবিবির বিয়ে ভেঙ্গে যায়। তাকে পুনরায় তার স্বামীর সাথে বিয়ে দিতে হয়, এ রীতি পালন না হলে স্বামীর মৃত্যু ঘটে।

এক ছেলের মা:

পুরোনো ঢাকার আদিবাসী সমাজে এক ছেলের মাকে নিয়ে বিচিত্র ধরণের লোকসংস্কার রয়েছে। এক ছেলের মায়ের রাত্রিবেলায় বাঁশির আওয়াজ শুনতে নেই। এতে ছেলের অমঙ্গল হয়। রাত্রিবেলায় বাঁশির শব্দ শুনতে পেলে সেই রাত্রে সে ভাত খাবে না। তবে রাতে ভাত খাওয়ার সময় বাঁশির শব্দ শ্রবণ করা মাত্রই সে যদি ভাতের থালা উল্টে ফেলে এর উপর বসে পরে, তাহলে বাঁশি বাদকের গলায় নাকি রক্ত উঠে সে মারা যায়। পাঁচমিশালি মাছের মধ্যে যদি কোন এক প্রকারের মাছ একটি থাকে, তাহলে এক ছেলের মা সেটি খাবে না। কাক অথবা অন্য কাউকে দিয়ে দিবে। আবার এক ছেলের মায়ের তরমুজ, লাউ লম্বালম্বিভাবে কাটার নিয়ম। আড়াআড়িভাবে কাটা নিষেধ। এছাড়া এক ছেলের মায়েরা কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য কোঁচরে নেয়া থেকে বিরত থাকে। কোন কারণ বশতঃ খাদ্যদ্রব্য কোঁচরে নিলেও তা ভক্ষণ করবে না।

জন্ম দাগ:

গর্ভকালে শীলপাটার উপর সাপি (গরম হাড়ি ধরার কাপড়) রাখলে ভাবী জাতকের শরীরে জন্ম দাগ দেখা দেয় বলে বিশ্বাস রয়েছে। অনেকের আরো ধারণা, গর্ভস্থশিশু পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকায় শঙ্কিত হয়ে পৃথিবীতে আসতে চায় না। সে মাতৃজঠরে থেকে যাবার জেদ ধরে। এই সময় ফেরেস্তারা তাকে পৃথিবীতে পাঠানোর জন্য কোরার বারি মারে। শরীরের যে সকল স্থানে কোরার আঘাত লাগে সেখানে জন্ম দাগ দেখা যায়। আবার কারো মতে, গর্ভধারিণীকে তার স্বামী প্রহার করলে বা গর্ভবতী অন্যকোন ভাবে শরীরে ব্যাথা পেলে, গর্ভবতীর শরীরের যেসকল স্থান আঘাতপ্রাপ্ত হয়, গর্ভস্থ সন্তানের শরীরের সেসকল স্থানে জন্ম দাগ দেখা দেয়। সন্তানের জন্ম দাগ মাকে দেখতে নেই। পুরোনো ঢাকার অভিজ্ঞ নারীরা অবশ্য জন্মদাগের ধরণ দেখে ভালমন্দ নির্ণয় করতে পারে। পিঠ ও হাতে জন্ম দাগ থাকা ভাল। লালচে বর্ণের জন্ম দাগ সুলক্ষণযুক্ত। অপরপক্ষে, কালো বর্ণের দাগ হল অশুভ লক্ষণযুক্ত। জন্ম দাগের স্থান কেটে ফেলা নিষেধ। কাটলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া লোমে আবৃত চামড়ার

উপর একটু স্ফিত কালোবর্ণ গোলাকার জন্ম দাগে অন্য কোন ব্যক্তি স্পর্শ করলে, জন্ম দাগের অধিকারী জ্বরে আক্রান্ত হয়।[৬৪]

কুষ্ঠিনামা:

এক সময় ঢাকার হিন্দু সমাজে সন্তান ভূমিষ্ঠ লাভের সঙ্গে সঙ্গে কুষ্ঠিনামা লেখা হত। কুষ্ঠিনামা লিখতেন পন্ডিত ব্রাহ্মণ। জন্মের দিন, ক্ষণ, সন-তারিখ (বাংলা ও ইংরেজি), নক্ষত্র, তিথি, চাঁদ ইত্যাদি তথ্যাদির সাথে বিভিন্ন পঞ্জিকা থেকে তথ্য মিলিয়ে তৈরি করা হত শিশুর কুষ্ঠিনামা। শিশুর শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা, বৈবাহিক জীবন ইত্যাদি কুষ্ঠিনামায় লেখা থাকত।[৬৫] এখন এই প্রথাটি বিলুপ্ত প্রায়। জেমস ওয়াইজ লিখেছেন- 'সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে হিন্দুদের সবাই ও মুসলমানদের অধিকাংশ রক্ষণশীল জ্যোতিষীদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন। একটি নির্ভুল ঠিকুজির জন্য একশো টাকাও দেয়া হয়।'[৬৬]

নামকরণ:

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই নামকরণ প্রথা প্রচলিত। হিন্দু-মুসলিম শাস্ত্রেও শিশুর সুন্দর নামকরণ করার ব্যাপারে বলা হয়েছে। শিশুর নাম দেওয়ার ক্ষেত্রে এখানে ধর্মীয় ও লৌকিক উভয় ধারণার চর্চা এখনো অব্যাহত আছে। ধর্মীয় নির্দেশনা অনুযায়ী অবস্থাপন্ন মুসলিমরা সন্তান জন্মের সাত দিন, চল্লিশ দিন অথবা আরো পরে আকিকা দিয়ে শিশুর আসল নাম দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে পুত্র সন্তানের জন্য দুইটি আর কন্যা সন্তানের জন্য একটি ছাগল কোরবানী করার নিয়ম। জেমস ওয়াইজের গ্রন্থে উনিশ শতকে শিশুদের আকিকা সম্পর্কে কিছুটা বর্ণনা পাওয়া যায়। তার উল্লেখিত বর্ণনা অনুযায়ী- 'প্রসূতি পাক-পবিত্র হলে শিশুর জন্মের চল্লিশতম দিনে পিতা শুকুর গুজার করার জন্য এক ভোজপর্বের আয়োজন করেন- যা আকিকা নামে অভিহিত। ছেলে সন্তানের জন্য দুটি আর মেয়ে সন্তানের জন্য একটি খাসী আল্লাহর নামে জবেহ করা হয়। ঈদ-উল কোরবানের মত এ পশুগুলি হতে হয় খুঁতহীন অর্থাৎ বিকলাঙ্গ ও অসুস্থ নয়।

আকিকার মাংসকে কেউ কেউ মনে করেন প্রসন্নকারী (ছাদগা) হিসেবে। মাংস বিলিয়ে দেয়া হয় ফকিরদের মধ্যে। তবে অধিকাংশ লোকের কাছে এ হল সামাজিক ভোজপর্ব। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব একত্রে মিলিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করেন। আকিকার পশুর হাড়হাড্ডি মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। চামড়া দান করা হয় গরীবদের। নবজাতকের বাবা-মা, দাদা-দাদি ও নানা-নানির জন্য আকিকার মাংস

Dhaka University Institutional Repository

নিষিদ্ধ।'[৬৭] এখন ঢাকার মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় সচেনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিশুর ঘনিষ্ট জনেরাও আকিকার মাংস ভক্ষণ করে থাকে।

শিল্পপতি আনোয়ার হোসেনের আত্মজীবনীতে আঠার শতকে শিশুদের নামকরণের একটি তথ্যচিত্রের উল্লেখ রয়েছে- 'প্রায় দু'শ বছর আগে, 'আঠারোশ' সালের প্রথমদিকে এক ঈদের দিনে জন্মেছিলেন ঈদু মিয়া। এ' কারণে 'ঈদ' শব্দের সঙ্গে মিল রেখে তার নাম রাখা হয়। তখনকার দিনে এভাবেই নাম রাখা হত। নবজাতকের গায়ের রং কালো হলে কালা মিয়া বা কালিমুন্নেসা, ফর্সা বা সুন্দর হলে চাঁন মিয়া বা চাঁনমন বিবি।'[৬৮]

মনুসংহিতায় জন্ম থেকে দ্বাদশ দিনে নবজাতকের নামকরণ করার কথা উল্লেখিত আছে।[৬৯] ঢাকার ধোপারা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই নামকরণের জন্য ব্রাহ্মণের কাছে যায়। ব্রাহ্মণ ঠাকুর নবজাতকের জন্মের মাস, তারিখ, দিন, ক্ষণ, তিথি ইত্যাদি গণনা করে যে নামকরণ করেন, সে নামেই শিশুকে ডাকা হয়ে থাকে। অন্যদিকে, ঢাকার সাহা'রা নবজাতকের জন্মের তিনদিনে, গোয়ালা ও শাঁখারীরা ছয় ষষ্ঠীর রাত্রে আর ঋষিরা এগার দিনে শিশুর নামকরণ সম্পন্ন করে থাকে। সাহা'রা নবজাতকের নামকরণ করার উদ্দেশ্যে সাত সলিতা বিশিষ্ট একটি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রত্যেকটি সলিতার পাশে একটি করে নির্বাচিত নামের চিরকুট রাখে। যে সলিতার আগুন অধিক উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাকে সেই সলিতার নামটি শিশুর জন্য রাখা হয়। আবার ঢাকার গোয়ালারা ছয় ষষ্ঠীর রাতে ছটিঘরে শিশুর নামকরণের উদ্দেশ্যে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালায়। প্রতিটি প্রদীপের পাশে রাখা হয় শিশুর জন্য পাঁচটি নির্বাচিত নামের চিরকুট। যে প্রদীপের শিখা শেষ পর্যন্ত জ্বলতে থাকে, সেটি শিশুর নামকরণ করা হয়। ঋষি ও গোয়ালাদের নিয়মানুযায়ী, যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে ব্রাহ্মণ ঠাকুর শিশুর পরিবার কর্তৃক নির্বাচিত নামটি মন্ত্র পড়ে শিশুর কানে উচ্চারণ করেন।[৭০] এই নামটি হল শিশুর আসল নাম। শিশুর পরিবার আসল নামের পাশাপাশি শিশুর ডাক নামও দিয়ে থাকে। জেমস ওয়াইজ জানিয়েছেন, চামারদের মধ্যে নবজাতকের নাম রাখার সময় কোনো অনুষ্ঠান হত না। আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কেউ একজন নাম ঠিক করতেন।[৭১]

শিশুর মাথা মুন্ডন ও চুল দান:

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার মুসলমানরা শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাত দিন পর অনেকেই নাভি পরার পর নবজাতকের মাথা মুন্ডন করে থাকে। পূর্বে নবজাতকের চুল চেঁছে বেশ ভালো আয় করত নাপিতরা। বাচ্চার দাদী, নানী, খালা, ফুফু সবাই মিলে কিছুটা চাল, ডাল, আলু, বেগুন একটা কুলায় করে নাপিতকে দিত, সঙ্গে দেয়া হত নতুন কাপড় আর টাকা। নবজাতকের চুল চেঁছে চার-পাঁচআনা থেকে শুরু করে বাচ্চার বাবা-মা'র আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী কখনও নাপিতরা পাঁচটাকা পর্যন্ত আয় করতে পারত।[৭২] এছাড়াও পিতা-মাতার আর্থিক অবস্থানুসারে চুলের ওজনে স্বর্ণ ও রৌপ্য দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ রেওয়াজ আছে। উনিশ শতকে অত্রঅঞ্চলের শিয়ারা সন্তানসন্ততি জন্মের সপ্তম দিনে মুন্দানা অনুষ্ঠান পালন করত। তবে অভাবের কারণে আচার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে তাদের পালন করা হয়ে উঠত না। বাচ্চাদের মাথা মুড়িয়ে দেবার পর সেই চুল স্বর্ণমুদ্রার সঙ্গে ওজন করার সামর্থ্য ছিল না। স্বর্ণমুদ্রার সম পরিমান অর্থ বিলিয়ে দেওয়াও ছিল তাদের সাধ্যের বাইরে।[৭৩] এখনও অনেকেই বিপদে পতিত হবার আশঙ্কায় সোমবার এবং জন্মবাওে চুল ও লোমকূপ ফেলা থেকে বিরত থাকে। এই বিষয়টি প্রবাদাকারে পুরোনো ঢাকার লোকসমাজে প্রচলিত রয়েছে-' সোমবারে লোম ফালায় না। লোম ফালাইলে জমে টানে'।[৭৪] কোন কোন স্থানে নবজাতকের চুল ফেলে গোসলের পর জাফরান গুলিয়ে মাথায় দেয়ার রেওয়াজ।[৭৫]

ঋষিদের মধ্যে নবজাতকের চুল ফেলা হয় ষষ্ঠ অথবা একাদশ দিনে। অন্যদিকে সাহা'রা জন্মের আঠারমাস পর শিশুর চুল ফেলে থাকে। শিশুর এক, তিন বা ছয়মাস বয়সে মাথা মুন্ডন করে শাঁখারীরা। এই অনুষ্ঠানটি তাদের কাছে 'চুল তোলনী' নামে পরিচিত। ঐদিন শিশুর মায়ের উপবাস থাকার রীতি। মাথা কামানোর পূর্বে শিশুসহ মা স্নান করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে। বাড়ির মন্দিরের দেবতার উদ্দেশ্যে পাঁচ রকমের পাঁচটি আস্ত ফল উৎসর্গ করা হয়। মন্দিরে মা তার শিশুকে কোলে নিয়ে বসে শাড়ির বিছানো আঁচলে কলাপাতা উপবেশন করে। নাপিত শিশুর কাটা পরিত্যক্ত চুল সেই কলাপাতায় ফেলে। শাঁখারীদের মাঝে প্রথম সন্তানের চুল মন্দিরের দেবতার উদ্দেশ্যে দান করার রীতি। দানের পর অবশ্য এটি নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। অবস্থাপন্ন শাঁখারীরা চুল তোলনী-দিন আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে ফল কিনে পাঠায়।[৭৬] ইদানিং শাঁখারীদের মাঝে শিশুর চুল মুন্ডন অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের পোলাও কোরমা রান্না করে খাওয়ানো হয়। অতিথিরা শিশুকে টাকা, জামা, স্বর্ণালংকার ইত্যাদি উপহার দেয়। অতিথিরা উপহার প্রদানকালে মা ও শিশুর কপালে ধান-দূর্বা ছিটিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আশীর্বাদ করে। একই সাথে প্রদীপের শিষে তিনবার করে বৃদ্ধা আঙুলে ছোঁয়া দিয়ে তাদের কপালে ঠেকানো হয়।

ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায়ে বিশেষ করে নারীরা গর্ভজাত শিশুর চুল মন্দিরে দান করার মানত করে থাকে। উদ্দেশ্য প্রসূতি ও ভাবী জাতকের মঙ্গল কামনা। ভাবী সন্তানের চুল দানে প্রসূতিসহ তার মা, দাদী, নানী, শ্বাশুড়ি বা স্বামী মানত করে বলে- 'বাবা মায় তোমরা নামকা টিক্কি রাখ দিয়া, যেসা মেরা/মেরা বেটিকা/বাউকা গোদ ভারা রায়। তোমরা নামনে চুল রাখখেনে।'[৭৭] ধোপারা মানত করলে পাঁচ, সাত বা বার বছর বয়সের শিশুর চুল দান করে। এক্ষেত্রে শিশুর পরিবারের আর্থিক সঙ্গতির উপর মানতপূরণ নির্ভর করে। হিন্দু মেয়েরা যে সকল মন্দিরে শিশুর চুল দান করে, তার মধ্যে ভারতের তারাকেশ্বর, ঢাকেশ্বরী মন্দির, নারায়ণগঞ্জের পাগলায় অবস্থিত গায়েবী মন্দির উল্লেখযোগ্য। ঢাকার ধোপারা মন্দিরে চুল দানের আগের দিন নিজ গৃহে পূজা দিয়ে থাকে। এই পূজা উপলক্ষে ব্রাহ্মণকে নববস্ত্র দান করতে হয়। শিশু এবং মানতকারী নিজেও নববস্ত্র পরিধান করে। তাদের গলায় কাঠের মালা ও লাল কাইতন পরানো হয়। এই পর্বে শিশুর পিতা-মাতা ও মানতকারীর উপোস থাকার রীতি রয়েছে। ঘরের মেঝেতে পাতা পুজার আসনে স্থাপন করা হয় আইপান[৭৮]-সিঁদুর চর্চিত জলপূর্ণ ঘট। পুজার উপচার হিসেবে থাকে ফুলের মালা, আইপান, সিঁদুর, নারিকেল, এক ফানা কলা, সুপারি ও মিষ্টি। সেখানে আইপান-সিঁদুর চর্চিত একটি জলপূর্ণ মাটির লোটাও থাকে। লোটার পানিতে পাঁচটি শিং মাছ ছাড়া হয়।[৭৯] পুজা শেষে মানতকারী পূজার আসনের উপর ধূপধূনা পাঁচবার ঘুরিয়ে প্রণাম করে বলে- 'বাবা তোমরা নামনে যেসা রাখখা থা, ঐ ভার মায় ওতারা'।[৮০] এরপর শিশুর পিতা-মাতা ও মানতকারী উপোস ভাঙ্গে। কীর্তনকারীরা রাতভর শিশুর গৃহে কীর্তন পরিবেশন করে। পরদিন সকালে চুল দানের উদ্দেশ্যে সবাই শিশুকে নিয়ে মন্দিরে যায়। মন্দির প্রাঙ্গণে নাপিত শিশুর মাথা মুন্ডন করলে পরিত্যক্ত চুল কলাপাতায় পেঁচানো হয়। সেটি শিশুর পিতা-মাতা গঙ্গাতে বিসর্জন দিয়ে গঙ্গাকে প্রণাম করে। মন্দিরে শিশুকে স্নান করিয়ে নববস্ত্র পরিধান করানো হয়। পরবর্তীতে মন্দিরের অভ্যন্তরে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানকার ব্রাহ্মণকেও নতুন গেঞ্জি আর ধুতি দান করার রীতি। পূজার উপাচার হিসেবে ব্যবহার করা হয় ছানার মিষ্টি, ফুলের মালা, কাঁচা দুধ আর পাঁচ প্রকারের পাঁচটি আস্তফল। এর সাথে আগরবাতি জ্বালানো হয়। পূজা শেষে শিশুর মা মন্দিরের দেবতাকে প্রণাম করে কাঁচা দুধটুকু শিব লিঙ্গের উপর ঢেলে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার গোয়ালা রমনীরা শিশুর আঠারমাস থেকে পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই মানতে চুল দান করে থাকে। গোয়ালাদের মধ্যে শিশুর মাথা মুন্ডনের পূর্বে মন্দিরে পূজা দেয়ার রীতি। পূজায় মা তার শিশুকে কোলে নিয়ে উপবেশন করে। পাঁচ রকমের পাঁচটি আস্ত ফল দেবতার থানে উৎসর্গ করা হয়। পূজা সমাপ্তির পরপরই মন্দির চত্বরে নাপিত শিশুর মাথা মুন্ডন করে দেয়। শিশুর পরিত্যক্ত চুলের সাথে পান আর কিছু টাকা পয়সা কলাপাতায় মুড়ে মন্দিরের ভেতর কোন গাছের নিচে রেখে দেয়া হয়। গোয়ালাদের মধ্যে যারা ভারতের তারাকেশ্বর মন্দিরে চুল দানের মানত করে, তারা শিশুর চুল কলাপাতায় আবৃত করে সযত্নে মুড়ে রাখে। সময় ও সুযোগমত সেখানে গিয়ে চুল দান করে আসে। শাঁখারীরা একাধিক মন্দিরে চুল দানের মানত করলে পরবর্তী মন্দিরের জন্য শিশুর মাথায় একটু টিকি রেখে দেয়।

জেমস ওয়াইজ বলেছেন-'ঢাকার শহরতলী সুজাতপুরে একটি শিমুল গাছ ও বটগাছ একসঙ্গে বিজড়িত রয়েছে। বাচ্চাদের রোগমুক্তির পর বাপ-মা এখানে শিশুর মাথার চুল অথবা বেণী দান করেন। আবার কেউ কেউ দেন দুধ, মিষ্টি, কলা। মুসলমানরাও বাদ যান না। আর এক গ্রাম দেবতা হল পঞ্চানন্দা। পঞ্চানন্দার নামে উৎসর্গ করা থাকে একটি স্থান বা মন্দির। শ্রুতীয় ব্রাহ্মণরা এর সেবায়েত থাকেন। ঢাকায় এরকম একটি স্থান বা মন্দির আছে কায়েতটুলি মহল্লায়। পাকা চত্বর। তার একদিকে চৌকোনা থাম্বা। থাম্বা থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি লৌহ শলাকা। তার সামনে লাল শান-এর মেঝে। কোনো বাচ্চা ছয় বছরে পড়লে তার মাথার এক গোছা চুল কিংবা চুলের বেণী উৎসর্গ করা হয় এখানে। সঙ্গে দেয়া হয় চাল, মিষ্টি ও কলা। ব্রাহ্মণরা মন্ত্র উচ্চারণ করেন। তারপর ভোজে আপ্যায়ন করা হয় তাদের। এই হল আচার অনুষ্ঠান। এ আচার পালন করা হয় রোগব্যাধি থেকে বাচ্চাদের রক্ষার জন্য। পঞ্চানন্দার আচার পালনের যে বর্ণনা দেয়া হল তার থেকে প্রাচীনকালে মধ্যবঙ্গের আচার ছিল স্বতন্ত্র। তখন দেবীর ভোগ হিসেবে বলিদানের রক্ত দেয়া হত।'[৮১]

শিশুর খাদ্য:

পুরোনো ঢাকার সমাজে সদ্যোজাত শিশুর মুখে মধু দেয়ার প্রথা চালু আছে। সৌখীন ধনী ব্যাক্তিরা স্বর্ণকার দিয়ে অনাগত শিশুর জন্য সোনার বাটি ও চামচ তৈরি করে রাখে। জন্মের পরপরই সোনার বাটিতে মধুমিশ্রিত পানি সোনার চামচ দিয়ে শিশুর মুখে দেয়া হয়। সাধারণত সন্তান ভূমিষ্ঠ লাভের তিনদিন পর থেকে প্রসূতির স্তনে দুধ আসা শুরু করে। এই তিনদিন নবজাতক টিনজাত দুধ পান করে

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। অতীতে এই সময় নবজাতককে তালমিছরির পানি পান করানো হত। কেউ কেউ আবার এর সাথে সানান্য পরিমান গরুর দুধ মিশাত। মুসলমান নারীদের অনেকেই স্তননিশ্রিত প্রারম্ভিক দুধ নদীতে উৎসর্গ করত। এখানে বিশ্বাস যে শিশু পর্যাপ্ত পরিমান দুধ পাবে।[৮২] স্তনে দুধ বৃদ্ধির জন্য প্রসূতি দোয়া-পড়া কালিজিরা খেত। প্রসূতি কালিজিরা-পড়া চিবিয়ে খাওয়ার সময় ছটিঘর ঝাড় দেয়ার রীতি। লাউ, মলা মাছের ঝোল, কালিজিরার ভর্তা, কালিবাউস মাছ মাতৃদুগ্ধ বৃদ্ধিতে সহায়ক বলে ছটিঘর সময়ে প্রসূতিকে এই সকল খাবার খেতে দেয়া হয়। শিশুকে দুধ পান করানোর সময় মা নিজ স্তনে একটু থুকথুকি ছিটিয়ে নেয়। দুধ পান শেষে বামহাত দিয়ে শিশুর মুখ মুছে দেয়। অতীতে দুধ পান কালে মায়েরা স্তন থেকে খানিকটা দুধ শিশুর বুকে ফেলে এর উপর থুকথুকি দিয়ে নিত। এখনও শিশুদের ফিডারে দুধ পান করানোর সময় সামান্য একটু ফেলে দেয়া হয়। ধারণা আছে, যে শিশু কুনযর থেকে রক্ষা পায়। অত্রঅঞ্চলে কোন কোন জায়গায় ছটিঘরে প্রসূতি আগে গোসল করলেও শিশুর গোসল সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধ পান করানো নিষেধ। তবে প্রসূতির গোসলের পূর্বে শিশুকে গোসল করানো হলে মাতৃদুগ্ধ পান করাতে কোন বাঁধা নেই।

শিশুর জৈবিক প্রয়োজন পূরণে পর্যাপ্ত পরিমাণে মাতৃদুগ্ধ দরকার। অনেক সময় মায়ের স্তনে দুধ বৃদ্ধি পেলে দুধে দোষ পায়। সেই দুধ খাওয়ালে শিশুর পায়খানা হয়। নিজের আঁচড়ানো চিরুনি বাটির পানিতে ভিজিয়ে প্রসূতি তার চুল আঁচড়িয়ে পূনর্বার বাটির পানিতে চিরুনি ধৌত করে। তারপর সেই বাটির পানি প্রসূতি তার মাথার উপর দিয়ে পিছন দিকে ছুড়ে ফেলে এবং সেদিকে আর ফিরে তাকাতে হয় না। এ রীতিতে শিশুর পায়খানা আর দুধের দোষ দূর হয়ে যায়।[৮৩] এছাড়াও মায়ের স্তনে ছোটখাট রোগ দেখা দিলে, সেই মায়ের সামান্য পরিমাণ বুকের-দুধ বাঁশ পাতায় নিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করলেই রোগ ভাল হয়ে যায়।[৮৪]

জেমস টেলর জানিয়েছেন- 'হিন্দুদের মধ্যে ছেলেমেয়েদের লালনপালনের ক্ষেত্রে মায়েরাই সর্বদা নিজস্ব সন্তান-সন্ততিদেরকে তাদের নিজেদের স্তন্যদান করে থাকেন, কিন্তু মুসলমান রমনীরা প্রায়শই একাজের জন্য নার্স বা শুশ্রূষাকারী নিযুক্ত করে থাকেন। মুসলমানদের মধ্যে শিশুদেরকে আফিম খাওয়ানোর রীতি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। শিশুর অল্প কয়েকদিন মাত্র বয়স হলেই এটা শুরু হয় এবং সাধারণত চার বছর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আফিম খাওয়ানো অব্যাহত থাকে। এই ধারণার বশবর্তী

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে আফিম খাওয়ানো হয় যে, তা শিশুকে সর্দি বা ঠান্ডা লাগার হাত থেকে রক্ষা করে। এ কারণে পীড়িত অবস্থায় রোগ দমনের জন্য এটা আরো আরো ঘন ঘন সেবন করানো হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ অভ্যাসটা মাঝেমধ্যেই স্থাণীয় নার্সদের দ্বারা ইউরোপীয় পরিবারে প্রবেশ করে।'[৮৫] এমনকি বিভাগ পরবর্তী পাকিস্তান আমলেও শিশুদের আফিম খাইয়ে ঘুম পারানোর কথা ব্যাপকভাবে শোনা যায়। ধারণা করা হয় স্বাধীনতা উত্তরকালে ধীরে ধীরে আফিমের প্রচলন হ্রাস পেয়ে বিলুপ্ত হয়ে পরে।

শিশুর যত্ন ও পরিচর্যাঃ

অতীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই সদ্যোজাত শিশুকে কুসুম গরম পানিতে গোসল করানো হত। ছটিঘরে বেশ কয়েক দিন নবজাতককে পরিধান করানো হত দাদি-নানির পরিধেয় পুরাতন শাড়ির তৈরি খেলকা[৮৬]। শিশুর মাথা গোলাকার রাখতে নরম কাপড়ের বিরায় শিশুকে শোয়ানো হত। ইদানিং অনেকেই নবজাতক শিশুকে সরিষা বীজের বালিশে ঘুম পারায়। আগে কেউ কেউ একপ্রস্থ কাপড় লম্বালম্বিভাবে পেঁচিয়ে শিশুর ঘাড়ের নিচে দিয়ে বালিশ ছাড়া শিশুকে শোয়াত যেন শিশুর ঘাড় লম্বা হয়। স্থানীয়রা লম্বা ঘাড়কে বলে 'হরিণ-গলা'। শিশুর মুখে যাতে ফাপা না ধরে সেজন্য নরম কাপড়ে সরিষার তেল মেখে নিয়মিত শিশুর জিভ ও মাড়ি পরিষ্কার করা হয়। প্রত্যেহ সকালে সিক্তকাপড়ে শিশুর গা মুছে ফেলা হয়। অতীতে গা মুছে দেয়ার পর শিশুর শরীরে সরিষার তেল মালিশ করা হত। শিশুকে আইলার[৮৭] আগুনের তাপে সেকা হত সকাল-সন্ধ্যা। আইলার আগুনের তাপে বৃদ্ধাঙ্গুল ও তর্জনি দিয়ে নবজাতকের নাকের দু'পাশে সেক দেয়া হত। এভাবে সেকলে নাকি নবজাতকের নাক চোখা বা খাড়া হয়। শিশুর চোখের চারপাশ যাতে ঝুলে না পরে সেজন্য এই জায়গাগুলিতে সেক দেয়া হত। উঁচু মাড়ির অধিকারীরা পুরোনো ঢাকার স্থানীয়দের কাছে 'দাউথা' নামে অভিহিত। এই দাউথা রোধে ছটিঘরে নবজাতকের ঠোঁটের উপর বৃদ্ধাঙ্গুলে চাপ দিয়ে সেক দেয়া হত। নবজাতকের সময়মত কথা বলা ও কথার জড়তা না থাকার জন্য ছটিঘরে দাদি নানিরা 'তালু উঠাতো'। এক্ষেত্রে তাদের বৃদ্ধাঙ্গুলে বাসি মুখের থু থু ছিটিয়ে সেটি নবজাতকের মুখগহবরে ঢুকিয়ে দিয়ে তালু ও জিভে চাপ দিত। ফলে পরবর্তীতে নবজাতকের মুখে জড়তা থাকে না এবং দ্রুত কথা বলতে শেখে।[৮৮]

আমেতুল খালেক বেগম লিখেছেন- 'ধনী পরিবারে বাচ্চাদের লালন পালন করার জন্য আলাদাভাবে কাজের মহিলা রাখা হত। বাচ্চাদের রাখার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আয়া অথবা এ পেশায় বংশানুক্রমে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োজিত কর্মীদেরকে ঢাকায় খেলাই বলা হত। এরা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুচতুর এবং মার্জিত ভদ্র আচরণের হত। নবাব বাড়িসহ বনেদি পরিবারগুলোতে দ্সী-বাঁদী যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তাদের দিয়ে বাচ্চা লালন-পালন করানো হত না।.. পেশাগত আয়া বা খেলাইদেরকে বাচ্চার কাজে রাখা হত। এদের যথেষ্ট সম্মান ও সম্মানী দিয়ে রাখতে হত। এদের সুনাম ছিল যে এরা বাচ্চাদেরকে সহবৎ শিখাতে পাদর্শী এবং এদের কাছে বাচ্চারা কান্নাকাটি করত না।..এরা সাধারণত: নেপালী-বিহারী বা আসামী অথবা শিলং এবং উত্তর ভারতের দরিদ্র অধিবাসী ছিল। জীবিকার অন্বেষণে ঢাকায় এসেছিল। পাকিস্তান হবার পর এসব খেলাইদের কথা আর শুনতে পাওয়া যায় নাই।[৮৯]

শিশুর চোখে কাজল:

অতীতে পুরোনো ঢাকার মুসলমান নারীদের অনেকেই তিনদিন বয়সের নবজাতক শিশুর চোখে কাজল দেওয়া শুরু করত। সাধারণত নানী দাদীরাই শিশুর জন্য কাজল তৈরি করত। কাজল তৈরি করতে পুরাতন ও নরম কাপড়ের সলিতা পাকানো হত। সরিষার তেলের ছোটপাত্রে জলন্ত সলিতার শিখার ধোঁয়া নয়নতারা[৯০] তোলা হত। ধোঁয়া তোলা শেষে জমাকৃত কালি পোড়া তেলে মিশিয়ে আগুনে পুড়িয়ে কাজল তৈরি করা হত। এরপর কাজল পাক করা হত পানিছিটা দিয়ে। এখানে উল্লেখ্য যে, পানিছিটায় কাজল পাক না করা হলে শিশুর চোখে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। এরমধ্যে ঘনঘন চোখ উঠা, চোখ দিয়ে পানি পরা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গোয়ালাদের মধ্যে ছটিঘরে নবজাতককে কাজল পরানোর নিয়ম নেই। বারদিনের ছটি উঠে গেলে তখন থেকেই শিশুকে কাজল পরানো হয়ে থাকে। ছয় ষষ্ঠীর রাত্রে সরিষা তেলের প্রদীপের ধোয়ায় সাহা নারীরা কলাপাতার ডোগায় নবজাতকের জন্য কাজল তুলে।

শিশুর রোগ ব্যাধি ও তার নিরাময়:

অতীতে শ্লেষ্মা রোধে উট বা রাজহাঁসের কণ্ঠনালির শুকনো টুকরো কালো কায়তুনে শিশুর গলায় পরিধান করানো হত। ধোবানীরা অবশ্য শ্লেষ্মা প্রতিরোধে নবজাতকের গায়ে সরিষার তেল মালিশ করত। তারা সরিষার তেলের সাথে জাফরান আর মিষ্টিলাড্ডু মিশিয়ে নিত। হরিণের শিং শীলপাটায় ঘষে সেটি মাতৃদুগ্ধের সাথে মিশিয়ে শ্লেষ্মা পীড়িত শিশুকে সেবন করানো হত।[৯১] এছাড়া অনেকে সরিষার তেল আর মধু অথবা মায়ের বুকের দুধ আর মধু একত্রে মিশিয়ে শ্লেষ্মা পীড়িত শিশুকে সেবন করাত। আগে জ্বরে আক্রান্ত শিশুকে ঔষধ খাওয়ানোর প্রচলন ছিল না। জ্বরের মাত্রা কমাতে শিশুর মাথার তালুতে 'দুধের

Dhaka University Institutional Repository

পট্টি' দেয়া হত। একপ্রস্থ নরম কাপড় মায়ের বুকের দুধে ভিজিয়ে রুগ্ন শিশুর মাথার তালুতে দেওয়া হত। জ্বরের তাপে দুধের পট্টি গরম হলে কিংবা শুকিয়ে গেলে পুণরায় বুকের দুধে ভিজিয়ে নেয়া হত। এর ফলে শিশুর জ্বর নেমে যেত।[৯২]

ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুর মলমূত্র পানিতে ধুয়ে ফেলার পর সেই স্থান যদি কোন শিশুর মার পদচারনা হয় এবং ঐ দিনটি শনি বা মঙ্গলবার হয় তাহলে তার শিশুর ডায়রিয়ায় আক্রান্তের সম্ভাবনার বিশ্বাস প্রচলিত। ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুকে চিকিৎসার জন্য ফকিরবাবার কাছে নেয়া হত। ফকিরবাবা পায়খানার জরি দিলে শিশু সুস্থ্য হয়ে উঠত। ছটিঘরে নবজাতকের পেট খারাপ হলে তার ব্যবহৃত নেংটি, কাঁথা বা জামায় পেট ও কোমরে সেক দিলে পায়খানা কমে যায়। এ এক ধরণের টোটকা। এক্ষেত্রে পীড়িত শিশুর ব্যবহৃত জামা কাপড়েই সেকার নিয়ম। অন্যথায় এই টোটকা কার্যকর হয় না।

নবজাতক শিশুর গলার দু'পাশের হাড় (collar bone) সরে যাওয়াকে হাসলি বলা হয়। ছটিঘরে নবজাতক শিশুর হাসলি উঠলে, নকজাতক ব্যথায় ক্রমাগত কাঁদতে থাকে এমনকি দুধপানও করতে চায় না। তখনই হাসলি নামাতে অভিজ্ঞ নারীদের ডাকা হত। তারা পরপর তিনদিন এসে দোয়াদরূদ পড়ে মালিশ করে শিশুর হাসলি নামাত।[৯৩]

মাতৃদুগ্ধ পানকারী শিশুর মা অন্তঃসত্ত্বা হলে, সে শিশুর হাইরা বা আইরা লাগে। হাইরা লাগলে শিশু পাতলা পায়খানা, বমি ও জ্বরে ভোগে। শিশু দুধপানও করতে চায় না। সব সময় কান্নাকাটি করে। ফলে শিশুর স্বাস্থ্যহানী ঘটে কোমর শুকিয়ে পেট বড় হয়ে উঠে। অন্তঃসত্ত্বা মায়ের প্রসবের পর সেই শিশুর হাইরার দোষ কেটে যায়। এছাড়া হাইরা প্রতিরোধে রিঠা বীচি বা আরব দেশের তেতুলের বীচিতে আংটা লাগিয়ে কালো কাইতনে বেঁধে তা শিশুর কোমরে পরিয়ে দিত।[৯৪]

জন্মের অব্যবহিত পরে শিশু নানান ঝুঁকির মধ্যে অবস্থান করে। বিভিন্ন ধরণের মিথও এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ঃ চোরা আর চুন্নী স্বামী-স্ত্রী শিশুখাদক। এরা ছটিঘরের বাইরে ঘোরাঘুরি করে। ছটিঘরের বাইরে থেকে তারা নবজাতককে নযর দেয় এবং অপেক্ষায় থাকে কখন ছটিঘর লোকশূণ্য কিংবা অন্ধকার হবে। সুযোগ পেলেই তারা নবজাতককে চুরি করার উদ্দেশ্যে ছটিঘরে ঢুকে পরে। নবজাতক ছেলে হলে

চোরা নিজেই নবজাতকের রূপ ধারণ করে আসল নবজাতককে চুন্নীর কাছে দিয়ে দেয়। অন্যদিকে, নবজাতক কন্যা হলে চুন্নী চোরার কাছে নবজাতককে দিয়ে নিজেই সেই শিশুর মূর্তি ধারণ করে। যখন চোরা বা চুন্নির একজন নবজাতককে নিয়ে পালায় তখন নদী পাড় হওয়ার পূর্বে নিজের সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এই অপেক্ষার সময়ের মধ্যে যদি শিশুর পরিবার বুঝে উঠতে পারে যে তাদের শিশুকে চোরা ধরেছে, তৎক্ষনাত তারা সত্যগুনীনের[৯৫] সরানাপন্ন হয়। সত্যগুনীন তার কার্যক্রমের প্রক্রিয়ায় চোরাকে শিশু ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করে। পক্ষান্তরে অপেক্ষার সময়ের মধ্যে শিশুরূপধারী চোরা বা চুন্নি সেই নদীর পাড়ে সঙ্গীর কাছে ফিরে আসতে সক্ষম হয়, তাহলে উভয়ে নবজাতককে নিয়ে সেই নদী পাড় হয়ে নিরুদ্দেশে চলে যায়। ফলে চিরতরের জন্য শিশুকে হারায় পরিবার। শিশুকে এই চোরা ধরার লক্ষণ হল, শিশু ঠিকমত খায় না। অনবরত কান্নাকাটি করে। শিশুর গায়ে জ্বর আসে। মাথার তালু দেবে যায়। শিশু একেক সময় একেক বর্ণ (লাল, নীল, হলুদ, কালো ও ছাই) ধারণ করে।[৯৬] অনেক সময় চোরা ছাড়াতে শিশুকে ফকিরবাবার কাছেও নেয়া হয়। এসকল অবস্থায় চোরা থেকে নবজাতককে রক্ষার উদ্দেশ্যে পরিবার যথাসময়ে উল্লেখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ধোবানীরা ভোর রাতে নবজাতকের শরীরে সরিষার তেল মালিশ করে থাকে। পূর্বকালে মুসলমান বাড়িতে ছটিঘরের চালে বা ছাদে কাঁটাগোড়ালি গাছ ও কোরবানির গরুর শুকনো হাড় রাখা হত। বর্তমানে আধুনিক বিদ্যুৎ বাতির কারণে চোরা বা চুন্নি ছটিঘরে প্রবেশ করতে পারে না বলেই ধারণা।

এছাড়া অশরীরী আত্মা কিংবা কোন ব্যাক্তি বিশেষের অশুভ দৃষ্টি শিশুর উপর আপতিত হলে শিশু ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে পরে। এইরূপ অবস্থাকে ঢাকার আদিবাসীরা 'নযর লাগা' বলে থাকে। শিশুদের উপর কুনযর পরলে সাত চালের বন দিয়ে তেপথার মধ্যে সন্ধ্যার সময় আগুন জ্বালিয়ে সেকে আনলে কুনযর দূর হয়ে যায়।[৯৭] শিশুদের কুনযর থেকে রক্ষা করতে কপালের একপাশে, বাম কানের পিছনে আর বাম পায়ের তলায় কাজলের কালো ফোঁটা দেয়া হয়। পাকিস্তান আমলে মুসলমান মেয়েরা শিশুর কপালের একপাশে চাঁনতারা অংকন করত। টোকাটাকি জ্বালিয়েও শিশুকে নযরমুক্ত করা হয়। টোকাটাকি হচ্ছে এক ধরণের লোকাচার যা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে শিশু কুনযর থেকে রক্ষা পায়। শিশুর নাভিদেশে সরিষার তেল মেখে এর চারপাশে একটি আস্ত নিখুঁত পান, দু'টো শুকনা মরিচ আর এককোয়া রসুন ঘুরিয়ে বলা হয়- 'যে আমার ছাওরে নযর দিছে, হের চোখ কানা হ, কানা হ।'[৯৮] এরপর পানটি শুকনা মরিচ ও রসুনে মুড়ে নিক্ষেপ করা হয় চুলার আগুনে। পান-মরিচ আগুনে পোড়ার সময় শব্দ হলে ধারণা করা হয় শিশুর কড়া

Dhaka University Institutional Repository

নযর লেগেছিল। ধোবানীরা নযর নামাতে কিছুটা সরিষা দানা, শুকনা মরিচ, পেয়াজ রসুনের খোসা আর সাপির টুকরো একত্র করে রুগ্ন শিশুর উপর তিনবার ঘুরিয়ে সেটি আগুনে পুড়িয়ে টোকাটাকি জ্বালানো সম্পন্ন করে। আগুনে নিক্ষেপকালে বলা হয়- 'চিরিয়া-চোঙ্গাল, গায়ে গরু, মাক্ষি, চুটি, ভূত-পেরেত, কাউয়া-কোয়েল (এর সাথে আত্মীয় স্বজনদের নামও যোগ হয়) এনোকা নাজার গুজার যেসা নাই লাগে। সাবকা নাযার কানা হো।'[৯৯]

জেমস ওয়াইজের বর্ণনায় জানা যায়, ছটিঘরে অশুভ আত্মাকে মুসলমানরা বলত উম্ম-উল-সিবিয়ান, অর্থ নবজাতকের জননী। মুসলমানদের কাছে ভয়ের কারণ। তারা মনে করত এই অশুভ শক্তির প্রভাবে প্রসূতির খিঁচুনি হয়। খিঁচুনি হলেই অবধারিতভাবেই ডাক পড়ত ওজার। রোগীর রোগ নিরাময় হলে মনে করা হত ওঝার জন্য সুস্থ্য হয়েছে রোগী। বাচ্চার আঠার মাস বয়স না হওয়া পর্যন্ত এই অশুভ শক্তির প্রভাবের বাইরে রাখতে হত বাচ্চাকে। মনে করা হত, এই সময়ের পর বাচ্চার উপর অশুভ শক্তির প্রভাব আর পড়ে না।[১০০] তিনি আরো জানান, নবজাতক শিশুর খিঁচুনি উঠলে ঝাঁড় ফুঁক করতে নাপিতদের ডাকত অনেকেই। নাপিত নিমের পাতা দিয়ে শিশুর গা মুছে দিত। আর সেইসঙ্গে চলে ঝাঁড়ফুঁক।[১০১]

শিশুরা ভয় পেলে দাওয়ের আগায় লবন নিয়ে শিশুকে ঘরের দরজার সামনে দাড় করিয়ে একজন জিজ্ঞেস করে, 'কি কর?' প্রত্যুত্তরে বলা হয়-'ডরের লবন খাওয়াই।' এই বলে শিশুকে লবন খাওয়ানো হয়।[১০২]

ঘুম থেকে উঠার পর যে সকল শিশুদের চোখে ময়লা থাকে তাদের চোখকে বলা হয় গোবইরা চোখ। শিশুর যাতে গোবইরা চোখ না হয়, সেজন্য জন্মের পর সাত দিনের দিন নবজাতককে দাঁড় করানো হত বালির উপর। এ কারণে ঋষি মেয়েরা ছটিঘরে গোবর স্পর্শ করে না। আবার পুরোনো ঢাকার কোন কোন স্থানে শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে হাঁসের পা ধোয়া পানি দিয়ে শিশুর পদদ্বয় ধৌত করা হত। এতে করে শিশুর খুজলি পাঁচড়া হয় না। এছাড়া আগে ছটিঘরের আশেপাশে বাঁশ পুড়ানো নিষেধ ছিল। প্রচলিত বিশ্বাস, ছটিঘরের আশেপাশে বাঁশ পুড়ালে শিশু ঘনঘন বায়ু নিঃসরণ করে। শিশুর ঘামে যাতে দুর্গন্ধ না হয়, সেজন্য ছটিঘরে প্রসূতিকে কাঁচা পেয়াজ খেতে দেয়া হত না। প্রসূতির মাথায় বৃষ্টির পানি পরলে

নবজাতক শিশুর মৃগী রোগ হয় বলে মনে করা হয়। এমনকি নবজাতকের কাঁথা কাপড়েও যাতে বৃষ্টির পানি না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখা হত।

ছটিঘরে প্রসূতির খাদ্য:

ঢাকার গোয়ালারা সন্তান প্রসবের পর প্রসূতিকে প্রথম দিন দুধ সাগু খেতে দেয়। পরদিন থেকে প্রসূতি একবেলা ভাত আর দু'বেলা রুটি খায়। অতীতে পুরোনো ঢাকার কোন কোন জায়গায় প্রসূতি মাকে প্রসবের পর তিনদিন পর্যন্ত রুটি আর রং চা খেতে দিত। অবস্থাপন্ন পরিবারে প্রসূতিকে দিত বাচ্চা মুরগির স্যুপ, দুধ, হরলিকস, বাকরখানি, পাউরুটি, মাখন, জেলি, রোজ বিস্কিট, চা ইত্যাদি। জেমস ওয়াইজ বলেছেন, সন্তান জন্মের পর তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে প্রসূতি মাকে ডাল (মসুর) ও ভাত খেতে দেয়া হত।[১০৩] সাধারণত ছটিঘরে প্রসূতিকে ভাত জাতীয় খাবার কমই খেতে দেয়া হয়। মূলতঃ দুপুর বেলাতেই প্রসূতি ভাত খেয়ে থাকে। গরম ভাতের সাথে থাকে কালিজিরা ভর্তা, সরিষার তেল, আলু ভর্তা, সরিষা ভর্তা, ডাল ভর্তা, বেগুন ভর্তা[১০৪]। মোমেন চৌধুরীর উল্লেখিত বর্ণনা অনুসারে- 'ঢাকার আদিবাসী সমাজে প্রসূতিকে প্রথম তিনদিন ভাত দেয় না, রুটি দেয়। তিনদিন পরে কাচকলা, কালো জিরার ভর্তা এবং মুসুরীর ডাল দিয়ে ভাত খায়। এইভাবে ছয়দিন একবেলা ভাত খায়। ছয়দিন অর্থাৎ 'ছটি'র পরে প্রসূতি দুই বেলা ভাত খায়- সকাল দশটায় এবং বিকাল চারটায়। এইভাবে বারো দিন চলে। এই সময় তার থালা-গেলাস আলাদা করে রাখতে হয়।'[১০৫] নবজাতকের পেটের সুস্থ্যতার জন্য আগে প্রসূতি প্রসবের পর ছয়দিন পর্যন্ত মাছ মাংস আহার পরিহার করত। সাতদিনের দিন প্রসূতিকে অনেকেই জিওল মাছ রান্না করে খাওয়াত। প্রচলিত আছে এ মাছ খাওয়ালে প্রসূতির শিশু 'জিতা থাকে' অর্থাৎ আয়ু ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। এসময় প্রসূতি মাছের মাথা ও মুরগির গর্দন খেলে নবজাতকের ঘাড়ও শক্ত হয় বলে লোকজ বিশ্বাস রয়েছে।[১০৬] মাছের মাথা ও মুরগির গর্দনের সাথে অনেকেই প্রসূতিকে একটি আস্ত মুরগি রোস্ট করে খাওয়াত। সাতদিন পর থেকে প্রসূতি স্বাভাবিক খাবার খেলেও নিজের এবং শিশুর সুস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে আঠারমাস পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের খাবার ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকত। শিশুর হাঁপানি রোধে এই সময়কালে শিশুর মা হাঁসের মাংস খেত না। গরুর মাংস খেলেও তা ছিল পরিমানে কম। যেদিন গরুর মাংস অথবা চিংড়ি মাছ খেত সেদিন স্বামীর সাথে সহবাস করত না। মনে করা হত, গরুর মাংস বা চিংড়ি মাছ খেয়ে স্বামী সহবাস করলে সূতিকা রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। প্রসূতির তরকারিতে নামেমাত্র ঝাল আর কম হলুদ দিয়ে রান্না করা হয়। প্রসূতি ঝাল খেলে বুকের দুধ খেয়ে শিশুর পেট

Dhaka University Institutional Repository

কামড়ায় ও জ্বালাপোড়া করে বলে মনে করা হয়। এছাড়া প্রসূতির তরকারিতে বেশি হলুদ থাকলে শিশু মল হলুদ বর্ণের হয়। ফলে শিশুর কাঁথা ধুলেও মলের হলুদদাগ উঠে না। অতীতে ছটিঘরে প্রসূতি আগুনে দাগ দেয়া পানি পান করত। এক্ষেত্রে আগুনে উতপ্ত লাল বর্ণের একখন্ড লোহা কলসের পানিতে ঢুকিয়ে পানি দাগ দেয়া হত।[১০৭] কারো কারো ধারণা, প্রসূতি পানি অধিক পান করলে নবজাতক পেটের পীড়ায় ভোগে। সেজন্য ছটিঘরে প্রসূতিকে অল্প পরিমান পানি পান করতে দেয়া হত। শিশুর ঘামের দুর্গন্ধ ছাড়াতে শিশুর মা ছটিঘরে কাঁচা পেয়াজ খেত না। ছটিঘরে নবজাতককে কোলে নিয়ে প্রসূতির আহার্য গ্রহণ করার নিয়ম। অনেকক্ষেত্রে প্রসূতি খাদ্য গ্রহণকালে শিশু বিছানায় ঘুমিয়ে থাকলে তাকে তুলে কোলে নেয়া হত। ফলে শিশু 'সবুরদার' অর্থাৎ ধের্য্যশীল হবে, ক্ষুধা লাগলে জেদ বা রাগ করবে না, খাম খাম (খাই খাই ভাব) করবে না বলে মনে করা হত।

ছটিঘরে প্রসূতির পথ্য:

অতীতে প্রসবের পরপরই প্রসূতিকে নাহার পেটে (খালি পেটে) কালিজিরা ও আদার রস আখের গুড়ের সাথে মিশিয়ে আগুনে জ্বাল দিয়ে খাওয়ানো হত। এর ফলে প্রসূতির প্রসব জনিত ব্যাথা বেদনার উপশম ঘটে। পেটের জমাট বাঁধা রজোরক্ত নিঃসরণের জন্য প্রসূতি বরফ, শাঁখারী মেয়েরা গরম পানি খেত। যোইন বা আজোয়ান গরম পানিতে ফুটিয়ে তা ঠান্ডা করে প্রসূতিকে খেতে দেয়া হত চল্লিশদিন। কোথাও কোথাও আবার দুই/তিন মাস প্রসূতি পানের সাথে বোয়াজ, যোইন বা আজোয়ান মিশিয়ে খেত। যার ফলে প্রসূতির শরীরের পানি শুকায়, শিশু শ্লেষ্মা ও পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয় না। প্রসূতিকে তিনদিন অথবা আরো অধিকদিন কাঁচা হলুদের কারা[১০৮] তৈরি করে খাওয়ানো হত। জেমস ওয়াইজ বলেছেন, বাচ্চা হওয়ার পর দুইদিন পর্যন্ত মাকে খেতে দেয়া হত হলুদ, গুড় ও যোয়ান।[১০৯] সন্তান প্রসবের পর সাতদিনের দিন কেউ কেউ কালিজিরা বাটার সাথে আখের গুড় মিশিয়ে প্রসূতিকে খেতে দিত। প্রসূতি এটা খেলে শিশুর গায়ের রং ফর্সা হয় বলে মনে করা হয়। কয়েক রকম গাছের ছাল ও শেকড় আড়াই সের পানিতে সেদ্ধ করে আড়াই পোয়া পরিমান করা হয়। সেটি প্রতিদিন প্রসূতিকে খেতে দেয়া হত আধা কাপ করে। এটি সূতিকা রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। সূতিকা রোগ হল প্রসবোত্তর কালীন অসুখ। সূতিকা রোগে আক্রান্ত নারীর স্বাস্থ্যহানী ঘটে। মাথা ঘোরা, খাবারে অরুচি, বমি ভাব, বদহজম, পেট ফেঁপে থাকা সূতিকা রোগের উপসর্গ। অতীতে সূতিকা রোগিণী টোটকার মাধ্যমে তার রোগ অন্য নারীর দেহে স্থানান্তর করে নিজে রোগমুক্ত হত। এক্ষেত্রে শনি বা মঙ্গলবারে এলোকেশে কিছুটা দূরে

Dhaka University Institutional Repository

দাড়িয়ে থাকা কোন নারীর চেখে চোখ রেখে অগোচরে তাকে বামহাতে সালাম দিয়ে দ্রুত সেই স্থান ত্যাগ করে। পিছন ফিরেও তাকায় না। কেউ কেউ অবশ্য এলোকেশে থাকা নারীকে পিছন দিক থেকে সালাম দিয়ে থাকে। সে যদি বুঝতে পেরে বাম হাতে তার সালামের উত্তর দেয় তবে এই টোটকা কার্যকর হয় না। প্রসূতি সূতিকা রোগ থেকে রক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে গর্ভাবস্থা থেকে প্রসবের পর আঠারমাস পর্যন্ত জরি ধারণ করত। এই জরি সোনা কিংবা রূপার তাবিজে ভরে গর্ভবতীর মাথার খানিকটা চুলে বেণী গেঁথে এর মধ্যে স্থাপন করা হত। এখনো অনেকেই সূতিকা রোগের জন্য গলায় জরি পরিধান করে। এছাড়া প্রসূতিকে চল্লিশদিনের ছটি উঠার পর ভেষজ ঔষধ 'পোলাতি দাওয়াই' পানে বা সবরি কলায় ভরে সেবন করানো হয়।[১১০] কোন কোন জায়গায় সূর্য্য উদয়ের পূর্বে স্নান সেরে খালি পেটে পানি দিয়ে গিলে এই ভেষজ বড়ি সেবন করার নিয়ম। অতীতে স্নান সেরে ভেজা কাপড় ও চুলে ঘরের উলতির নিচে দাঁড়িয়ে প্রসূতি অঞ্জলি ভরে চুলের পানি নিত। এই পানিতেই বড়িগুলি সেবন করত।

জেমস ওয়াইজ লিখেছেন, 'মরা বাচ্চা হলে মাকে তামার পয়সা-চোবানো বাঁশের পাতার রস খেতে দেওয়া হত। মনে করা হত, যে বিষের দরুণ প্রসূতি মরা-বাচ্চার জন্ম হয়েছে এতে তার উপশম হবে। পর পর কয়েকটি মরা বাচ্চার জন্ম দিলে, লোকে মনে করত একই বচ্চা বার বার আসছে। বাচ্চার উপর অশুভ শক্তি ভর করেছে মনে করে তা দূর করার জন্য বাচ্চার নাক অথবা কান কেটে নিয়ে নবজাতকের লাশ গোবরের স্তুপের উপর ফেলে রাখা হত।

দাইরা আত্মবিশ্বাসের সাথে সব রোগেরই চিকিৎসা করে। কিন্তু বেশিরভাগই তেমন কার্যকর নয়। আবার কোনো কোনোটা বেশ পরিক্ষিত। এদের ধন্বন্তরীর নাম হল মস্তুরি বা বাত্তিসা, প্রায় বত্রিশ রকম লতাপাতা দিয়ে বানায় ওষুধ। এতে চন্দন, পাথুরে লবন এ রকম আরও অনেক কিছু থাকে। যে কোনো স্ত্রীরোগে চম্পার তেল দিয়ে ন্যাকড়া ভিজিয়ে লাগানো হয়।'[১১১]

ছটিঘরে প্রসূতির যত্নঃ

অতীতে প্রসবের পরপরই ছটিঘরে সুষম গরম পানিতে প্রসূতির কোমর পর্যন্ত ধুইয়ে দেয়া হত। পেটে জমাটবাঁধা রজোঃরক্ত নিঃসরণের জন্য তিনদিন পর্যন্ত প্রসূতির পেট ও কোমরে গরম পানির সেক দেয়া হয়। চল্লিশ দিন পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা (ফযর ও মাগরিবের আযানের পর) দু'বার আইলার আগুনের তাপে

Dhaka University Institutional Repository

প্রসূতির পেট ও কোমর সেকা হয়ে থাকে। সেক দেয়ার পূর্বে প্রসূতির সমস্ত শরীরে সরিষার তেল মেখে ভালমত মালিশ করা হয়। প্রসূতি দুই পায়ের মাঝে আইলা রেখে দাড়িয়ে সেক নেয়। অতীতে চুলার আগুনের তাপে গরম করা ইটের উপর বসে প্রসূতি সেক নিত।

ছটিঘর:

একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রসূতি তার নবজাতক শিশুকে নিয়ে যে ঘরে জন্মাশৌচ পালন করে, একে ঢাকার আদিবাসীরা বলে 'ছটিঘর', 'ছট্টিঘর' বা 'ছাট্টিঘার'। ঢাকার সাহা'দের কাছে এটি অবশ্য 'আউঝাঘর' হিসেবে অভিহিত। পূর্বে অত্রঅঞ্চলে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে একটি আলাদা ঘর ছিল। এ ঘরটি মূলত: চালের গুদাম বা ষ্টোররুম হিসেবে ব্যবহৃত হত। বাড়ির বউ ঝিদের প্রসব নিকটবর্তী সময়ে সে ঘরটি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নেয়া হত। জেমস ওয়াইজ বর্ণনায়- 'হিন্দু কিংবা মুসলমান কোনো মহিলার প্রসব আসন্ন হলে তাকে একটি আলাদা ঘরে রাখা হয়। শুধু দাই ও একজন পরিচারিকাই সেখানে যেতে পারেন। সমাজের উচ্চ ও নিচু উভয় শ্রেণীর লোকরাই এই ঘরকে অপবিত্র মনে করেন। এই ঘরকে বলা হয় অশৌচ-ঘর।'[১১২]

জেমস ওয়াইজের বর্ণনা করেন- 'ছটির ষষ্ঠ দিনে নাপিত আর ধোপার ডাক পড়ত। বাচ্চার চুল কামিয়ে দিত, নখ কেটে দিত নাপিত। আর ছটিঘরের সব কাপড় নিয়ে যেত ধোপা। এই বিশেষ কাজটির জন্য ধোপাকে বিবেচনা করা হত অশৌচ শ্রেণীর লোক হিসেবে। একুশ দিনের দিন আবার নাপিত আর ধোপা এসে একই কাজের পুণরাবৃত্তি করত।'[১১৩]

সন্তান প্রসবের পর অশুভ শক্তির অনিষ্ট প্রতিরোধে ছটিঘরে বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শিশুর নিরাপদ ভবিষ্যত কামনাই এর উদ্দেশ্য। ছটিঘরের প্রবেশ পথে লোহার সাবল, পরিত্যক্ত ঝাড়ু কেউ কেউ আবার কচুর ডগা আর চামড়ার জুতাও রেখে থাকে। ধোপা নারীরা লোহা, শীসকা ডালি (পাতাবিহীন কাঁটাযুক্ত গাছ) ও লুটকি রাখে। নবজাতকের শিয়রে ঘোড়ার নাল (ক্ষুর)[১১৪], জেলেদের জালের কাঁটা ও হাতির দাঁত রাখা হয়। শাঁখারী মেয়েরা অবশ্য শিশুর শিয়রে ধূপের পোটলা, লোহার কাজলতারা আর 'রাম' নাম লিখিত কাগজ রাখে। শিশুর বিছানার নীচে লোহার পেরেক এবং মামা'র ব্যবহৃত লুঙ্গি স্থাপন করা হয়। ঋষি আর মুসলমান মেয়েরা পরিত্যক্ত জুতার খানিকটা চামড়া ভালমত ধুয়ে নবজাতকের

Dhaka University Institutional Repository

বিছানা অথবা বালিশের নীচে রেখে দেয়। প্রচলিত বিশ্বাস, ভূত-প্রেত লোহাকে ভয় পায়। তারা চামড়ার গন্ধ সহ্য করতে পারে না। মামা'র লুঙ্গি শিশুকে নানা ধরণের বিপদ বালাই থেকে রক্ষা করে, এক্ষেত্রে একটি প্রবাদও প্রচলন আছে যে, ' মামু ভাইগ্না যেহানে আপদ নাই সেইহানে'।[১১৫] ছটিঘরে চব্বিশ ঘন্টা আইলার আগুন জ্বালানো থাকে। সন্ধ্যাকালে আইলার আগুনে সরিষাপড়া ও ধূপপড়া নিক্ষেপ করা হয়। সাহা'দের মধ্যে সন্ধ্যার পর ছটিঘর খোলা নিষেধ। সেজন্য সন্ধ্যার পূর্বেই প্রসূতির রাতের খাবার আর পথ্য ছটিঘরে নিয়ে রাখা হয়। অধিকাংশ লোক ভরদুপুর, সন্ধ্যাকাল আর গভীররাতে প্রসূতিকে ঘরের বাইরে বের হতে দেয় না। পূর্বে কোন কোন স্থানে এই রীতিতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রসূতিকে ঘরের বাইরে বের হওয়া নিষেধ ছিল। তারা ছটিঘরের সব ধরণের ছিদ্র বন্ধ করে দিত। প্রসূতিকে ছটিঘরের ভেতরেই বড় গামলায় বসিয়ে স্নান করাত। মুসলমান নারীদের কারো মাঝে রবিবার আর বুধবার 'ভারীদিন' হিসাবে পরিচিত। ভারীদিনে প্রসূতি ও নবজাতক গোসল করলে ঠান্ডা লাগার আশংকা থাকে। এই কারণে ছটিঘরে উক্ত দিনগুলিতে মা-শিশুকে গোসল করতে দেয়া হত না। ছটিঘরে বিশেষ ব্যাক্তি ব্যতিত অন্য কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। পরবর্তীকালে ছটিঘরে পরিবারের লোকদের গমনাগমন বৃদ্ধি পায়। ছটিঘরে প্রবেশকালে আইলার আগুনের তাপে প্রথমে হাত ও কান সেকে, সেই তাপে পরিধেয় কাপড়ও ঝেড়ে নিতে হত। এরপর আইলার আগুনের উপর দিয়ে টপকে ছটিঘরে প্রবেশ করতে হত। অত্রঅঞ্চলের মুসলমানরা নাভি পরা ও মাথা মুন্ডন না করা পর্যন্ত নবজাতককে নাপাক মনে করত। ফলে অনেকেই তখন শিশুকে কোলে নিত না। যারা নবজাতককে কোলে নিত, তারা ছটিঘর থেকে বের হয়ে গোসল নিয়ে পবিত্রতা অর্জন করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছটিঘরে মা-শিশু পুরাতন ব্যবহৃত বস্ত্র আর জীর্ণ কাঁথা-বালিশ ব্যবহার করে থাকে। ছটি উঠার পর এসব ফেলে দেয়ার নিয়ম। অতীতে কোথাও কোথাও প্রসূতির মা আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে ব্যবহৃত জীর্ণ কাপড়, পুরাতন চাদর ছটিঘরের জন্য নিয়ে আসত। ছটিঘরে প্রসূতিকে ছালার বিরায় বসতে দেয়া হত। প্রসূতির পেটে বাতাস প্রবেশ করে যেন পেট বড় না হয়ে যায়, সেজন্য প্রসূতিকে পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসতে এমনকি পা চিপে হাটতে হত।

প্রসূতি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে ঘরের বাইরে বের হওয়ার কালে মাথার চুল বাঁধে। শাড়ির আঁচল বুকের সাথে আঁটসাঁট করে বেঁধে কোমরে গুঁজে নেয়। স্তনের দুধ যেন পায়খানায় না পরে সেদিকে প্রসূতির সতর্কদৃষ্টি রাখে। স্তনের দুধ পায়খানায় পরলে শিশুর উপরিদোষে পতিত হবার সম্ভাবনা থাকে। সেই সাথে মাতৃদুগ্ধ থেকে মলের গন্ধ বের হয় এবং শিশু সব সময় পেটের পীড়ায় ভোগে। পূর্বকালে

পুরোনো ঢাকার কোন কোন স্থানে প্রসূতি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে ঘরের বাইরে বের হওয়ার কালে নবজাতককে রক্ষাবান দিয়ে যেত। প্রসূতি নিজ বাম পা তুলে তিনবার শিশুর উপর ঘুরিয়ে রক্ষাবান দিত। নবজাতকে অশুভ দৃষ্টির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার এটি একটি প্রচলিত লোকাচার। ছটিঘরে প্রবেশ কালে প্রসূতি নিজ স্তন থেকে খানিকটা দুধ শুকনা মাটিতে ফেলে এর উপর খুকথুকি দিত। এরপর বামপায়ের ধূলা নিয়ে নিজ স্তনে মাখত। প্রসূতি ছটিঘরে রক্ষিত একটি পরিত্যক্ত ঝাড়ু তার গায়ের সামনে ও পিছনে ছোঁয়াত।[১১৬] তারপর আইলার আগুনে কিছুটা সরিষা দানা নিক্ষেপ করে এর ধোয়ায় প্রসূতি নিজের শাড়ি কাপড় ঝাড়ত, দু'হাতে আইলার তাপ নিয়ে নিজ কান সেকত। শেষে আইলার আগুন টপকে ছটিঘরে প্রবেশ করত।

জেমস ওয়াইজ লিখেছেন- ' সন্তান প্রসবের পর অনেক অদ্ভূত ধরনের সব আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি পালন করা হয়। যেমন, প্রসূতির ঘরের দরজার পাশে একটি মাটির পাত্রে চুলার কাঠ-কয়লা রাখা হয়। গ্রীষ্মকালে এই ঘরের মধ্যে রাখা হয় ছয়দিন। আর শীতকালে রাখা হয় একুশ দিন। ঘরের বাইরে বের হতে পারে না প্রসূতি। সবসময়ে ঘরের মধ্যে রাখা হয় একটি জলন্ত প্রদীপ। রাতে কেউ না কেউ ঘরে থাকবেই কেননা অশুভ শক্তির ঘরে প্রবেশের জন্য রাতই উপযুক্ত সময়। বিছানার নীচে রাখা হয় ঘোড়ার পায়ের নাল, কেননা অশরীরি আত্মারা লোহা এড়িয়ে চলে। ঘরের দরজায় টাঙ্গিয়ে রাখা হয় দোয়াকালাম লেখা কাগজ। ভর দুপুরের আগে কাউকে ছটিঘরের বাইরে বের হতে দেয়া হয় না। নবজাতকের কাপড়চোপড় ধোয়া ও শুকানোর কাজ করতে হয় ঘরের ভেতরে, কোনোমতেই ঘরের বাইরে নয়। স্বামী কিংবা চিকিৎসক ঘরে ঢোকার আগে তাদের পোষাক পরিচ্ছদ সরষে-বীজের ধোঁয়ায় শুকিয়ে নেয়া হয়। কোনো আগুন্তুক ঘর থেকে চলে গেলে, ঘরে রাখা খাবার, খাবার-পানি কিংবা দুধ ফেলে দেয়া হয়। হিন্দু প্রসূতকে ছটিঘরে থাকতে হত ছয়দিন আর মুসলমান প্রসূতিকে রাখা হত দশ দিন।'[১১৭]

নবজাতক ও প্রসূতির পরিচর্যার জন্য ছটিঘরে সাধারণত প্রসূতির মা, দাদী, নানী কিংবা বড় বোন থাকে। পুরোনো ঢাকার অবস্থাপন্ন মুসলমান পরিবার চল্লিশ দিনের জন্য একজন ছটিয়ালি[১১৮] নিয়োগ করে থাকে। ছটিঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, সকাল-সন্ধ্যা মা ও শিশুর শরীরে তেল মালিশ করা, সেক দেয়া, তাদের জামা কাপড় ধৌত করা ছটিয়ালির অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। চল্লিশ দিনের ছটি উঠার সময় ছটিয়ালিকে নির্ধারিত পারিতোষিক এর পাশাপাশি শিশুর নানা ও দাদাবাড়ি থেকে নতুন শাড়ি-ব্লাউজ-

Dhaka University Institutional Repository

পেটিকোট-জুতা উপহার দেয়া হয়। এর বাইরেও অনেকে খুশি হয়ে ছটিয়ালিকে স্বর্ণালংকার উপহার দিয়ে থাকে। এছাড়া আত্মীয় স্বজনদের বখশিস আর ছটিঘরের পরিত্যক্ত চাদর, কাঁথা ইত্যাদিতো আছেই। অতীতে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে সন্তান প্রসবের পর থেকে তিনদিন পর্যন্ত ধাত্রী এসে প্রসূতিকে স্নান করিয়ে দিত। শীতকালে অবশ্য কোমর পর্যন্ত ধোয়াত। রজো:রক্তের দায়িক ছাড়ানোর (ঋণ পরিশোধ) উদ্দেশ্যে ধাত্রীকে ছয় দিনের দিন পোলাও কোরমা রান্না করে খাওয়ানো হত। সামর্থ্যের আলোকে কেউ কেউ আবার ধাত্রীকে নতুন শাড়ি উপহার দিত। জেমস ওয়াইজ জানিয়েছেন- 'সব ধরণের বিপদ কেটে যাওয়া না পর্যন্ত, আশা করা হয় যে দাই এসে প্রায়ই দেখে যাবেন। রোগী ধনী হলে দাইকে রোগীর কাছে থাকতে হয় দিন কয়েক। ভারতে নবজাতক শিশুকে দৈনিক স্নান করাবার রেওয়াজ না থাকলেও, বাড়িতে দাই থাকলে বাচ্চাকে দাই গোসল করাতে পারে রোজ। চোখে কাজল দিয়ে দেয়।'[১১৯]

ছয় ষষ্ঠী:

ছয় ষষ্ঠী[১২০] হল সন্তান জন্মের ষষ্ঠ দিনের রজনীতে অনুষ্ঠেয় হিন্দুদের বিশেষ মঙ্গল কর্ম। হিন্দু বিশ্বাস মতে, ঐ রাত্রিতে দেবতা (ভাগ্য দেবতা) নবজাতকের ভাগ্য লিখেন। তখন জেগে না থাকলে ভাগ্য দেবতা মনোযোগ সহকারে ভাগ্যলিপি লিখবেন না। মূলতঃ এই বিশ্বাস থেকেই রাত্রি জাগরণের প্রথার উদ্ভব। এ রাতকে ঢাকার সাহা ও শাঁখারীরা 'ছয় ষষ্ঠী', ঋষিরা 'ছইরা রাইত' আর গোয়ালারা 'ছয় ষাষ্ঠী' বলে থাকে। হিন্দু বর্ণভেদে এর নামের ক্ষেত্রে যেরূপ ভিন্নতা রয়েছে, তেমনি অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রেও বৈচিত্রতা লক্ষ করা যায়। নিম্নে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হলঃ

ঋষি মেয়েরা ছয় ষষ্ঠীর দিনে 'হালকা ছটি' উঠায়। সেদিন ছটিঘর পানি দিয়ে মোছা হয়। প্রসূতি ও নবজাতকের পরিধেয় বস্ত্র, কাঁথা, চাদর ইত্যাদি ধোয়া হয়। মা-শিশু স্নান করে। ছটিঘরের চার দেয়ালে টাঙ্গানো হয় বত্রিশ অক্ষর ষোল নামের হরে কৃষ্ণ হরে রামা লেখা কাগজ। সন্ধ্যার পরপরই ব্রাহ্মণ কর্তৃক 'ছইরা পূজা' অনুষ্ঠিত হয়। ছটিঘরের বাইরে কাঠের চৌকিতে পূজার আসন বসে। ভোগে দেয়া হয় পাঁচ রকমের ফল ও মিষ্টি। আসনের উপর জলপূর্ণ মাটির ঘট বসানো হয়। পূজা শেষে জলপূর্ণ ঘটটি নদীতে বিসর্জন দেয়ার রীতি।[১২১] সন্ধ্যার সময় আত্মীয় স্বজনরা নবজাতকের জন্য নতুন কাপড় ও জিলাপি বা মিষ্টি নিয়ে আসে। কীর্তনকারী দলের লোকেরা কীর্তন পরিবেশন করে। ছটিঘরে আগরবাতি ও মোমবাতি জ্বালানো হয়। নবজাতকের শিয়রে রাখা হয় কলাপাতা, মাটির চাকা, সোয়া কেজি চাল, টাকা-পয়সা,

Dhaka University Institutional Repository

সোনা-রূপা ও হরে কৃষ্ণ হরে রাম লিখিত কাগজ। ঋষি প্রসূতিরা ষষ্ঠীর রাতে শিশুকে বিছানায় শোয়ায় না। রাত বারোটা পর্যন্ত মা তার শিশুকে কোলে নিয়ে বসে থাকে। বারোটার সময় শিশুর মামা, মামা না থাকলে দিদিমণি, ঠাকুর মা ছটিঘরে প্রবেশ করে। তারা সারারাত নবজাতককে কোলে নিয়ে বসে থাকে। ছইরা রাতে প্রসূতির ভাত খাওয়া নিষেধ। সেই রাতে প্রসূতি চা-রুটি খায়।

ছয় ষষ্ঠীর দিন সাহা প্রসূতি ও নবজাতক স্নান করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে। এদিন ছটিঘর ঝেড়েপুছে সাফসুতরা করে দেয়ালে হরিবলের নাম লিখে টাঙ্গানো হয়। সন্ধ্যাকালে ছটিঘরের ভেতর একটি পিঁড়িতে নতুন কাপড় বিছিয়ে 'ছয় ষষ্ঠী পাতা' হয়। সেখানে থাকে একজোড়া মাইটা বালা, মিষ্টি, কলম, দোয়াত, খাতা আর নবজাতকের জন্য একপ্রস্থ নতুন বস্ত্র। সাহা'দের রীতি ছয় ষষ্ঠীর রাত্রে ছটিঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা। প্রসূতি সন্তান কোলে নিয়ে সারারাত ষষ্ঠীর নাম জপ করতে থাকে। পরদিন সকালে শিশুকে স্নান করিয়ে ষষ্ঠীর পিঁড়িতে রক্ষিত বস্ত্রটি পরিধান করানো হয়। সেদিন সারা'রা সামর্থ্যের আলোকে আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে মিষ্টি পাঠায়।

ষষ্ঠীর রাত্রে শাঁখারীদের অনেকেই ছটিঘরের বাইরে ঠাকুরের নামে কীর্তন করিয়ে থাকে। কীর্তনে বাড়ির বয়স্করাও অংশগ্রহণ করে। পরিবারের অন্য সদস্যরা সেই রাত্রে 'ষষ্ঠী মা' 'ষষ্ঠী মা' বলে জপ করতে থাকে। মা শিশুকে কোলে নিয়ে সারা রাত জেগে বসে থাকে। শিশুর শিয়রের কাছে রাখা হয় একফানা কলা, দোয়াত, কলম, খাতা, মিষ্টি, ডিম, চাল ও টাকা। নবজাতকের শিয়রের কাছে রক্ষিত সামগ্রী শাঁখারীদের কাছে 'ষষ্ঠীবাড়ি' নামে অভিহিত। আরো দু'রাত্রি ষষ্ঠী সামগ্রি শিশুর শিয়রে রেখে দেয়ার নিয়ম। এরপর এসব সামগ্রি গরীবদের দান করে দেয়া হয়। ষষ্ঠীর রাত অতিবাহিত হলে পরদিন সকালে দুধ বা পানি দিয়ে সাগু রান্না করে প্রসূতিকে খেতে দেয়া হয়। ছয় ষষ্ঠী পালনের পর প্রথম আহার্য গ্রহণের পূর্বে প্রসূতি ষষ্ঠীর বাড়িকে নমস্কার করে।

গোয়ালা নারীরা ছয়ষষ্ঠীর দিনে ছটিঘরের আসবারপত্র, মা-শিশুর পরিধেয় বস্ত্র, কাঁথা, চাদর ইত্যাদি ধুয়ে-মুছে পরিস্কার করে। কাগজের মধ্যে হরে কৃষ্ণ হরে রামা লিখে ছটিঘরের দেয়ালে ঝুলানো হয়। ঐদিন মা ও শিশু উভয়েই স্নান করে। সন্ধ্যা সময় ছটিঘরের মেঝেতে 'ষষ্ঠীকা আসান' পাতা হয়। ষষ্ঠীকা আসানে থাকে দই-এর হাড়ি, পাঁচ রকমের ফল, পান, মিষ্টি, পাঁচটি প্রদীপ, সোয়াকেজি চাল, পাঁচ রকমের

Dhaka University Institutional Repository

সবজি। বাড়ির বর্ষীয় নারীরা সারারাত জেগে ছটিঘরের বাইরে বসে গীত গায়। পরিবারের অন্য সদস্যরাও রাতভর তাদের সাথে হৈ হুল্লোর করে কাটিয়ে দেয়।[১২২] প্রসূতি ও তার সেবাকারী যে ছটিঘরে তার সাথে থাকে, এরা দু'জন পর্যায়ক্রমে সারারাত শিশুকে কোলে নিয়ে বসে থাকে। ষষ্ঠীর রাত্রে প্রদীপের শিখার সাহায্যে শিশুর নামকরণ করা হয়। পরদিন সকালে ষষ্ঠীর আসনে রক্ষিত দই, মিষ্টি ও ফলসামগ্রী পরিবারের সবাই আহার করে। সোয়াকেজি চাল আর পাঁচ রকম সবজি ব্রাহ্মণকে দেয়া হয়।

কয়েক বছর পূর্বেও হিন্দুদের অনুরূপ পুরোনো ঢাকার মুসলমান সমাজে সন্তান জন্মের ষষ্ঠ রাত্রে 'হাটুইরা রাইত' বা 'কাল রাইত' পালনের প্রথা প্রচলন ছিল। প্রচলিত বিশ্বাস, এই রাত্রে সৃষ্টি কর্তার নির্দেশে ফেরেস্তা এসে শিশুর ভাগ্য লিখে যায়। ভাগ্যলিপিকারী ফেরেস্তা ছটিঘরে প্রবেশ করে নবজাতকের পিছন দিক থেকে ভাগ্য লেখা আরম্ভ করে। ভাগ্য লেখা শেষ করে ফেরেস্তা শিশুর সামনের দিকে এসে ভাগ্যলিপিটা একবার পড়ে দেখে। ভাগ্যলিপিতে শিশুর ভাগ্য ভাল থাকলে ফেরেস্তা সেটি পড়ে খুব আনন্দিত হয়। অন্যদিকে, শিশুর ভাগ্য মন্দ দেখলে ফেরেস্তা অনেক মন খারাপ করে। ক্রন্দন করে আল্লাহকে বলে-'আল্লাহ তুমি এই শিশুটির ভাগ্য কেন এত মন্দ করলে। আমি যদি আগে জানতাম তাহলে শিশুর সামনের দিক থেকে ভাগ্য লিখতাম।'[১২৩] এছাড়া এই রাত্রিতে শনির অনিষ্টকারী প্রভাব শিশুর উপর পতিত হবার সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে শিশুর সমূহ ক্ষতি এমনকি তার জীবনাবসানও ঘটতে পারে বলে স্থানীয় মুসলমানরা বিশ্বাস করত। শনির অমঙ্গল রোধ ও শিশুকে সৌভাগ্যের অধিকারী করার উদ্দেশ্যে মুসলমান মেয়েরা ছটিঘরে নানা রকম লোকাচার পালন করত। নবজাতকের শিয়রে একটি কুলাতে রাখা হত সোয়াকেজি চাল, লোটাপূর্ণ জোয়ার ভাটার পানি, টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা। শিশুর জ্ঞানবুদ্ধির জন্য কুলায় আরো থাকত কলাপাতা পরবর্তীতে খাতা আর কলম। কন্যা শিশুর ক্ষেত্রে অনেকেই একগোছা পাট রেখে দিত, যেন সে লম্বা চুলের অধিকারী হয়। ফযরের আযান না হওয়া পর্যন্ত শিশুকে বিছানায় শোয়ানো হত না। বয়স্ক নারীরা শিশুকে কোলে নিয়ে সারারাত বসে দোয়া-দরূদ পড়ত। এর পাশাপাশি তারা সমবেতভাবে ধর্মীয় গীতও পরিবেশন করত। ফযরের আযানের পর সবাই আশংকামুক্ত হয়ে ঘুমাতে যেত। সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে কুলায় রক্ষিত সামগ্রি নবজাতকের মাথার উপর তিনবার ঘুরিয়ে গরীব মিসকিনদের মাঝে 'সাদকা' করে দেয়া হত।

ছটি উঠা:

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার আদিবাসীরা জন্মাশৌচ থেকে পবিত্র লাভ করাকে ছটি উঠা বলে থাকে। স্থানীয় মুসলমানদের মাঝে প্রসূতির ছটি উঠে ক্রমান্বয়ে- সাত, বার বা তের, একুশ অথবা চল্লিশ দিনে।[১২৪] প্রচলিত ধারণা, সাত দিনে শিশু পাক, বার বা তের দিনে ঘর পাক, একুশ দিনে মানব পাক আর চল্লিশ দিনে রোজা-নামাজ পাক হয়। ধোপা মেয়েদের ছয়, বার ও চল্লিশ দিনে ছটি উঠানোর নিয়ম। অতীতে শাঁখারী প্রসূতির ছটি উঠত এক মাসে। এখন তারা পনের দিনে ছটি উঠিয়ে থাকে। তবে প্রসূতিকে এক মাস পর্যন্ত রাস্তায় বের হওয়া, রান্না-বান্না করা ও মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। বারদিনের ছটি উঠার পর শিশু শুদ্ধ হলেও গোয়ালা প্রসূতির দেহাশুচি থাকে এক মাস পর্যন্ত। এক মাস পূর্ণ হলে প্রসূতি নখ কেটে, মাথার চুল পরিষ্কার করে স্নান করে। স্নান শেষে সোনা রূপার পানি আর গঙ্গা জল মাথায় ঢেলে অশুচিমুক্ত হয়। ঋষি মেয়েদের ছটি উঠে এগার ও ত্রিশ দিনে। জেমস ওয়াইজ জানিয়েছেন, সন্তান জন্মদানের পর বার দিন পর্যন্ত কোয়েরি স্ত্রীলোকেরা অশৌচ থাকে। এরপর দু'বার তাদের স্নান করতে হয় ও প্রতিবার স্নানের পর ঘরবাড়ি লেপে। তারপর সে কূয়ার কিনারে সিঁদুরের পাঁচটি ফোটা দিয়ে অশৌচের অবসান ঘটায়।[১২৫] ব্রাহ্মণদের মত একাদশী যোগীদের প্রথম শ্রেণীর অশৌচ কাল হল এগার দিন। আর, দ্বিতীয় শ্রেণীর অশৌচকাল হল ত্রিশ দিন।[১২৬] মালোদের সন্তান সন্ততি জন্ম নিলে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে এরা ভোগ দেয়।[১২৭] ভুইমালীরা জন্মদানের নবম দিনে ছটি অনুষ্ঠান করে।[১২৮] প্রসবের দশ দিন পর পর্যন্ত চামার মহিলারা থাকে অপবিত্র। তারপর স্নান সেরে পুরোনো হাঁড়িকুড়ি ফেলে দিয়ে একটি অনুষ্ঠান করে। এই অনুষ্ঠানের নাম বরাহিয়া। এরপর শুরু হয় সংসারের স্বাভাবিক কাজকর্ম।[১২৯] সন্তান জন্মদানের এগারো দিন পর্যন্ত মান্দাই প্রসূতি অশৌচ থাকে। তবে, সাধারণতঃ দুই মাসের আগে গৃহস্থালীর কাজকর্মে অংশ নেয় না।[১৩০] কুন্তিন মেয়েরা সন্তান প্রসবের ষষ্ঠ দিনে 'গুলহাত্তি ছটি' পালন করে। সেদিন থেকে প্রসূতি খিচুরী খেতে পারেন। দ্বাদশ দিনে মুসলমানদের থালব্রতের মত বরাহী পালন করা হয়। সবশেষে দ্বাদশ দিনে 'বিসাই' পালন করা হয়। এদিন প্রসূতি দেয়ালে সিঁদুর লেপে এবং কূয়া থেকে জল তোলার অধিকার পায়।[১৩১]

সন্তান জন্মদানের ছয় দিনে ধোপা নারীরা প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে ছটি উঠিয়ে থাকে। ঐদিন ঘর দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। মা-শিশুর ব্যবহৃত জামাকাপড় নিক্ষেপ করা হয় নদীতে। নাপিত এসে প্রসূতির হাত পায়ের নখ কেটে দেয়। শিশুকে স্নান করিয়ে পবিত্র করা হয়। স্নানকালে প্রসূতি তার পরিধেয় বস্ত্র স্নানাগারে খানিকটা দূরে সরিয়ে রাখে। স্নান শেষে বাইরে থেকে কেউ একজন প্রসূতির পরিষ্কার পরিধেয় বস্ত্র স্নানাগারের খোলা চালের উপর দিয়ে ছুড়ে দেয়। প্রসূতি সেই বস্ত্র পরিধান করে

স্নানাগার থেকে বের হলে তার হাতে লাল পলা ও সিঁথিতে সিঁদুর পরানো হয়। এরপর প্রসূতি সন্তান কোলে নিয়ে জলন্ত প্রদীপের আগুনে কিছুটা সরিষাদানা ছুড়ে দিয়ে সেটি মাটিতে উল্টে ফেলে। শেষে বাম পায়ের গোড়ালি দিয়ে প্রদীপটি ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে। সেদিন সন্ধ্যাকালে 'বাচ্চা লোটানা' আচার পালিত হয়। এ উপলক্ষে রান্না করা হয় ভাত, তিন বা চার রকম মাছের তরকারি, আলু অথবা মিষ্টি কুমড়া সহযোগে মাংসের তরকারি, ডালপুরি ও ক্ষীর। একটি থালাতে ভাত, মাছের তরকারি আর একটু দই প্রসূতির সামনে দেয়া হয়। একটি ছিদ্রবিহীন নরম কাপড়ে শিশুর আপাদমস্তক ঢেকে ঘরের মেঝেতে শোয়ানো হয়। শিশুর শিয়রের কাছে রাখা হয় একটি খাদ্যপূর্ণ কলাপাতা। কলাপাতায় থাকে পাঁচটি ডালপুরি। প্রতিটি ডালপুরির উপর একটু ক্ষীর ও ছোট একটি গোলগোলা স্থাপন করা হয়। এর পাশে জ্বালানো হয় একটি ঘিয়ের আর একটি সরিষা তেলের প্রদীপ। শিশুকে মেঝেতে শোয়ানোর পরপরই অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত সবাই জোকার দিয়ে শিশুর উপর পানি ছিটা দেয়। এ সময় শিশু নড়ে উঠলে ধারণা করা হয় সে খুব উঁচু জাতের হবে। অন্যদিকে, শিশুর চুপ করে থাকা নিচু জাতের লক্ষণ।[১৩২]

অত্রঅঞ্চলের মুসলমান মেয়েরা সন্তান প্রসবের সপ্তম দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথমবার ছটি উঠায়। অতীতে পুরোনো ঢাকার কোন কোন জায়গায় 'নবীর বারে' অর্থাৎ সোমবার ও বৃহস্পতিবারে ছটি উঠানো নিষেধ থাকায় তারপরের দিন ছটি উঠানোর রীতি ছিল। ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় সোমবারকে 'পির' বলা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস, পিরবারে পীর-আউলিয়ারা বাতাসে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে। তখন তাদের শরীরে নাপাকির ছিটাফোটা পরলে তারা রুষিত হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠে। ফলে সেই নারীর নানান ধরণের বিপদে আপতিত হবার আশংকা থাকে। প্রচলিত বিশ্বাস, মুসলমানদের পবিত্র দিন বৃহস্পতিবারে 'নাপাকি দূর করলে' গুন্নাহ্ হয়। সেজন্য বৃহস্পতিবারের পরিবর্তে শুক্রবার জুম্মা নামাজের পর নবজাতক ও প্রসূতি গোসল করে পবিত্রতা লাভ করত। সাত দিনের ছটি উঠার সময় ছটিঘরে ব্যবহৃত জীর্ণ কাপড়, কাঁথা, চাদর ইত্যাদি ফেলে দেয়ার রীতি। সেইসাথে ছটিঘর ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়। নাপিত নবজাতকের মাথা মুন্ডন করে। হাত পায়ের নখ কেটে দেয়। প্রসূতিও নখ কেটে গোসল করে। অতীতে সাতদিনের গোসলের সময় প্রসূতি ও শিশুকে সোনা রূপার পানিতে গোসল করিয়ে পবিত্র করা হত। পুরোনো ঢাকার কোন কোন স্থানে ছটি উঠার দিন গোসলের পর সন্তান কোলে নিয়ে প্রসূতি নিয়ম পালনে ক্ষীর খেয়ে থাকে। এখানে মুসলমান সমাজে প্রবাদ আছে- 'ক্ষীর খানেসে থির হোতা'[১৩৩] অথবা 'ক্ষীর খাইলে থির হয়'[১৩৪]। অর্থাৎ প্রসূতি পবিত্রতা অর্জনের পর শিশুকে কোলে নিয়ে

ক্ষীর খেলে শিশু ধীরস্থির ও ধৈর্যশীল চরিত্র লাভ করে। পূর্বে অনেকেই সাতদিনের দিন চাল ভাজা গুড়া করে এর সাথে আঁখের গুড় ও কালিজিরা মিশিয়ে লাড্ডু (নাড়ু) তৈরি করত। তা থেকে সাতটি লাড্ডু প্রসূতিকে খাওয়াতো আর বাকি লাড্ডু বাড়ির শিশুদের মধ্যে বিতরন করা হত।[১৩৫]

পূর্বকালে সাতদিনে শিশু পাক হয়ে যাবার পর তার হাতে, কোমরে ও গলায় পরিধান করানো হত কাচপড়া। শিশুর দাদা, নানা বা পরহেজগার কোন ব্যাক্তি কাচ পড়ে দিতেন। কেউ কেউ আবার এর সাথে জরি স্থাপন করে শিশুর গলায় পরিয়ে দিত। অনেক সময় জরি তাবিজে ভরে দেয়া হত। এটি আঠারমাস পর্যন্ত শিশুর গলায় রাখার নিয়ম। পুরোনো ঢাকার কোথাও কোথাও নযরগোটা, চোখাচোখির মতি, একটি রূপার আংটি, ছোট একপ্রস্থ চামড়া কাচপড়াতে ভরে শিশুর গলায় পরানো হত। শিশুকে নযরমুক্ত করতে অনেকেই রিঠা কিংবা আরব দেশের তেঁতুলের বীচিতে সোনা বা রূপার আংটা স্থাপন করে সেটি কালো কায়তুনে ভরে শিশুর গলায় পরিয়ে দিত। এছাড়া অনেকেই অশুভ শক্তির অপতৎপরতা রোধে সাতদিনের দিন শিশুর গায়ের ময়লা, পরিত্যক্ত নখ ও চুল একত্রে আগুনে পুড়িয়ে ফেলত। কেউ কেউ আবার ছোট শিশুকে দিয়ে বাড়ির চারকোনায় পেশাব করিয়ে বাড়ি 'বান' দিত।

পুরোনো ঢাকার মুসলমানদের মধ্যে সাতদিনের ছটি উঠার দিন নবজাতকের দাদাবাড়ি থেকে বাজার পাঠানোর রেওয়াজ রয়েছে। বাজার সামগ্রির মধ্যে মুরগির বাচ্চা, হরেক রকম সবজি, সরিষার তেল, সাবান, চা পাতা, পাউডার দুধ, মিষ্টি ও খাসি উল্লেখযোগ্য। ধনীদের অনেকেই মা, শিশু ও ছটিয়ালির জন্য এর সঙ্গে নতুন বস্ত্র উপহার স্বরূপ পাঠায়।

ঋষি মেয়েরা এগারদিনে ছটি উঠিয়ে থাকে। এটি তাদের কাছে 'ছুয়াছটি' নামে পরিচিত। ছটি উঠলে সেদিন সবাই শিশুকে কোলে তুলতে পারে। প্রসূতিও পরিবারের সবার সাথে মেলামেশা না করার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি লাভ করে। ছুয়াছটিতে ছটিঘরে ব্যবহৃত জামা-কাপড়, থালাবাটি ফেলে দেয়ার নিয়ম। বিছানার চাদর ও কাঁথা ধুয়ে রোদে শুকানোর পর আগুনে সেকে ছটিঘরে তোলা হয়। অতীতে গোবর দিয়ে ছটিঘর লেপা হত। এখন পানিতে ধুয়ে ফেলা হয়। নাপিত এসে শিশুর মাথার চুল চেঁছে ফেলে। প্রসূতি হাত ও পায়ের নখ কাটে। স্নানের পর নতুন বস্ত্র পরিধান করে প্রসূতি শিশুকে কোলে নিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানে উপবেশন করে। যজ্ঞ শেষে ব্রাহ্মণ শিশুর নামকরণ করেন। এরপর ব্রাহ্মণ ঠাকুর প্রসূতি ও

Dhaka University Institutional Repository

শিশুর উপর 'তিল তুলসীর জল' ছিটিয়ে প্রসূতির কপালে যজ্ঞফোঁটা এঁকে দেন। প্রসূতি ঠাকুর কর্তাকে নমস্কার করে ঘরে চলে যায়। যজ্ঞস্থলে রক্ষিত ঘটের কিছুটা জল সমস্ত ঘরবাড়িতে ছিটানো হয়। ঋষিরা কিছুটা জল বোতলে ভরে রাখে। ত্রিশ দিনের ছুটি উঠার পর সেই জল পুনরায় সমস্ত ঘরবাড়িতে ছিটানো হয়ে থাকে।

মুসলমান নারীরা শিশু জন্মদানের পর বারো বা তেরদিনে দ্বিতীয়বার ছুটি উঠিয়ে থাকে যা তাদের কাছে বারাইয়া বা তেরাইয়া নামে পরিচিত। অতীতে পুরোনো ঢাকার অনেকেই বারাইয়া তেরাইয়ার রাতকে মা ও শিশুর জন্য অশুভ মনে করত। জিন, পরী, ভূত ও প্রেতের অনিষ্ট থেকে প্রসূতি ও নবজাতককে রক্ষার উদ্দেশ্যে বাড়ির বর্ষীয়ান নারীরা ছুটিঘরের বাইরে বসে ফযরের আজানের আগ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নামে জিকির করত।[১৩৬] আর নানী-দাদী ছুটিঘরের ভেতর সারারাত শিশুকে কোলে নিয়ে বসে থাকত। পুরোনো ঢাকায় কোথাও কোথাও একুশদিনের রাতে চোরাভাত লোকাচার পালিত হয়। প্রসূতিকে লুকিয়ে একটি থালায় নানান পদের তরকারিতে ভাত খেতে দেয়া হয়। তখন মা ও শিশু ব্যতিত ছুটিঘরে অন্য কাউকে আর থাকতে দেয় না।[১৩৭]

ইদানিং শাঁখারীদের মধ্যে বেশ কয়েক বছর যাবৎ পনের দিনের দিন ছুটি উঠানোর প্রচলন ঘটেছে। ছুটি উঠানোর দিন প্রসূতি ও শিশুর ব্যবহৃত কাপড়চোপড়, থালাবাটি আর বিছানাপত্র ফেলে দেয়া হয়। শিশুর চুল রাখার মানত না থাকলে নাপিত শিশুর মাথার চুল কামায়। এদিন দিদা ও মাসিরা শিশুকে স্নান করিয়ে দেয়। প্রসূতিও নখ কেটে, মাথা পরিষ্কার করে ধুয়ে[১৩৮] গোসল করে। গোসলের পর মা-শিশু নববস্ত্র পরিধান করে। সেদিন সকালে অনুষ্ঠিত হয় পবিত্র যজ্ঞানুষ্ঠান। যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে প্রসূতি শিশুকে ব্রাহ্মণের কোলে দিয়ে তাকে নমস্কার করে অশুচিমুক্ত হয়। এরপর পরিবারের সবাই শিশুকে কোলে তুলে নেয়। ঐদিন শাঁখারী প্রসূতির মানত থাকলে ভাত খাবে না। রুটি, লুচি ও নিরামিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করবে। মানত থাকলে ভাত খেতে পারলেও মাছ-মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকবে।

সাহা প্রসূতির জননাশৌচ উঠে ত্রিশদিনের দিন। সেদিন প্রত্যুষ্যে ছুটিঘর ধোয়া-মোছা করা হয়। ছুটিঘরে ব্যবহৃত জামাকাপড়, থালাবাটি পোটলা বেঁধে নিক্ষেপ করা হয় নদীতে। প্রসূতি শিশুকে স্নান করিয়ে মেঝেতে বিছানো কলাপাতার উপর এমনভাবে শোয়ায় যেন কলাপাতায় তার স্পর্শ না লাগে।

Dhaka University Institutional Repository

তারপর বাড়ির অন্য একজন সদস্য শিশুর উপর একটু পানি ছিটিয়ে তাকে শুদ্ধ করে। শিশুকে নরম কাপড়ে জড়িয়ে ঘরে নিয়ে নতুন কাপড় পরিধান করানো হয়। প্রসূতিও নখ কেটে, মাথার চুল পরিষ্কার করে স্নান সারে। স্নানের পর প্রসূতি পরিধান করে তার বিয়ের শাড়ি ও গহনা। ব্রাহ্মণ ঠাকুর আসলে যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ হয়। দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগে দেয়া হয় পাঁচ রকমের ফল ও মিষ্টি। প্রসূতি শিশুকে কোলে নিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানে উপবেশন করে। যজ্ঞের পর শিশুর নামকরণ করা হয়। এরপর ছিপকোসের জলে ফুল, বেলপাতা, আতপচাল আর তিল মিশিয়ে মন্ত্র পড়ে ঠাকুর মশাই তৈরি করে শান্তি জল। এই জল প্রসূতি ও শিশুর উপর ছিটিয়ে দিয়ে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করা হয়। এছাড়া শুচিতা লাভের উদ্দেশ্যে সমস্ত ঘরবাড়িতে শান্তি জল ছিটানো হয়ে থাকে। সেদিন নিমন্ত্রণ করা হয় আত্মীয় স্বজনদের। তারা সবাই শিশুর জন্য জামাকাপড়, স্বর্ণালংকার উপহার নিয়ে আসে। নানাবাড়ি থেকে শিশুকে উপহার দেয়া হয় নতুন জামা, লেপ, তোষক, বালিশ, চাদর, থালা, বাটি, স্বর্ণালংকার ইত্যাদি।

পুরোনো ঢাকার মুসলমান মেয়েদের জননাশৌচের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে চল্লিশদিনের দিন। চল্লিশদিনের ছটি উঠার পর প্রসূতি রোজা-নামাজ শুরু করার সুযোগ লাভ করে। এদিন ছটিঘর পানিতে ধোয়া হয়। অতীতে মাটি দিয়ে লেপা হত। মুসলমান নারীদের কেউ কেউ প্রতিবার ছটি উঠার সময় গোবর দিয়ে ছটিঘর লেপত। প্রচলিত বিশ্বাস মতে, গোবরে ছটিঘর লেপা হলে অশরীরী আত্মা সেঘরে প্রবেশ করতে পারে না।[১৩৯] চল্লিশদিনের দিন ছটি উঠার পর ছটিঘরে ব্যবহৃত মাটির থালাবাটি ফেলে দেয়ার নিয়ম ছিল। সামর্থ্যবানরা অবশ্য প্রতিবার ছটি উঠার পর ছটিঘরের জন্য নতুন মাটির থালাবাটি কিনে আনত। ঢাকা শহরে এলুমিনিয়ামের প্রচলন ঘটলে চল্লিশদিনের ছটি উঠার পর কেউ আর ছটিঘরের ব্যবহৃত থালাবাটি ফেলত না, বেশ কয়েকবার গরম পানিতে ধুয়ে নিত। চল্লিশ দিনের পাক গোসলকালে প্রসূতি তিনবার ওজু করে। অনেকেই নাকফুল ও কানের দুল সরিয়ে সে ছিদ্রতে পানি প্রবেশ করানোও ওজুর একটি অপরিহার্য্য অংশ মনে করে। পূর্বে কোন কোন জায়গায় বাড়ির বর্ষীয় নারীরা প্রসূতিকে গোসল করিয়ে দিত। কোথাও কোথাও অভিজ্ঞ নারীরা প্রসূতির পাক গোসল পর্যবেক্ষণ করত। একই সাথে পাকগোসলের নির্দেশনাও দিত। প্রসূতি গোসলের পানিতে 'মায়দানকা মাট্টি, কুমারকি চাক। মোহাম্মদি কালমাসে মেরা বাদান হুয়া পাক'[১৪০] পড়ে ফুঁ দিত। সেই পানি প্রসূতির মাথার উপরে ঢেলে দেয়া হত। প্রচলিত বিশ্বাস, এটি না পড়লে শরীর পাক হয় না। গোসলের পর প্রসূতি সূরা ফাতিহা, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করত। পশ্চিম দিকে ঘুরে আল্লাহ্কে সালাম[১৪১] দিয়ে বলত- 'আল্লাহ পাক মেরা আং হাত

সাব পারিস্কার কার দিও। মেরা নামাজ কাবুল কারিয়ো।'[১৪২] এরপর প্রসূতি উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চারদিকে ঘুরে সবাইকে সালাম দিয়ে বলত- 'চাঁন-সোরাজ, আসমান-জামিন, হাওয়া-বাতাস সাবিকো সাক্ষি রাহিয়ো মায় আং পাক-পবিত্র কার দিয়া।[১৪৩] কোন কোন স্থানে অবশ্য প্রসূতি ভেজা কাপড় পাল্টে শিশুকে কোলে নিয়ে পশ্চিম দিকে ফিরে আল্লাকে সালাম দিয়ে বলত- 'গোদমে মানিক, আসমানকা চাঁন। আসসালামু আলাইকুম উয়া রাহামাতুল্লাহি উয়া বারকাতুহু'।[১৪৪] এরপর প্রসূতির মা একটি কাঁচা পয়সা তার হাতে দিত এবং প্রসূতি প্রথমে ডান পা পরে বাম পা এভাবে হেঁটে তার ঘর পর্যন্ত আসত। ঘরে প্রবেশকালে প্রথমে ডান পা ফেলে ঢুকত। ঘরে প্রবেশ করে প্রসূতি শিশুকোলে রেখেই ক্ষীর খেত। কেউ কেউ এর সাথে মুড়ির ভর্তা, শুকনা মরিচের ভর্তা, নারিকেল ইত্যাদি খাবার প্রসূতিকে খেতে দিত। প্রথানুযায়ী, চল্লিশদিনের ছটি পাক করার উদ্দেশ্যে ঐদিন বিকেল বেলায় প্রতিবেশী চল্লিশ বাড়িতে ক্ষীর পাঠানো হত।

কূয়া ছুয়া বা কূয়া পাক করা:

অতীতে ঢাকা শহরে পানির উৎস ছিল পাতকূয়া। প্রতিবছর কূয়ায় পরে অসংখ্য শিশু মারা যেত। শিশুমৃত্যু রোধে গোয়ালা আর মুসলিম নারীরা 'কূয়া ছুয়া,' 'কূয়া পাক' বা 'কূয়া ঠান্ডা করা' লোকাচার পালন করত। এ প্রসঙ্গে জেমস ওয়াইজ বলেছেন- 'হিন্দুদের মধ্যে এই পূজাকে বলে শুভআঁচানি। এই আচারের পর সংসারের সব কাজ আবার শুরু করেন প্রসূতি।'[১৪৫] এখনো ধোপা নারীরা সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে কূয়া ছুয়া লোকাচার পালনের মধ্য দিয়ে শুদ্ধিতা অর্জন করে। এর ফলে অষ্টম দিন থেকে ধোপা-প্রসূতি ধুপবাতি জ্বালানো এবং কয়লার ইস্ত্রি দিয়ে কাপড় ইস্ত্রি করার অধিকার লাভ করে। অতীতে এই লোকাচারটি তারা কূয়ার পাড়ে পালন করত। এখন কূয়া না থাকার কারণে ধোপা নারীরা একটি জলপূর্ণ ষ্টিলের পাত্রকে প্রতীকী কূয়া বানিয়ে এই আচার পালন করে থাকে।[১৪৬] এই পর্বে মা-শিশু স্নান করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে। আইপান ও সিঁদুর চর্চিত প্রতীকী কূয়ার চারপাশে রাখা হয় পাঁচটি মাটির টোপা আর একফানা কলা। টোপার ভেতর থাকে খানিকটা কাঁচাবুট, পুরি ও একটা কলা। কলার ফানার উপর পাঁচটি পান রাখা হয়। প্রসূতির অঞ্জলি পবিত্র করার উদ্দেশ্যে আইপান-সিঁদুরে চর্চিত করে পানি দিয়ে ধোয়ানো হয়। একটি খেলনা বালতিতে দড়ি বেঁধে প্রসূতিকে দেয়া হলে, সে শিশুকে কোলে নিয়ে প্রতীকী কূয়া থেকে পানি তুলে। তখন বাড়ির অন্য স্ত্রয়োরাও প্রসূতির সাথে বালতির দড়ি ধরে। কূয়া

থেকে পাঁচবার পানি তুলে পুনরায় কূয়াতে পানি ফেলার নিয়ম। আচার পালন শেষে প্রসূতি কূয়াকে ভক্তি করে শিশু কোলে ঘরে ফিরে আসে।

অতীতে গোয়লা প্রসূতিরা সন্তান জন্মদানের পর বারদিনের ছটি উঠিয়ে সেদিন অথবা তার দু'এক দিন পর কূয়া ছুয়া আচার পালন করত। এই আচার পালনকালে কূয়ার মুখ আইপান ও সিঁদুরে চর্চিত করা হত। প্রসূতি সন্তান কোলে কূয়া পাড়ে বসত। তার দু'হাত আইপান-সিঁদুরে চর্চিত করে কূয়ার পানিতে ধুইয়ে দেওয়া হত। প্রসূতি পান-সুপারি-বাতাসা কূয়াতে নিক্ষেপ কালে বলত- 'খাজির বাবা খাও'[১৪৭]। এরপর প্রসূতি কূয়া থেকে তিনবার বালতিতে পানি তুলত। প্রতিবার কূয়া থেকে পানি তোলার পর সেই পানি প্রসূতি আবার কূয়ায় ঢেলে দিত।

পুরোনো ঢাকার কোন কোন জায়গার মুসলিম মেয়েরা হিন্দু মেয়েদের মত কূয়া পাক বা কূয়া ঠান্ডা করত। সন্তান জন্মের পর চল্লিশদিন পর্যন্ত প্রসূতিকে কূয়ার পাড়ে গোসল করা নিষিদ্ধ ছিল। প্রসূতির চল্লিশদিনের পাকগোসল সম্পন্নের পর এই লোকাচার পালন করার রীতি। লোকজ বিশ্বাস, প্রসূতি মা'র এই আচার পালনে কূয়া তার শিশুকে ভোগ নেয় না অথবা পানির মালিক খজখিজির (আঃ)[১৪৮] শিশুটিকে রক্ষা করবেন। এই ক্রিয়াকর্ম পালন করার পূর্বে কূয়ার পাড় ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা হত। মা ও তার শিশু নববস্ত্র পরিধান করে কূয়ার পাড়ে আসত। আচার পালন উপলক্ষে আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও তাদের শিশু-কিশোরদের ডাকা হত। আস্ত ও নিঁখুত পান, সুপারি, নক্কুল, খুচরা পয়সা, একদরে কেনা চিনি ও লবন চার বা পাঁচটি কুলায় সাজিয়ে কূয়ার পাড়ে রাখা হত। আরো থাকত দুধ-নারিকেল দিয়ে রান্না করা ক্ষীর বা জর্দা। স্থান বিশেষে কোথাও প্রসূতি কূয়ার উপর বাম পা তিনবার ঘুরিয়ে কূয়াকে বান দিত। শিশু কোলে নিয়ে প্রসূতি দ্বারা কূয়ার মুখপাড়ে সাতটি সিঁদুরের ফোঁটা কোথাও সিঁদুরের পরিবর্তে সরিষা তেলে ফোঁটা দিয়ে কূয়াকে পবিত্র করা হত। এরপর আচার পালনস্থলে প্রসূতি উপস্থিত শিশুদের কপালে সরিষা তেলের ফোঁটা এঁকে দিত। প্রসূতি তার শিশুকে কোলে নিয়ে কূয়া থেকে তিন বা সাত বালতি পানি তুলে সেই পানি আবার কূয়ায় ঢেলে দিত। কূয়া থেকে তোলা সর্বশেষ বালতির পানির সাথে সোনা-রূপার পানি মিশিয়ে সেই পানি কূয়াতে ঢালা হত। উপস্থিত জননী অতিথিরা কূয়া থেকে পানি তোলার কাজে প্রসূতিকে সহযোগীতা করত। প্রসূতি কুলায় রক্ষিত সামগ্রি থেকে একজোড়া পান-সুপারি, কিছু নক্কুল, কাঁচা পয়সা, লবন, চিনি, ক্ষীর কিংবা জর্দা কূয়াতে নিক্ষেপ করত। এই ক্রিয়ানুষ্ঠানে একজন

কিশোরকে 'লাবরা চোর' বানানো হত। লাবরা চোর দৌড়ে কুলায় রক্ষিত সামগ্রি থেকে পান, সুপারি, নক্কুল তুলে নিয়ে পালাত। পিছনে কিশোরের দল তাকে ধরার জন্য ছুটত। উপস্থিত সবাই 'ধর ধর' বলে চিৎকার করে উঠত। পরিশেষে সবাইকে ক্ষীর আপ্যায়ন করা হত।

ছটির অনুষ্ঠান:

ছটি উঠার দিন বা দুই একদিন পর বিশেষ করে প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে আড়ম্বরপূর্ণভাবে উৎযাপিত হয় ছটির অনুষ্ঠান। স্থানীয় মুসলমানদের মাঝে ছটির অনুষ্ঠান চল্লিশদিন অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর এবং মৃত্যু ব্যক্তির চল্লিশা অনুষ্ঠান চল্লিশদিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বের কাছাকাছি যেকোন দিনে সম্পন্ন করারও রীতি। প্রচলিত বিশ্বাস, চল্লিশ দিনের ছটি উঠার দু'একদিন পর ছটির অনুষ্ঠান, শিশুর আয়ু বৃদ্ধি করে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিশুর নানা আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণ জানায়। অতিথিরা শিশুর জন্য উপহার নিয়ে আসে। শিশুর নানাবাড়ি থেকে শিশুকে উপহার দেয়া হয় জামা-কাপড়, স্বর্ণালংকার, খেলনা ও শিশুর প্রয়োজনীয় সব সামগ্রি। শিশুর দাদাও উপহার স্বরূপ নানাবাড়ির সবাইকে নতুন কাপড় দেয়, সঙ্গে থাকে দু'এক মন মিষ্টি। কোথাও অনুষ্ঠান শেষে মা তার শিশুকে নিয়ে শ্বশুড়ালয়ে ফিরে যায়।

মীর্জা নাথানের বাহরিস্থান-ই-গায়েবি গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মোঘল আমলের শিশুর, বিশেষ করে পুত্র সন্তানের জন্ম উপলক্ষে সমাজে আনন্দ-উৎসবের প্রথা ছিল। মীর্জা নাথানের একটি পুত্র সন্তান জন্মের সংবাদে বাংলা মুগল সৈন্যবাহিনী একদিন একরাত্রি আনন্দ-উৎসব করে। বন্ধু-বান্ধবরা সৌভাগ্যের অীধকারী পিতাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতেন। মস্তবড় ভোজ দেয়া হত এবং মেহেমানদের উপহার দেয়া হত।'[১৪৯]

বিশ শতকের প্রারম্ভে খাজা হুমায়ুন কাদেরের সন্তানের ছটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্যাচেলর ক্লাবে অতিথিদের নেমন্ত্রন্ন করা হয়েছিল। আবার নওয়াব হাবীবুল্লাহর স্ত্রীর ছটি উঠা অনুষ্ঠান উপলক্ষে চা পার্টির আয়োজন করেছিলেন আর সেই অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের বায়োস্কোপ দেখানো হয়েছিল।[১৫০]

ঠাইলারা:

Dhaka University Institutional Repository

অত্র অঞ্চলের কোথাও মুসলিম প্রসূতির ঠাইলারা পালনের প্রথা আছে। ঠাইলারা পালনে, একরাত অতিবাহিত ও অবস্থান করার জন্য ছটি উঠার চল্লিশ দিনের দিন বিকাল বেলায় প্রসূতি শিশুকে নিয়ে পিত্রালয় থেকে শ্বশুড়ালয় বা আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখানে রাতে অবস্থানের পরদিন মধ্যাহ্ন ভোজন শেষে ফিরে যায় নিজ বাড়ীতে। কেউ আবার আরো একদিন অতিরিক্ত অবস্থান করে। ধারণা আছে ঠাইলারা পালনে মা-শিশুর শরীর সুস্থ্য থাকে।

সন্ধ্যাবালা:

ত্রিশদিনের ছটি উঠার দিন অপরাহ্নে ঋষি নারীদের কর্তৃক পালিত লোকাচার সন্ধ্যাবালা। এই লোকাচার পালনের উদ্দেশ্যে নবজাতকের গৃহে আত্মীয় ও প্রতিবেশী নারীদের আগমন ঘটে। শিশুর মা শিশুকে নতুন জামা, গলায় কাঠের মালা আর কোমরে বাইটা পরিধান করিয়ে তুলসী তলায় নিয়ে যায়। সাথে নেয়া হয় কুলা, পান ও মিষ্টি। কুলার মধ্যে সরিষার তেল, সিঁদুর, বাতাসা, পান, জিলাপি, ধান ও দূর্বা থাকে। মা তার শিশুকে কোলে নিয়ে তুলসী গাছের গোড়ায় তেল-সিঁদুর উৎসর্গ করে। সেখান থেকে সেই তেল হাতে নিয়ে শিশুর মাথায় দেয়। শিশুকে তুলসী তলায় শুইয়ে শিশুর মা তুলসী গাছকে প্রণাম করে। প্রণাম শেষে শিশুকে কোলে তুলে নেয়। এই সময় একজন বয়স্ক নারী কুলায় রক্ষিত পান, জিলাপির কিছুটা হাতে তুলে দৌড়ে পালায়।[১৫১] শেষে অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত সবার মাঝে পান-জিলাপি বিতরণ করা হয়। এছাড়া প্রতিবেশীদের বাড়িতেও এ পান-জিলাপি পাঠানো হয়ে থাকে।

465080

মেলা:

নবজাতকের জন্ম গ্রহণের পর একমাস পর্যন্ত ঋষি নারী ও পুরুষ উভয়েই অপবিত্র থাকে।[১৫২] তখন তারা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না। বৈষ্ণব মেলা সম্পাদনের মাধ্যমে শিশুর পরিবার পরিশুদ্ধিতা অর্জন করে। শিশুর জন্মের একত্রিশ দিনে অথবা তার দু'চার দিন পর সন্ধ্যাবেলায় বৈষ্ণব মেলা উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানে বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণ জানানো হয়। আমন্ত্রিত বৈষ্ণবরা গৃহে প্রবেশকালে পরিবার প্রধান (নবজাতকের দাদা বা নানা) করজোড়ে বলে- 'আইজকা আপনেরা আমাগো শুদ্ধ কইর‍্যা দেন'।[১৫৩] এরপর পরিবার প্রধান ঘরের ভেতর বৈষ্ণবদের বসিয়ে তাদের কপালে পাঁচটি চন্দনের ফোঁটা এঁকে গলায় ফুলের মালা পরায়। বাড়ির কর্তা বৈষ্ণবদের সম্মুখে ধুপবাতি দেখিয়ে তাদেরকে প্রণাম করে। গৃহের একপাশে চৌকিতে কাপড় বিছিয়ে পূজার আসন পাতা হয়। এর উপর স্থাপন করা হয় গুরুদেবের

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

(রাধাকৃষ্ণ) ছবি। সেখানে পূজার উপচার হিসেবে থাকে ফুল। এর সাথে পাঁচ রকমের ফল ভোগে দেওয়া হয়। চার-পাঁচজন বৈষ্ণবী রান্না করতে চলে যায়। বৈষ্ণবরা কীর্তন পরিবেশন করে। বাড়ির কর্তা কীর্তন শেষে পরিবারের পক্ষ থেকে শুদ্ধিতা অর্জনের ঘোষণা দেয়। তবে কীর্তন পরিবেশনের পূর্বে অথবা শেষে বৈষ্ণব কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে এ শুদ্ধিতা লাভ করে থাকে। শুচিতা লাভের উদ্দেশ্য শিশু কোলে নিয়ে প্রসূতি বৈষ্ণবদের কাছে এসে বলে- 'বৈষ্ণবগো আমি শুদ্ধ হতে চাই'।[১৫৪] বৈষ্ণবরা তখন চর্ণামিত তৈরী করে প্রসূতি শিশু আর পরিবারের সকল সদস্যদের উপর ছিটিয়ে দেয়। প্রত্যেকের কপালে তিন বা পাঁচটি চন্দনের ফোঁটা ঠেকানো হয়। এরপর পরিবারের সবাই একে অপরের গলায় মালা পরিয়ে দেয়। পবিত্রতা লাভের পর প্রসূতি গোবিন্দের আসনের সামনে শিশুকে শোয়ালে বৈষ্ণবরা তার গায়ে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে- 'তোমার মা নিয়া সুখে থাক। গুরুদেব তোমারে সুখে রাখুক'।[১৫৫] বৈষ্ণব মেলায় সাধারণত ডালে-চালে খিচুরি, সবজিভাজা ও মিষ্টান্ন রান্না করা হয়। ঋষিদের কেউ কেউ আবার এরসাথে ফল, মিষ্টিও আনে। রান্নার পরপরই ভোগের জন্য একটি থালায় খাবার তোলা হয়। থালাপূর্ণ খাদ্য গোবিন্দের আসনের সামনে রাখা হলে সবাই ঘর থেকে বের হয়ে যায়। এই সময় ঘরের দরজা জানালাও বন্ধ থাকে। ভোগের প্রসাদ সবাই অল্প করে খায়। অনেকেই থালার এ প্রসাদ হাড়ির খাবারের সাথে মিশিয়ে ফেলে।

হিজরা কর্তৃক বাচ্চা নাচান:

জুইমা হিজরার স্মৃতি কথায় বাচ্চা নাচানোর বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বলেন- 'ছট্টির অনুষ্ঠানে নাচ-গান করে আমরা প্রচুর টাকা-পয়সা, শাড়ি-কাপড়, খাবার-দাবার বখশিস পেয়েছি। নবজাতকের জন্মের খবর পেলে, সাথে সাথে ঢোল নিয়ে সেখানে হাজির হতাম। এরপর নবজাতকে কোলে তুলে নিয়ে গান শুরু করতাম-আমি আর্শীবাদ করি আল্লাহ, বেঁচে থাক, ছেলের ঘরে ছেলে হবে, মেয়ের ঘরে খোকা হবে, ঘুচবে আমার মনের সাধ। বেঁচে থাকুক সোনার চাঁদ। গান শেষ হলে শিশুকে তার মায়ের কোলে দিতাম। হাতের তালুতে সরিষার তেল নিয়ে তেল পড়ে দিতাম। তখন বলতাম- আয় বেঁচে থাক, সুখে থাক, আমার মাথার যতগুলো চুল আছে তত পলনা নাড়ুক। হাইকোর্টের বাবু হউক। জজকোর্টের উকিল হউক। আয় বেঁচে থাক। শিশুর মাকে কাছে ডেকে কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়া-কালাম পড়ে ঝেড়ে দিতাম। এসব কারণে সবাই আমাদের পছন্দ করত। মুসলমানদের তুলনায় হিন্দু বাড়িতে আমি বেশি বাচ্চা নাচিয়েছি। তারা জানত আমি ব্রাক্ষণের মেয়ে যমুনা। এই- যমুনা-মাসিকে

Dhaka University Institutional Repository

ওরা অনেক ভালোবাসত। অনেক মুসলমান পরিবার আছে আমার দুঃখ বোঝে, আবার অনেক আছে আমাদের দেখলেই দূর দূর করে বের করে দেয়। তবে বিহারি ও মেথরপট্টির মেথররা আমাকে খুবই শ্রদ্ধা করে। তাদের বাচ্চা নাচাতে চাইলে কখনোই মানা করে না। এখনো তাদের শিশুর জন্মের খবর শুনে সেখানে গেলে শাড়ি, টাকা, চাল আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি বখশিশ দেয়। এ ছাড়াও অন্য কোনো কিছু দাবি করলে সেটাও পূরণ করে।'[১৫৬]

অন্নপ্রাশনঃ

সনাতন হিন্দু ধর্মে ষোল সংস্কারের মধ্যে অন্নপ্রাশন হল একটি অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। মনু জন্মের ষষ্ঠ মাসে শিশুর অন্নপ্রাশন সম্পন্ন করার কথা বলেছেন।[১৫৭] পুরোনো ঢাকার হিন্দুরা কন্যা সন্তানের জন্য বেজোড় পঞ্চম বা সপ্তমমাসে আর পুত্র সন্তানের জন্য জোড় ষষ্ঠ বা অষ্টমমাসে অন্নপ্রাশন পালন করে থাকে। অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে শিশুর মুখে প্রথমবার অন্ন জাতীয় আহার্য তুলে দেওয়ার রীতি। তার আগ পর্যন্ত কেবলমাত্র দুধ-ই ছিল শিশুর আহার। শিশুর মুখে অন্ন প্রদানের পূর্বে সেই অন্নকে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। মূলতঃ শিশুর মুখে প্রথমবার অন্ন প্রসাদ প্রদানের কাজটি শিশুর মায়ের পক্ষের আত্মীয়রা বিশেষ করে মামার হাতে হয়ে থাকে। হিন্দুদের কোন কোন বর্ণের মাঝে মামা ছাড়াও দাদু, নানু, ঠাকুরমা, দিদিমনি এই দায়িত্ব পালন করে। অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানটি শিশুর পিতার গৃহে অথবা মন্দিরে পালিত হতে দেখা যায়। মন্দিরের মধ্যে ঢাকেশ্বরী ও লোকনাথপুর মন্দির উল্লেখযোগ্য। প্রথম সন্তানের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে আড়ম্বড়তা পরিলক্ষিত হয়। আমন্ত্রিত অতিথিরা সবাই শিশুর জন্য উপহার নিয়ে আসে। নানাবাড়ি থেকে শিশুকে নতুন জামা, স্বর্ণালংকার ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রি উপহার দেয়া হয়। হিন্দুদের যে সব বর্ণে মামা শিশুর মুখে অন্ন তুলে দেয়, সেই মামাকে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিশুর পিতা নতুন বস্ত্র দান করে। অন্নপ্রাশনের দিন শিশুর বাবা-মা এবং ঋষিদের মধ্যে শিশুর মামাকেও উপবাস থাকতে হয়। পুত্র সন্তানের অন্নপ্রাশন আরম্ভের পূর্বে সেদিন বৃদ্ধি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা শাঁখারীদের রীতি। বৃদ্ধি অনুষ্ঠানে শিশুর পিতা তার মৃত পিতৃপুরুষের নামে জলদান করে।[১৫৮] সাহা নারীদের নিজ সন্তানের অন্নপ্রাশন দর্শন করা নিষেধ। সেই কারণে শিশুর মা অন্নপ্রাসন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত একটি ঘরের ভেতর আবদ্ধ থাকে। অনুষ্ঠানের দিন শিশুকে পিঁড়িতে বসিয়ে হলদিগিলা বাটা মেখে স্নান করায় মাসি, পিসি আর কাকিরা। সাহাদের মধ্যে অনেকেই সেদিন শিশুর স্নানের জলে দূর্বা মিশিয়ে সূর্যতাপে গরম করে।[১৫৯] ঋষি ত্রয়োরা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে শিশুর স্নানের জল পুকুরপাড় বা রাস্তার কলপাড় থেকে নিয়ে আসে। এরা মামা-

ভাগিনাকে একসাথে হলুদ স্নান করায়। স্নানকালে জোকার দেয়া হয়। স্নানের পর শিশুকে শীতলপাটিতে বসিয়ে নববস্ত্র, গলায় কাঠের মালা, কোমরে বাইটা (লাল কায়তুন) আর মাথায় টোপর পরানো হয়। শিশুর কপাল থেকে গাল পর্যন্ত চন্দনের ফোঁটা অংকন করা হয়ে থাকে। ঋষি মামাকেও অনুরূপভাবে সজ্জিত করা হয়। এছাড়া ঋষি নারীরা মামা-ভাগিনার চোখে কাজল, বাম কানের পিছনে ও বাম পায়ের পাতায় কাজলের ফোঁটা দেয়।[১৬০] সাজসজ্জা সম্পন্ন হলে ঋষি মামা শিশুকে কোলে নিয়ে ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে সমস্ত পাড়া এক চক্কর ঘুরে মন্দিরে যায়। মন্দিরে ঠাকুর মামা-ভাগিনার কপালে ধান দূর্বা ছিটিয়ে আশীর্বাদ করে। সাহা'দের মধ্যে ঘনিষ্ট জনেরা এই সময় শিশুকে আশীর্বাদ করে থাকে। নতুন থালায় রক্ষিত প্রসাদ অল্প করে তিনবার শিশুর মুখে দেয়ার পর একটি নতুন গ্লাসে শিশুকে পানি পান করানো হয়। ঢাকার ধোপা ও গোয়ালারা শিশুর মুখে অন্ন প্রসাদ তুলে দেয়ার পর একটু ছেঁচাপান মুখে দেয়। এরপর শিশুর দাঁতের মাড়িতে কাঠি ছুইয়ে দাঁত খিলাল করার অভিনয় করা হয়। এই সময় গোয়ালা মামার কাছে নতুন থালায় বই, খাতা, কলম আনা হলে সেখান থেকে সে একটি করে তুলে শিশুর হাতে দেয়। অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত অতিথিদের পোলাও বা নিরামিষ পোলাও (পেঁয়াজ-রসুন ছাড়া), বেগুনি, পায়েস, চাটনি, বুটের ডাল, আলু-পটলের রসা, নিরামিষ খাওয়ানো হয়।

মামা ভাত:

অত্র অঞ্চলের সাহা'দের মধ্যে অন্নপ্রাশনের পরপরই মামাভাত অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন শিশু আনুষ্ঠানিকভাবে মামার হাতে মামার গৃহের অন্ন খেয়ে থাকে। সাহা'দের মতে, মামা তার গৃহে ভাগিনা বা ভাগিনীর মুখে আনুষ্ঠানিকভাবে আহার্য তুলে দিলে শিশু সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।[১৬১] এই অনুষ্ঠানে মামা তার পক্ষ থেকে আত্মীয় স্বজনদের নিমন্ত্রণ জানায়। অতিথিরা সবাই শিশুর জন্য স্বর্ণালংকার, জামা কাপড়, খেলনা, পিতল ও কাঁসার থালাবাটি ইত্যাদি উপহার নিয়ে আসে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে মামা শিশুকে নববস্ত্র, স্বর্ণালংকার আর শিশুর অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রি উপহার দেয়। একই সাথে শিশুর পিতা অনুষ্ঠানে পরিধানের জন্য শিশুর মামাকে নতুন বস্ত্র দান করে। ঐদিন সাহা মামার উপবাস থাকার রীতি আছে। মামা ফুল-ধান-দূর্বা তিনবার শিশুর মাথার উপর ছিটিয়ে ও শিশুর কপালে প্রদীপে শীষ ঠেকিয়ে শিশুকে আশীর্বাদ করে। এরপর কোলে বসিয়ে শিশুকে অল্প করে তিনবার পায়েস খাওয়ায়। সাথে ভাত, নিরামিষ ও মাছ সামান্য পরিমানে শিশুর মুখে দেয়া হয়।

মুখে সিন্নি বা খিরবুজনিঃ

অতীতে হিন্দুদের অন্নপ্রাশনের অনুরূপ মুসলমান সমাজেও মুখে সিন্নি অনুষ্ঠান পালনের ব্যাপক প্রচলন ছিল। ঢাকার মুসলমানদের কারো কারো কাছে এই অনুষ্ঠানটি মুখে ভাত কিংবা খিরবুজনি নামেও পরিচিত। মুসলমানদের অনেকে শিশুর সাতমাস, কেউ কেউ ছেলে শিশুর পাঁচমাস এবং মেয়ে শিশুর সাতমাস বয়সে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম আহার্য প্রদান করত। শিশুর মুখে প্রথম অন্ন খাদ্য তুলে দিত মাজার বা দরগার খাদেম, স্থানীয় কোন মসজিদের ইমাম বা মাওলানা সাহেব। এ উপলক্ষে ধনীরা ঘোড়াগাড়ীতে ও পরবর্তীতে বাস ভাড়া করে আত্মীয় স্বজনসহ শিশুকে নিয়ে মিরপুর মাজার, কুমির শাহ্ মাজার, বায়গুন বাড়ি মাজার অথবা দায়রা শাহ্ সাহেব বাড়ি যেত।[১৬২] শিশুর জন্য রান্না করে নেয়া হত মিঠা ভাত, জর্দা বা পায়েস। সাথে আরো থাকত আটার তৈরি পাতলা ও নরম রুটি। কেউ কেউ পান ছেঁচে সাথে নিত। মাজার বা দরগার খাদেম সাহেব তার কোলে বসিয়ে উক্ত খাদ্যদ্রব্য অল্প পরিমানে শিশুকে খাওয়াত। এ কাজের জন্য শিশুর পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে বখশিস প্রদান করা হত। অতিথিদের জন্য রান্না করে নেয়া হত পোলাও-কোরমা, বিরিয়ানি বা খিচুরি ও আলু দিয়ে গরুর গোস্তের ঝাল তরকারি। সবাই পিকনিক আমেজে মুখে সিন্নি অনুষ্ঠান উপভোগ করত।

শিশুর দাঁত :

শিশুর দাঁত নিয়ে পুরোনো ঢাকার আদিবাসী সমাজে নানান ধরণের লোকজবিশ্বাস রয়েছে। দাঁতসহ শিশুর জন্ম পৃথিবীর অন্যান্য জাতির লোকাচারের মতই পুরোনো ঢাকার আদিবাসীদের অনেকের কাছে অশুভ লক্ষণযুক্ত। দাঁত উঠার পূর্বে শিশুকে আয়নায় তার প্রতিচ্ছবি দেখালে বা শিশুর মাড়ি কাক দেখলে শিশুর দাঁত উঠে না। আবার কোন কোন স্থানে এ বিশ্বাসও রয়েছে, শিশুর কোমরে কায়তুন না থাকলে কাক যদি তাকে দেখে, তবে শিশুর দাঁত উঠতে দেরি হয়।[১৬৩] কারো কারো ধারণা, দন্তোদ্গমের পূর্বে শিশুর মাথা চিরনি দিয়ে আচঁড়ালে শিশু চিরল দাঁতের অধিকারী হয়। চিরনীর ন্যায় ফাঁকা ফাঁকা দাঁতকে চিরল দাঁত বলা হয়ে থাকে। লোকবিশ্বাস, চিরল দাঁতের অধিকারীরা বেশ চতুর ও কুটবুদ্ধি সম্পন্ন হয়। শিশুর পাঁচ-ছয়মাস বয়সে দাঁত উঠলে সেটি 'পানসা দাঁত'। এইরূপ দাঁত শক্ত ও মজবুত হয় না বলে তাড়াতাড়ি পরেও যায়। অপরপক্ষে, নয়-দশমাস বয়সে শিশুর দাঁত উঠা ভাল। এই দাঁতকে 'পাথথারিয়া' বা 'পাথথইরা দাঁত' বলা হয়ে থাকে যা শক্ত ও মজবুত হয়। শিশুর প্রথম দাঁত উঠলে তার শারীরিক বিকাশকে স্বাগত জানিয়ে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের মাঝে পান-নক্কল বিতরনের রীতি প্রচলিত

Dhaka University Institutional Repository

আছে।[১৬৪] পূর্বে এর সাথে আনারের দানাও বিতরন করত অনেকেই, যেন শিশুর আনারের দানার মত ছোট ও সুন্দর দাঁত উঠে। বর্তমানে এই রীতির ব্যত্যয়ও দেখা যায়। এখন সবাই পান-নক্কুলে পরিবর্তে মিষ্টি বিতরন করে থাকে। শিশুর নিচের মাড়ির দাঁত প্রথম উঠা সুলক্ষণযুক্ত। আর নিচের মাড়িতে দাঁত উঠলে দাঁতের মাথা আকাশের দিকে থাকে বলে বলা হয়-'নিচের দাঁত আসমান ছেদ করে' অর্থাৎ এটি সৌভাগ্যের লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। পক্ষান্তরে, শিশুর উপরের মাড়িতে প্রথম দাঁত উঠা অকল্যাণকর। কারণ উপরের দাঁত 'জমিন ছেদ করে/কবর খুদে/মউতের চিহ্ন'।[১৬৫] শিশুর দাদা-দাদী, নানা-নানী অথবা বাড়ির মুরুব্বীদের মধ্যে কেউ না কেউ মারা যায়। কারো কারো বিশ্বাস, যদি বাড়ির মুরুব্বী নাও মারা যায়, তবে শিশুর পিতা-মাতার সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। সেইসাথে মা-বাবার মধ্যে মনোমালিন্য ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

অতীতে দাঁত পরে গেলে শিশুকে পানি দিয়ে কুলি করতে দেয়া হত না। পানি দিয়ে কুলি করলে পানসা দাঁত উঠবে বলে বিশ্বাস প্রচলিত। শাখারীরা শিশুর পরে যাওয়া প্রথম দাঁত কাককে দেখাত না। লুকিয়ে ড্রেনে ফেলে দিত। কারণ পরে যাওয়া দাঁত কাক দেখলে শিশুর দাঁত আর উঠে না।[১৬৬] ঢাকার মুসলিম আদিবাসীরা শিশুর পরে যাওয়া প্রথম দাঁত নিয়ে ইদুরের গর্তে ফেলত। লোকবিশ্বাস, গর্তে দাঁত ফেলে ইদুরের কাছে দাঁত চাইলে নতুন দাঁত উঠে ইদুরের মতই ছোট ছোট ও অপেক্ষাকৃত ধারালো। নিয়ম মাফিক, ইদুরের গর্তে দাঁত ফেলে দিয়ে শিশুকে বলতে হত- 'চুয়া তেরা দাঁত দে আর মেরা দাঁত লে'[১৬৭] অথবা 'ইদুর ভাই তোর দাঁত আমারে দে, আমার দাঁত তুই লে'[১৬৮]।

শিশুর হাঁটতে শেখা:

অতীতে শিশুর হাঁটা নিয়েও ঢাকার আদিবাসীদের মধ্যে পালিত হত বিভিন্ন রকমের লোকজ সংস্কার। শিশু সময়মত হাঁটতে না পারলে পিঁপড়ার মাটি সংগ্রহ করে শনি ও মঙ্গলবারে বাসি বিছানায় শিশুর পায়ে মালিশ করা হত। কেউ কেউ আবার বাসি চুলার ছাইও শিশুর পায়ে মালিশ করত। এছাড়া প্রতিদিন সকালে 'বাসি উঠোনে' শিশুকে ধরে হাঁটানো হত। পুরোনো ঢাকার উর্দুভাষী ধোপারা ঘরের উলটির নিচে শিশুর গলা পর্যন্ত মাটি খুড়ে সেখানে হাতে ধরে শিশুকে দাড় করিয়ে রাখত। সেইসাথে রসুন-সরিষা তেল গরম করে মালিশ করা হত শিশুর পায়ে। ধোপিনীরা শিশুর পায়ে পিঁপড়ার মাটি মালিশ করার সময় বলত- 'মালো বাচ্চাকা পাউমে জোড় আগা'।[১৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

শিশু হাঁটা না শিখলে মানত করা হত এই বলে- 'আমার বাচ্চা যদি গড়গড়্যায়া হাঁটা পারে, তাইলে গড়গড়া দিমু'।[১৭০] শিশু হাঁটা শেখার সাথে সাথে এ মানত পালন করা হত। এই আচার পালনের ক্ষেত্রে এলাকা বিশেষে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠান উৎযাপনের দিন শিশুকে গোসল করিয়ে নতুন পোষাক পরানো হত। এরপর ঘরের উলতির নিচে বসানো হত এবং আশে-পাশের বাড়ির শিশুদের ডেকে আনা হত। ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করত অনেকেই। একটি বা পাঁচটি নতুন কুলায় রাখা গড়গড়া পিঠা, নক্কল, হরেক রকম কাটা ফল শিশুর উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলত। অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত শিশুরা সেগুলি কুড়িয়ে খেত। বড়রাও বাদ যেত না। নানী-দাদীরাতো আঁচল পেতে থাকত। আমোদ-ফূর্তিতে মেতে উঠত সবাই। অতীতে পুরোনো ঢাকার কোথাও শিশুকে উলতির নিচে দাড় করিয়ে কুলায় রাখা সামগ্রি টিনের চালে ঢালা হত। সেগুলি গড়িয়ে নিচে পরলে সবাই মজা করে কুড়িয়ে খেত। পুরোনো ঢাকার কোন কোন স্থানে নতুন শীতলপাটি শিশুর মাথার উপর ধরে গড়গড়া পিঠা, নক্কল, নাড়ু, কলা ইত্যাদি এরমধ্যে ঢেলে দিত।

শিশু হাঁটতে পারলে ফকিরের বাড়ির মেলায় মাটির ঘোড়া দানের মানত করত ঢাকার সাহা'রা। অত্র অঞ্চলে অনেকেই শিশু হাঁটতে শিখলে ক্ষীর বিতরনের মানত করত। শিশুর মা, নানী অথবা দাদী মানত করে বলত- 'থির হোনেসে ক্ষীর দেনে'[১৭১] অথবা 'থির হইলে ক্ষীর দিমু'[১৭২]। শিশু যখন নিজে নিজে দাঁড়াতে শিখে তখন মানত পুরা করতে ক্ষীর রান্না করে পাঠাত আত্মীয-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশিদের বাসায়।

শিশু যখন হাঁটিহাঁটি পা পা তখন সে এক পা দুই পা বাড়াতে গিয়ে পরে যায়। এই কারণে শিশুর কোমরে ঝাঁকি লেগে পায়খানা শুরু হয়। একে দুধের পায়খানা বলা হয়ে থাকে। পায়খানা বন্ধ করতে পোয়া মাছের দাঁত শীলপাটায় ঘষে মায়ের বুকের সাথে মিশিয়ে শিশুকে খাওয়ানো হত।

জন্মদিন:

অতীতে পুরোনো ঢাকায় জন্মদিন পালনের ব্যাপক প্রচলন ছিল না। মুসলমানদের অধিকাংশই জন্মদিন পালনকে গুনাহর কাজ মনে করলেও অভিজাত ধনী পরিবারে সালগিরা বা জন্মদিন পালনের কথা বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

সূত্রে জানা যায়। কাজী কাইউমের ডায়েরিতে নওয়াব সুলিমুল্লাহর বড় পুত্র খাজা হাবিবুল্লাহর জন্মদিন শিলং-এ খুব জাঁকজমকের সঙ্গে উদ্‌যাপনের উল্লেখ রয়েছে। সেই জন্মদিন উৎসবে ইউরোপীয়ান সাহেব, লেডি আর নওয়াব সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ হোলডেন উপস্থিত ছিলেন।[১৭৩] বাইশ সর্দারের প্রধান কাদের সর্দারের স্ত্রী নুরুন্নাহার বিবির স্মৃতিকথায় তার একমাত্র পুত্র মির্জা আব্দুল খালেকের প্রথম জন্মদিন পালনের কথা উল্লেখ করেছেন। তার উল্লেখিত বর্ণনা অনুসারে- 'পুত্র সন্তানের প্রথম জন্মদিন অনেক জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপন করা হয়। খাবারের রকমারীর কথা না-ই বা বললাম। বিভিন্ন এলাকা থেকে ফরমায়েশ দিয়ে আতশবাজি আনা হয়েছিল। আতশবাজির শব্দে সেদিন সমস্ত বাড়ি কেঁপে উঠেছিল। সেখানে এমনও আতশবাজি ছিল, যা আকাশে দিকে উঠে আলোর স্ফুরণে ফুলের ভেতর রানী এলিজাবেথের প্রতিচ্ছবি তৈরি করেছিল। সেইদিন দেশের বরেণ্য ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত মেহমান ছিলেন। তাঁদের মধ্যে নবাব হাসান আসকারি, এ. কে ফজলুল হক প্রমূখ অন্যতম। সেইসময় জন্মদিন উদ্‌যাপনের তেমন প্রচলন না থাকলেও সর্দার সাহেব যত দিন বেঁচে ছিলেন, তত দিন ছেলের জন্মদিন উদ্‌যাপন করেছেন।'[১৭৪] স্বাধীনতা পরবর্তী কালে পুরোনো ঢাকায় জন্মদিন পালনের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। সম্প্রতি উভয় সম্প্রদায়ের ধনী গরীব সকলেই তাদের জ্যেষ্ঠ সন্তান কিংবা পুত্র সন্তানের প্রথম জন্মদিন সামর্থ্যের আলোকে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে থাকে। বিশ শতকের সত্তর দশকের দিকে এ অনুষ্ঠানগুলো বিকেলে কেক কেঁটে বিস্কুট, সমুচা, সিঙ্গারা, চানাচুর, মিষ্টি, চটপটি, পিঠা ইত্যাদি খাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে ঢাকাবাসীর মাঝে এ উপলক্ষে ফাস্টফুডের প্রচলনই (পিজা, চিকেন ফ্রাই, বার্গার) বেশি দেখা যায়। নতুবা পার্টির মাধ্যমে রাতের খাবারের আয়োজনে পরোটা, মাংস, কোরমা, রোস্ট, ডিম, মাছ, সবজি, কেক, মিষ্টান্ন, পুডিং, বিভিন্ন ধরণের ফল অথবা চাইনিজ মেনুর দিকে আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়।[১৭৫] অনেকেই সন্তানদের পরবর্তী জন্মদিবসে ভাল খাবার রান্না করে পরিবারের সবাই মিলে একত্রে খায়। অবস্থাপন্নরা স্বপরিবারে কোন রেষ্টুরেন্ট বা ফার্ট ফুডের দোকানে জন্মদিন উদ্‌যাপন করে থাকে। হিন্দুদের কেউ কেউ সন্তানের জন্মদিনে উপবাস থাকে।

ভাই ফোঁটা:

এই প্রথাটি পুরোনো ঢাকার সাহা, শাঁখারী ও ঋষিদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে, কালি পুজার তৃতীয় দিনে ভায়ের আয়ু কামনা করে ও মৃত্যুদূত রোধ করতে বোনেরা ভায়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে থাকে। বোনের হাতের মধ্যমা ও তর্জনী অঙ্গুলি দিয়ে দুটো চন্দনের

Dhaka University Institutional Repository

ফোঁটা ভায়ের কপালে ঠেকানো হয়। চন্দনের দুই ফোঁটার মাঝে দেয়া হয় আরেকটি কাজলের ফোঁটা। কপালে ফোঁটা ঠেকানোর কালে বোন কর্তৃক মন্ত্র পাঠের নিয়ম- 'ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,

যম দুয়ারে পরল কাঁটা।

যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা,

আমি দিলাম আমার ভাইকে ফোঁটা।'[১৭৬]

কপালে ফোঁটা দেয়ার পর বড় ভাই কর্তৃক ছোট বোনকে উপহার দেয়ার রীতি রয়েছে। তবে ভাই বোনের চেয়ে ছোট হলে বোন ভাইকে উপহার দেয়। বোন যদি ছোট শিশু হয়, তখন মা'য়ের হাত ধরে বোন ভায়ের কপালে ফোঁটা অংকন কালে মা নিজেই মন্ত্র পাঠ করে।

রাখী উৎসব:

ঝুলন পূর্ণিমাতে হিন্দুদের রাখী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি পুরোনো ঢাকার হিন্দুদের মাঝে বোন কর্তৃক ভায়ের হাতে রাখী বাঁধার প্রচলন ঘটেছে। পূর্বে অত্র অঞ্চলে ব্রাক্ষণরা হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে মন্ত্র পড়ে রাখী পরিয়ে দিত।[১৭৭] এর বিনিময়ে শিশুদের বাবা মা রাখীর মূল্য পরিশোধ করত। শাঁখারীরা এ উপলক্ষে নাতনী জামাইকে রূপার তৈরি রাখী উপহার পাঠাত।

হাতে-খড়ি অনুষ্ঠান:

সনাতন ধর্মে বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবী সরস্বতি। সরস্বতি পুজার দিন ব্রাক্ষণ কর্তৃক শিশুদের হাতে খড়ি দেয়ার রীতি সুপ্রাচীন। হাতেখড়ি হল আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুদের লেখাপড়ার সূচনা। মধ্যযুগে ছেলেদের হাতেখড়ি অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায় মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্যে।[১৭৮] বর্তমানে নারীশিক্ষা বিস্তারের ফলে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের হাতেখড়ি দেয়া হয়ে থাকে। এখন তিন-চারবছর বয়সে হাতেখড়ি দেয়া হলেও আরো আগে ছয়-সাতবছর বয়সী শিশুদের হাতেখড়ি দেয়া হত। সরস্বতি পূজা বিভিন্ন মন্দির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও নানানজনের বাড়ি-ঘরে উৎযাপিত হতে দেখা যায়। ঐদিন প্রতুষ্যে শিশুকে হলুদ মেখে গোসল করানো হয়। শিশু নতুন বস্ত্র পরিধান করে বাবা-মায়ের সাথে পূজায় আসে। পুজা শেষে ব্রাক্ষণ ঠাকুর হাতেখড়ি নেয়ার জন্য শিশুদের ডাকেন। তিনি শিশুকে কোলে বসিয়ে তার হাত ধরে বেতের কলম[১৮৯] বা চক দিয়ে কলাপাতা কিংবা পাথরের খাদায় মন্ত্র পড়ে প্রথম অ-আ-ই অক্ষর

Dhaka University Institutional Repository

লেখা শেখান। হাতেখড়ির পর ব্রাহ্মণকে শিশু নমস্কার করলে তিনি শিশুকে মিষ্টিমুখ করেন। এই কাজের জন্য শিশুর বাবা-মা ব্রাহ্মণকে দাক্ষিণ্য দিয়ে থাকে।

বিসমিল্লানে সাবাক:

আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মীয় কেতাব পাঠ শুরু করার অনুষ্ঠানই হল বিসমিল্লানে সাবাক বা বিসমিল্লায় বসানো। মৌলভী-মাওলানাদের দিয়েই শিশুর ধর্মীয় পাঠের সূচনা করার রীতি। এক সময় পুরোনো ঢাকার মুসলমানদের মধ্যে এই প্রথাটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ইদানিং এই প্রথা পালনের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় দেখা যায়। অতীতে সাধারণত মুসলমানদের পবিত্র দিন জুমা বারে দুপুরের পর শিশুকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিসমিল্লার সবকে বসানো হত। ধর্মীয় কেতাব পাঠের শুভ সূচনা উপলক্ষে রান্না করা হত মিঠা ভাত, জর্দা বা ক্ষীর। কেউ কেউ নক্কল, বাতাসা অথবা জিলাপি আনত। অনেকেই এই অনুষ্ঠানে পরিধানের জন্য শিশুকে নতুন বস্ত্র কিনে দিত। সেদিন আশেপাশের বাড়ি থেকে শিশুদের অনুষ্ঠানস্থলে ডেকে আনা হত। মৌলভী সাহেব শিশুকে পাশে বসিয়ে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, রাব্বি জিদনী ইলমা পড়িয়ে আরবি অক্ষর আলিফ-বে-তে পাঠদান করত। পাঠদান শেষে মৌলভী সাহেব কর্তৃক শিশুর মিষ্টিমুখ করানো হত। অনেকে প্রতিবেশীদের বাড়িতে মিঠাভাত, ক্ষীর বা জর্দা পাঠাত।

শিশুর প্রথম রোজা:

পুরোনো ঢাকার মুসলমান পরিবারে তিন-চারবছর বয়সী শিশুদের রোজা রাখার জেদ পূরণ করতে বাবা মায়েরা তাদের দিয়ে 'বোতল রোজা' রাখাত। এভারে পাঁচ-সাতবছর বয়সের শিশুকে প্রকৃতই রোজা রাখার অভ্যাস করানো হত। এক্ষেত্রে বাড়ির বড়দের কাছ থেকে শিশুদের উৎসাহ প্রদানে কোনরূপ কমতি দেখা যায় না। শিশু যেদিন প্রথম রোজা রাখে, সেদিন শিশুর বাবা-মা আত্মীয় স্বজনদের মাঝে যারা বয়স্ক তাদের জন্য ইফতারি প্রেরন করেন। ইফতারে শিশুর পছন্দের সব খাবার রাখা হয়। এছাড়া ইফতারের সময় রোজাদার শিশুর দিকে বাড়ির সবাই বিশেষ মনোযোগ দিয়ে থাকে। শিশুর রোজা সম্পর্কে হাকিম হাবিবুর রহমানের স্মৃতিগ্রন্থ থেকে জানা যায়। তিনি বলেন- 'এখানে ছেলেদের আটবছর, মেয়েদের ছয়বছর বয়স থেকে রোজা রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা হতো। বাচ্চাদের মা খুশি করার জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী প্রথম রোজা পালনের বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের নিকট খবর দেয়া হতো ও সন্ধ্যা পর্যন্ত মহিলা মেহেমানেরা খোঞ্চার পর খোঞ্চা ইফতারি নিয়ে আসতেন। বাচ্চাদের

Dhaka University Institutional Repository

বড় আগ্রহ সহকারে রোজা খোলানো হতো। প্রথমে বাদাম পিষে মিশ্রি মিশিয়ে চাটানো হত। আত্মীয়-স্বজনরা নগদ সালামি দিতেন। কিন্তু মুসলমানেরা আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য এই অনুষ্ঠানিকতাকে এখন বর্জন করে দিয়েছে।'[১৮০]

কান ছেদাই:

পুরোনো ঢাকার মুসলমানরা কন্যা সন্তানের কান ফুড়ানি উপলক্ষে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান উদযাপন করে থাকে। শ্রুতীয়, হযরত ইব্রাহিম (আ:)-এর প্রথম স্ত্রী ঈর্ষান্বিত হয়ে সতিন হাজেরার নাক-কান ফুঁটো করে জঙ্গলী ফুল কারো কারো মতে লোহার অলংকার পরিয়ে দিয়েছিলেন। নাক ও কানে ফুল পরিধানে হাজেরা সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। এরপর থেকে নারীদের কান-নাক ছিদ্র করে অলংকার পরিধানের প্রথা চালু হয়েছে।[১৮১] অতীতে ধনীর কন্যারা কান ছিদ্র করার পূর্বে গোসল করে নববস্ত্র পরিধান করত। দাদি-নানিরা কান-নাক ছিদ্র করতে ব্যবহার করত সোনামূখী সুঁচ আর সূতা। অবস্থাপন্নরা স্বর্ণের সুঁচ অথবা স্বর্ণের কানের রিং দিয়েও কান ছিদ্র করত। এখন ডাক্তার অথবা পার্লারে নাক-কান ফুঁড়ানোর কাজে সাটগানের ব্যবহার দেখা যায়। কান-নাক ফুঁড়ানোর পর পাঁচ-ছয়দিন গরুর মাংস, চিংড়ি মাছ, বেগুন ও টক জাতীয় খাবার খেতে দেয়া হত না। কানের ক্ষত স্থান শুকাতে রান্নার হলুদ-মরিচ কষানো তেল ব্যবহার করা হত।[১৮২] সূতা কাটার পর ধনীর কন্যারা কানে স্বর্ণের রিং পরিধান করলেও অপেক্ষাকৃত দুঃস্থরা পরত শুকনা মরিচের অথবা মশুরির ডালের কাঠি। কান ফুঁড়ানির দিন জর্দা, ক্ষীর অথবা মিঠা ভাত রান্না করে তসতরি ভরে আত্মীয় স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীদের বাড়িতে পাঠানোর রেওয়াজ ছিল। এখনো কান ফুঁড়ানোর আট-দশদিন পর অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানের আগের দিন সন্ধ্যায় গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান আনন্দঘন পরিবেশে উদযাপিত হয়। বিয়ে উৎসবের মতই গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান জমে উঠে ও মেয়েকে প্রতীকী বিয়ের কনে সাজানো হয়ে থাকে।[১৮৩] অতীতে গায়ে হলুদের রাত্রে হিজরা অথবা মেরাসেনরা নাচ-গান পরিবেশন করত। কোন কোন ক্ষেত্রে হিজরা-মেরাসেন না আসলে আন্দর মহলের নারীরা ঢোল ভাড়া করে এনে নিজেরাই সংগীত পরিবেশন করত। জন প্রতি দুটো পরোটা আর বুটের ডাল সহযোগে গরুর মাংসের তরকারি অনুষ্ঠানের দিন সকালে দাওয়াতিদের বাড়িতে নাস্তা পাঠানো হত। বিশেষভাবে সামদিয়ানা বাড়িতে (পুত্র-কন্যার শ্বশুড়ালয়) এর সাথে মিষ্টিও পাঠাত। অনুষ্ঠানে আসার ইচ্ছা থাকলে নিমন্ত্রিত অতিথিরা নাস্তা রেখে দিত। কোন কারণে অনুষ্ঠানে যোগদান করতে না পারলে অপারগতা জানিয়ে তারা নাস্তা ফেরত পাঠাত। নিমন্ত্রাতার পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানস্থলে আমন্ত্রিত অতিথিদের

Dhaka University Institutional Repository

আনার ব্যবস্থা করা হত। অতিথিরা অবশ্য নিজ দায়িত্বে বাসায় ফিরতেন। অতিথিদের আনার জন্য বাড়ি বাড়িতে ঘোড়াগাড়ি পরবর্তীতে রিক্সা প্রেরণ করা হত। দূরের অতিথির গাড়ি ভাড়া পরিশোধ করতে এক দল যুবক বাড়ির সদর দরজায় দাড়িয়ে থাকত।[১৮৪]

মোসলমানি বা সুন্নাতে খাৎনা:

মুসলমান সমাজে ছেলে শিশুর খাৎনা করার প্রচলন আছে। লিঙ্গাগ্রের চর্ম কর্তনকে বলা হয় খাৎনা। এটি মুসলমানদের কাছে সুন্নাত হিসেবে পরিগণিত। মুসলমানরা একে মোসলমানি বলে থাকে। মূলত: ছয়-সাতবছর বয়সে শিশুদের খাৎনা করানো হয়। বিশ শতকের আশি দশক পর্যন্ত হাজ্জাম নামধারি পেশাজীবীরা খাৎনা করার কাজটি ভাল ভাবেই সম্পন্ন করত। এখন অধিকাংশ বাবা মা-ই তাদের শিশুদের খাৎনা অভিজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে করায়। আনজুমান মফিদুল ইসলাম শহরের দু:স্থ শিশুদের বিনা পয়সায় খাৎনা করিয়ে থাকে। অতীতে পুরোনো ঢাকার কোন কোন স্থানে খাৎনার দিন কিংবা তার আগের দিন মৌলভী দিয়ে মিলাদ পরানো হত।[১৮৫] খাৎনার দিন সকালে ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজনরা আসত। খাৎনা করানোর পূর্বে শিশুকে গোসল করানো হত। গোসলের সময় বাড়ির মহিলারা ঢোল বাজিয়ে গান গাইত। আগে ঢাকার কোন কোন স্থানের নিয়মানুযায়ী হাজ্জাম বাড়িতে প্রবেশের পরপরই শিশুর মা তার মাথার চুল লোটার পানিতে ভিজিয়ে খাৎনা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকত। প্রচলিত বিশ্বাস, এর ফলে শিশুর ক্ষত স্থান জ্বালা পোড়া করবে না।[১৮৬] খাৎনা করার পূর্বে হাজ্জাম একখন্ড কাঁচা হলুদ মায়ের একপ্রস্থ চুলে পেঁচিয়ে সেটি শিশুর ডানহাতে বেঁধে দিত। ক্ষত স্থান না শুকানো পর্যন্ত এটি শিশুর হাত থেকে খোলা নিষেধ ছিল। এরপর হাজ্জাম শিশুর কোমরে কালো কাইতন বেঁধে দিত। কোন কোন ক্ষেত্রে শারীরিক অসুবিধার কারণে ডাক্তার দিয়ে খাৎনা করানো হলেও শিশুর পিতা-মাতা হাজ্জামকে ডেকে শিশুর কোমরে কায়তুন পরিয়ে নিত।

শিশুকে একটি জলচৌকিতে বসিয়ে পিছন থেকে পরিবারের কেউ একজন তার পা দুটো চেপে ধরলে হাজ্জাম খাৎনা করত। এরপর ক্ষত স্থানে আগুনে পোড়া কাপড়ের ছাই লাগিয়ে নরম ও পরিষ্কার কাপড় দিয়ে পট্টি বাঁধা হত। খাৎনা সম্পন্নের পরপরই একটি কুলাতে হাজ্জামের জন্য বখশিস তোলা হত শিশুর দাদা, নানা, মামা, চাচাসহ উপস্থিত আত্মীয়দের কাছ থেকে। এর সাথে ঘর থেকেও 'সিধা' দেয়া হত চাল, ডাল, আলু, পেয়াজ। যদিও এসব হাজ্জামের নির্দিষ্ট পারিতোষিক-এর বাইরে ছিল। অতঃপর

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থিত সবার মাঝে মিষ্টি বিতরন করা হত। সবাই আনন্দ উল্লাসের মাঝে একে অপরের গায়ে বাটাহলুদ মাখত ও রং খেলত।

ক্ষত স্থান না শুকানো পর্যন্ত শিশুকে সব রকম ছুতছাওয়া[১৮৭] থেকে রক্ষা করার যথাসাধ্য প্রয়াস চলত। ক্রমাগত তিনদিন শিশুর ক্ষত স্থান পরিষ্কার করতে হাজ্জাম আসত। সুষুম গরম পানির পাত্রে শিশুকে দশ-পনর মিনিট বসিয়ে রাখা হত। ক্ষত স্থান পরিষ্কারের পর পুনরায় পোড়া কাপড়ের ছাই পরবর্তীতে সিবাজল ট্যাবলেটের গুড়া নারিকেল তেলের সাথে মিশিয়ে ক্ষত স্থানে মাখা হত। শেষে নরম কাপড় দিয়ে আবার পট্টি বাঁধা হত। কোথাও কোথাও অবশ্য হাজ্জামের অনুপস্থিতিতে দাদী, নানী অথবা পরিবারের কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই কাজটি বেশ দক্ষতার সাথেই সম্পন্ন করত। পরিবারের বয়স্ক নারীদের পরিধেয় পুরাতন নরম সাদা শাড়ি হলুদ কিংবা কমলা হলুদ রং-এ রাঙ্গিয়ে তিন টুকরা করা হত। ক্ষত না শুকানো পর্যন্ত শিশু এই কাপড়গুলি লুঙ্গির মত করে পরিধান করত।

খাৎনার দিন অথবা তার পরের দিন জর্দা রান্না করা হয়। তশতরিতে জর্দার উপর একটি বড় মিষ্টি দিয়ে পাঠানো হয় আত্মীয় স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবদের বাসায়। যাদের বাড়িতে জর্দা পাঠানো হয়েছে তারা তাদের সময় মত নাস্তা নিয়ে শিশুকে দেখতে আসে। নাস্তার মধ্যে ঘিয়ের পাপড়ি, চানাচুর, মুরগির রোষ্ট, চাঁনরোস, কোফতা, তেলে ভাজা ডিম সেদ্ধ, ফলমূল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কেউ কেউ নাস্তার পরিবর্তে বাচ্চা মুরগি ও ঘি নিত। অতীতে ক্ষত শুকানোর জন্য ঘিয়ের পরোটা ও মুরগির সাদা তরকারি রান্না করে শিশুকে খাওয়ানো হত। মুসলমানির জর্দা-মিষ্টি গ্রহণ কালে আত্মীয়স্বজনরা ধুমধাম[২০১] করবে কিনা তা কৌশলে জেনে নিত। মুসলমানির ধুমধাম-অনুষ্ঠান হলে আত্মীয়স্বজন অল্প কিছু নাস্তা পাঠাত অনেকক্ষেত্রে পাঠাত না। কেউ কেউ নাস্তা পাঠালেও অনুষ্ঠানে যোগ দিত না। তারা মুসলমানীর অনুষ্ঠানে দুইবার খরচের অর্থাৎ উপহার ও নাস্তা দেওয়ার পক্ষপাতি ছিল না।

অতীতে খাৎনা করার পর সপ্তমদিনে শিশুর মাথায় পানি ঢেলে গোসল করানো হত। সেজন্য স্থানীয় মুসলমানরা একে 'মাথায় পানি ' বলে থাকে। সাধারণত মাথায় পানির দিন-ই অনুষ্ঠান করা হত। ইদানিং এই নিয়মের ব্যত্যয় দেখা যায়। অনুষ্ঠানের আগের দিন গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হয়। ধান, দূর্বা, সুপারি, হলুদ বাটা ও মেহেদী বাটা দিয়ে কুলা সজ্জিত করা হয়ে থাকে। সবাই শিশুর কপালে হলুদ ছোঁয়ায়।

Dhaka University Institutional Repository

শিশুর হাতে মেহেদী পরানো হয়। গায়ে হলুদের রাত্রে কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়। অতীতে এই সময় মেরাসেন, হিজরা অথবা অন্দর মহলের মহিলারা সারা রাত ঢোল বাজিয়ে সংগীত পরিবেশন করত। এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে মোহাম্মদ আবদুল কাইউম লিখেছেন- 'মাথায় পানি দেওয়া উপলক্ষে বিশেষ দিনটিতে সকল আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেয়া হত। বৈদ্যুতিক বাতি তখনো আমাদের বাড়িতে আসেনি, অতিথি অভ্যাগতদের জন্য মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য কোনো বাবুর্চিকে ডাকা হয়নি। আমাদের বড়নানী এবং পাড়া প্রতিবেশীর সহায়তায় আম্মাজানই রান্নার যাবতীয় আয়োজন সুসম্পন্ন করেন। ঢাকাবাসীরা এজাতীয় অনুষ্ঠানে গান বাজনার ব্যবস্থা করে থাকে। ভাড়াটে গায়িকা বা মেরাসিন'-দের ডাকা না হলে, লাউডস্পিকারের সাহায্যে 'গ্রামোফোন' বা কলের গান বাজানো হতো। নানীর বিশেষ আগ্রহে আমাদের বাড়িতে এ অনুষ্ঠানে লাউডস্পিকার আনা হয়। সারাদিন ধরে বাজানো হয় হিন্দী এবং কিছু বাংলা গান। শুধু তাই নয়, আমাদের তিন ভাইকে নতুন পোষাকে সাজিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে করে চকবাজার ঘুরিয়ে আনা হয়। ঢাকাবাসীরা এক্ষেত্রে পাগড়ী মাথায় বর-বেশে তাদের ছেলেদের সাজাতো।'[২০২]

অনুষ্ঠানের দিন সকালে শিশুকে হলুদ বাটা মেখে গোসল করিয়ে বরের বেশে সজ্জিত করা হয়। পরিধান করে পানজাবী, পায়জামা, আচকন আর মাথায় পাগড়ি। তার হাতে রাখি বাঁধা হয়। অতীতে শিশুকে ফুল কিংবা চুমকির সেহেরা পরানো হত। অনেকে সখ করে শিশুর গলায় টাকার মালা পরাত। অতি ঘনিষ্ট জনেরা তাকে উপহার দেয় স্বর্ণের বোতাম-গলার চেইন-ঘড়ির বেল্ট-আংটি অথবা স্বর্ণের কারুকার্য করা টুপি ইত্যাদি। অতিথিরা চলে গেলে উপহার সামগ্রি থেকে স্বর্ণের চেইন, ঘড়ি, আংটি পরিয়ে শিশুকে ঘোড়াগাড়ি অথবা ট্যাক্সি গাড়িতে করে ঢাকা শহর ঘুরানো হত। অতীতে অনেকে মানত করত খাৎনা করার পর ছেলে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠলে অনুষ্ঠানের দিন ঘোড়ায় চড়াবে। ঘোড়া গাড়ি ও ট্যাক্সি গাড়ির সম্মুখে ব্যান্ড-পার্টি পুরো চকবাজার একবার ঘুরে আসার নিয়ম। প্রচলিত বিশ্বাস, বিয়ে কিংবা মুসলমানির গাড়ি চকবাজার মসজিদসহ তার আশপাশ ঘুরে আসলে বালা মুসিবত দূর হয়। এজন্য অতীতে কেউ কেউ চকবাজার এলাকা তিন চক্কর পর্যন্ত দিত। অনুষ্ঠান শেষে গায়ে হলুদের ধান, দূর্বা, সুপারি আর রাখি নদীতে নিক্ষেপ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশঃ

১. ব্যক্তিগত ও দলগত সাক্ষাৎকার- সোহাগ বালা, বয়সঃ ৭০, ধোবানী, উমেশ দত্ত রোড।

শ্রীমনি, বয়সঃ৬৫, ধোবানী, উমেশ দত্ত রোড।

পূন্নি বালা দাসি, বয়সঃ ৪৮, ধোবানী, উমেশ দত্ত রোড।

ফুলি বেগম, বয়সঃ ৭৭, গৃহিণী, আমলিগোলা।

২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আরফাননেসা, বয়সঃ ৯০, গৃহিণী, আমলিগোলা।

৩. দলগত সাক্ষাৎকার- সুধারানী সুর, বয়সঃ ৯০, গৃহিণী, শাঁখারী বাজার।

৪.ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- বশিরন, বয়সঃ ৬০, আরবী ওস্তাদমা, আমলিগোলা।

৫. কন্যার শ্বশুড়ালয় থেকে পাঠানো বাজার কন্যার মাকে আত্মীয় স্বজনদের দিয়ে খেতে হত।

৬.ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- বিবি, বয়সঃ ৬৫, গৃহিণী, বালুর ঘাট।

সাকিয়া জামাল, বয়সঃ ৪৫, সেলাই প্রশিক্ষিকা, জগন্নাথ সাহা রোড।

৭. 'আপনাদের দাওয়াত দিয়েছি, আমাদের বউ-এর বাচ্চা হবে।' বশিরন বেগম, প্রাগুক্ত।

৮. বাড়ির গাছের মৌচাকের মধু হতে হবে, কেনা মধু হলে হবে না।

৯. পুরোনো ঢাকার স্থানীয় উর্দু ভাষায় গোদ শব্দের অর্থ কোল আর ভারাই অর্থ ভরণ। এক্ষেত্রে গোদভারাই- এর আভিধানিক অর্থ হল 'ভরা কোল'।

১০. অনুষ্ঠান ত্যাগকালে মিষ্টির খালি বাক্সে অনুষ্ঠানের রান্না করা খাবার অতিথিদের সাথে দিয়ে দেয়া হত।

১১. সন্তান সম্ভবা গোয়ালা নারী পুরুষের জন্য গোদভারাই অনুষ্ঠানের লোকাচারের ব্যবহৃত ফল ভক্ষণ করা নিষেধ। গোয়ালাদের অনেকেই এই ফল পানিতে ভাসিয়ে দেয়।

১২. মোমেন চৌধুরী, (১৯৯৯), *বাংলাদেশের লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান জন্ম ও বিবাহ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ৬৮।

১৩. ঐ প্রাগুক্ত, পৃঃ৬৮।

১৪. ঐ প্রাগুক্ত, পৃঃ৬৮।

১৫. ঐ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭।

১৬. জেমস ওয়াইজ, (১৯৯৯), *পূর্ববঙ্গের জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, দ্বিতীয় খন্ড, অনুবাদ- ফওজল করিম, মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, আইসিবিএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃঃ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- খোতেজা বেগম, বয়সঃ ৮০, গৃহিণী, চৌধুরী বাজার।

১৮. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সুরাইয়া, বয়সঃ ৬৫, গৃহিণী, সেক সাহেব বাজার।

১৯. মোমেন চৌধুরী, পৃ:৭৪।

২০. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আহাম্মদি আক্তার,বয়সঃ ৬৫, সেলাই প্রশিক্ষিকা, বুদ্দুপাড়া আমলিগোলা।

২১. কুমারের চাক পোকার মাটির তৈরি বাসাটির দৈর্ঘ্য প্রায় এক থেকে দেড় ইঞ্চি।

২২. ব্যক্তিগত ও দলগত সাক্ষাৎকার- সাবেরা বেগম, বয়সঃ ৫৬, গৃহিণী, বংশাল।

মাহেলা বেগম, বয়সঃ ৫৩, গৃহিণী, খাজে দেওয়ান।

শাহীন আক্তার, বয়সঃ৪৮, লেখিকা, আমলিগোলা।

তৃপ্তি সাহা, বয়সঃ৩৭, গৃহিণী, বালুরঘাট।

২৩. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- রাশিদা বেগম, বয়সঃ ৬৪, গৃহিণী, ইমামগঞ্জ।

২৪. পুরুষ ও বয়স্ক নারীদের ক্ষেত্রে স্বপ্নে সাপ দেখা কারো সাথে শত্রুতা সৃষ্টির লক্ষণ।

২৫. দলগত সাক্ষাৎকার- গুলশানারা, বয়সঃ ৪৩, সেলাই প্রশিক্ষক, নবাবাগঞ্জ।

ইয়াসমিন বেগম, বয়সঃ ৩২, রান্না প্রশিক্ষক, নবাবগঞ্জ।

সায়মা, বয়সঃ ২৮, শিক্ষিকা, নবাবগঞ্জ।

নাসিমা পারভীন, বয়সঃ ৩৭, চাকুরী, হাজারিবাগ।

রাজিয়া বেগম, বয়সঃ ৬৫, গৃহিণী, লালবাগ।

সাকিয়া জামাল, প্রাগুক্ত।

২৬. ব্যক্তিগত ও দলগত সাক্ষাৎকার- হাসমি বেগম, বয়সঃ ৬০, গৃহিণী, ইসলামপুর।

হাসনা হেনা, বয়সঃ ৪৭, গৃহিণী, সিদ্দিক বাজার।

সাবিনা বেগম, বয়সঃ ৫৪, গৃহিণী, সেকসাহেব বাজার।

আহাম্মদি আক্তার প্রাগুক্ত।

২৭. দলগত সাক্ষাৎকার- আক্তারী বেগম, বয়সঃ ৬৭, গৃহিণী, সেকসাহেব বাজার।

নাঈমা ইকবাল, বয়সঃ ৪৩, গৃহিণী, আমলিগোলা।

সাবিনা বেগম, প্রাগুক্ত।

২৮. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- ফেরদোস জাহান, বয়সঃ ৫৩, গৃহিণী, চুড়িহাট্টা।

Dhaka University Institutional Repository

২৯. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আহাম্মদি আক্তার, সাকিয়া জামাল, প্রাগুক্ত।

৩০. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আনার বেগম, বয়স: ৮৪, গৃহিণী, বংশাল।

রাফিয়া খাতুন, বয়স: ৪৫, গৃহিণী, বংশাল।

৩১. প্রদ্যোত কুমার মাইতি, (১৯৮৮), *বাংলার লোকধর্ম ও উৎসব পরিচিতি*, পূর্বাদি প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ:১৫৯।

৩২. ওয়াকিল আহমদ, (২০০১), *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, গতিধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ: ১২৬।

৩৩. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আশালতা, বয়স: ৭৫, গৃহিণী, পশ্চিম ঋষিপাড়া।

৩৪. 'আমার সন্তান যেন ঠিকমত ভূমিষ্ঠ হয়।' শ্রীমনি, পূর্বোক্ত।

৩৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- জুইমা, বয়স: ৭৫, হিজরা, জগন্নাথ সাহা রোড।

৩৬. সাতোশাতে গোয়ালা স্বামীও গর্ভবতী স্ত্রীর সাথে উপবাস থাকে।

৩৭. দলগত সাক্ষাৎকার- শিলা সাহা, বয়স: ৫৩, গৃহিণী, বালুরঘাট।

সম্পা সাহা, বয়স: ৩৭, গৃহিণী, বালুরঘাট।

তৃপ্তি সাহা, পূর্বোক্ত।

৩৮. ঐ

৩৯. মোমেন চৌধুরী, পৃ: ১০০।

৪০. দলগত সাক্ষাৎকার- লালে বেগম, বয়স: ৭৭, গৃহিণী, বংশাল।

রূপবানু, বয়স: ৭২, গৃহিণী, বংশাল।

৪১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আহাম্মদি আক্তার, পূর্বোক্ত।

৪২.ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- ফিরোজা, বয়স: ৭৫, গৃহিণী, সাতরোজা।

৪৩. ব্যক্তিত সাক্ষাৎকার- ফেরদোস জাহান, পূর্বোক্ত।

৪৪. মোমেন চৌধুরী, পৃ: ১০৪ ।

৪৫. সুস্থিরকরণ অর্থে।

৪৬. জেমস ওয়াইজ, ১ম খন্ড, পৃ: ৭১।

৪৭. ঐ

৪৮. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৪৯. জেমস টেলর, (১৯৭৮), *কোম্পানী আমলে ঢাকা*, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ২৭০-২৭১।

৫০. ঋষিদের মধ্যে সন্তানের জন্ম উপলক্ষে জোকার দেয়ার নিয়ম নাই।

৫১.ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সেলিমা রহমান, বয়সঃ ৬৫, গৃহিণী, উর্দুরোড।

মেহেজাবিন, বয়সঃ ৪১, গৃহিণী, বেচারাম ডেউরি।

বশিরন, সাকিয়া জামাল, আহাম্মদি, পূর্বোক্ত।

৫২. মোমেন চৌধূরী, পৃঃ ১১৩।

৫৩. দলগত সাক্ষাৎকার- সাগরিকা সুর, বয়সঃ ৫১, গৃহিণী, শাঁখারী বাজার।

সানন্দা সুর, বয়সঃ ২৬, ছাত্রী, শাঁখারী বাজার।

সুধারানী সুর, পূর্বোক্ত।

৫৪. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- তোরনী ঘোষ, বয়সঃ ৮০, গৃহিণী, জয়নাগ রোড।

৫৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- তৃপ্তি সাহা, পূর্বোক্ত।

৫৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- হাজেরা বেগম, বয়সঃ ৯০, গৃহিণী, কেরানীগঞ্জ।

৫৭. তিন কাঁটাযুক্ত মাছের মধ্যে আইর মাছ উল্লেখযোগ্য।

৫৮. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আহাম্মদি আক্তার, পূর্বোক্ত।

৫৯. ঐ

৬০. ব্যক্তিগত ও দলগত সাক্ষাৎকার- মেহেরুন্নেসা, বয়সঃ ৮৪, গৃহিণী, হাজারিবাগ।

হানিফা, বয়সঃ ৭০, গৃহিণী, সিদ্দিক বাজার।

আরফাননেসা, প্রমুখ।

৬১. গর্ভবতীকে সাপে কাটে না বলে বিশ্বাস রয়েছে।

৬২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- মোনালিসা মনি, বয়সঃ ৩৩, গৃহিণী, ওয়াইজঘাট।

৬৩. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- হাসমি বেগম, প্রাগুক্ত।

৬৪. দলগত সাক্ষাৎকার- মাহমুদা রহমান মিতু, বয়সঃ ৩৭, গৃহিণী, নবাবগঞ্জ।

বিবি মরিয়ম, বয়সঃ ৫৭, গৃহিণী, চকবাজার।

সেলিনা শাজাহান, বয়সঃ ৩৬, গৃহিণী, নাজিমউদ্দিন রোড।

Dhaka University Institutional Repository

৬৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- বিরেশ চন্দ্র সাহা, বয়স: ৬৬, সভাপতি: মহানগরী সার্বজনিন পূজা কমিটি, বালুরঘাট।

৬৬. জেমস ওয়াইজ, ৩য় খন্ড, পৃ: ৮৪।

৬৭. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ: ৫০-৫১।

৬৮. সায়েম সোলায়মান সম্পাদিত, (২০০৮), *আমার সাত দশক-শিল্পপতি আনোয়ার হোসেনের আত্মজীবনী*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ধানমন্ডি, ঢাকা, পৃ: ১।

৬৯. শ্রী পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, (১৯৯৩), *মনুসংহিতা*, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা, পৃ: ৩৫।

৭০. পুরোহিত ব্রাহ্মণ নবজাতজ ঋষির বাবা মায়ের দেয়া নাম কানের কাছে মন্ত্র পড়ে উচ্চারণ করার সময় লক্ষ্য রাখে যেন নবজাতকের শরীর তার শরীর স্পর্শ করতে না পারে। উপরন্তু অনুষ্ঠান শেষ করে গৃহে ফিরে পরিধেয় পৈতা ত্যাগ করে স্নানের পর নতুন পৈতা ধারণ করে।

৭১. জেমস ওয়াইজ, ৩য় খন্ড, পৃ: ৯১।

৭২. সায়েম সোলায়মান সম্পাদিত, পৃ: ২৪।

৭৩. জেমস ওয়াইজ, ১ম খন্ড, পৃ: ১২৬-১২৭।

৭৪. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সাকিয়া জামাল, প্রাগুক্ত।

৭৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- মাহফুজা আলম, বয়স: ৪৫, গৃহিণী, হাজারিবাগ।
কামালউদ্দিন মালিক, বয়স: ৫৭, শিল্পপতি, উর্দুরোড।

৭৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আনন্দময় সুর, বয়স: ৫৬, শঙ্খ বনিক, শাঁখারী বাজার।

৭৭. ' বাবা আমি তোমার নামে টিকি ধারণ করলাম, যেন আমার/আমার কন্যা/পুত্রবধূর কোল জুড়ে থাকে।' শ্রীমনি, পূর্বোক্ত।

৭৮. ময়দা বা চালের গুড়া, পানি আর হলুদের মিশ্রণ স্থানীয় ধোপা ও গোয়ালাদের কাছে আইপান নামে পরিচিত। আইপান মাখা ডান হাতের ছাপকে আইপানের ছাপ বলা হয়। প্রতিটি আইপানের ছাপে একটি করে সিঁদুরের ফোঁটা থাকে।

৭৯. ধোপারা শিং মাছ ভক্ষণ করে না।

৮০.' বাবা আমি তোমার নামে যে মানত রেখেছিলাম, তা আমি সম্পন্ন করলাম।' -সোহাগবালা, পূর্বোক্ত।

৮১. জেমস ওয়াইজ, ১ম খন্ড, পৃ: ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

৮২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সুফিয়া বেগম, বয়সঃ ৮০, গৃহিণী, লালবাগ।

৮৩. মোমেন চৌধুরী, পৃঃ ১২৯।

৮৪. ঐ

৮৫. জেমস টেলর, পৃঃ ১৯৪-১৯৫।

৮৬. একপ্রস্থ কাপড়ের মাঝখানে গোল করে গলা কেটে খেলকা তৈরি করা হত।

৮৭. আইলা এক বিশেষ ধরণের মৃৎপাত্র। স্থানীয়দের কাছে এটি বোড়শী নামেও পরিচিত। কাঠকয়লা বা গোবরের গইঠা দিয়ে আইলায় আগুন জ্বালানো হয়।

৮৮. আমেতুল খালেক বেগম, (২০১১), *আমার দেখা ঢাকা শহরঃ জীবন পাতার জলছবি*, জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃঃ ৬৫।

৮৯. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- বিবি আয়েশা, বয়সঃ ৯০, গৃহিণী, রহমত গঞ্জ।

৯০. পিতল বা লোহার তৈরি কাজলদানীকে নয়নতারা কিংবা কাজলতারা বলা হয়। ঢাকার উর্দুভাষীরা কাজলদানীকে বলে কাজলটি।

৯১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সালেহা, বয়সঃ ৬০, আয়া, আমলিগোলা।

৯২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- জরিনা বিবি, বয়সঃ ১০০, গৃহিণী, হাজারিবাগ।

৯৩. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- নুরজাহান, বয়সঃ৭০, গৃহিণী, চুড়িহাট্টা।

মাহেলা বেগম, বয়সঃ ৫৪, গৃহিণী, খাজে দেওয়ান।

জাহিদ হোসেন, বয়সঃ ৪৭, চলচিত্র প্রযোজক ও পরিচালক, আমলিগোলা।

৯৪. ব্যক্তিগত ও দলগত সাক্ষাৎকার- নুরুন্নাহার বিবি, বয়সঃ ৭০, মিসেস কাদের সর্দার, ইসলামপুর।

জাহানারা বেবী, বয়সঃ ৪৬, গৃহিণী, ইসলামপুর।

হোসনা বানু, বয়সঃ ৫৮, গৃহিণী, রহমতগঞ্জ।

৯৫. পুরোনো ঢাকায় ভূত-প্রেত ও চোরা ছাড়াতে পারদর্শী ব্যক্তিরা সত্যগুনীন নামে পরিচিত। এককালে প্রকৃত গুণী ব্যক্তি হিসেবে সমাদৃত হতেন। এদের সম্পর্কে নানান মিথ রয়েছে। একটি মিথের ভাষ্য অনুযায়ী কোন নবজাতককে 'চোরা ধরা' থেকে মুক্ত করতে সত্যগুণীন গরম পানিপূর্ণ পাত্রের উপর ধরলে শিশুটি কাকরূপ ধারণ করে উড়ে চলে যায়। সত্যগুণীন তখন ব্যাখ্যা করে নবজাতকটি অনেক আগেই নদী পার হয়ে গেছে। উড়ে যাওয়া শিশুটি প্রকৃতপক্ষে 'চোরা'র একটি রূপ।

৯৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- পেয়ারি বেগম, বয়সঃ ৫৭, গৃহিণী, আগামাছি লেন।

Dhaka University Institutional Repository

৯৭. মোমেন চৌধুরী, পৃঃ ১৩২।

৯৮. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- ফেরদোস জাহান, পূর্বোক্ত।

৯৯. 'পশু, পাখি, গাই গরু, মাছি, পিঁপড়া, ভূত, প্রেত, কাক, কোয়েল এদের সবার নযর বিনষ্ট হোক।' - সোহাগ বালা, পূর্বোক্ত।

১০০. জেমস ওয়াইজ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৭২।

১০১. ঐ , ৩য় খন্ড, পৃঃ১৭১।

১০২. মোমেন চৌধুরী, পৃঃ ১৩২।

১০৩. জেমস ওয়াইজ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৭১।

১০৪. ছটিঘরে সাহা প্রসূতির বেগুন খাওয়া নিষেধ।

১০৫. মোমেন চৌধুরী, পৃঃ ১১৯।

১০৬. দলগত সাক্ষাৎকার- নুরুননাহার, বয়সঃ ৫৩, গৃহিণী, আরমানিটোলা।
খোশনাহার, বয়সঃ ৫৭, গৃহিণী, হাজারিবাগ।
ফাতেমা জাকির, বয়সঃ ৪৩, গৃহিণী, আমলিগোলা।

১০৭. তৎকালীন ঢাকায় জলবসন্ত ও কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিলেও পানিতে দাগ দেয়া হত।

১০৮. কারা এক ধরণের পানীয় বিশেষ। কাঁচাহলুদ, কালিজিরা, আজোয়ান ও আদার রস একত্রে মিশিয়ে ঘিয়ে বাগার দেয়া হয়। এরপর এতে আঁখের গুড় দিয়ে কিছুক্ষণ উনুনে রেখে নামিয়ে ফেলা হয়। এলাকা ও বর্ণভেদে কারা তৈরির উপকরণ ও প্রস্তুত প্রণালীতে ভিন্নতা রয়েছে।

১০৯. জেমস ওয়াইজ, ১ম খন্ড, পৃঃ৭১।

১১০. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- হাফিজা বেগম, বয়সঃ ৪৫, গৃহিণী, ভাট মসজিদ।

১১১. জেমস ওয়াইজ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৭২।

১১২. ঐ পৃঃ ৭১।

১১৩. ঐ পৃঃ ৭২।

১১৪. আঠার মাস পর্যন্ত শিশুকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে গেলে তার জামাকাপড়ের ভেতর ঘোড়ার নাল নেয়া হত।

১১৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সালাউদ্দিন, বয়সঃ ৬৫, ব্যবসায়ি, রাসা বাজার।

Dhaka University Institutional Repository

১১৬. পরবর্তীতে হাসপাতালে প্রসব করানোর প্রচলন শুরু হলে প্রসূতি হাসপাতাল থেকে নবজাতককে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করার সময় তার শরীরের সামনে ও পিছনে ঝাড়ু ছোঁয়ানো হত।

১১৭. জেমস ওয়াইজ, পৃ: ৭১।

১১৮. পুরোনো ঢাকায় নবজাতকের মাকেও ছটিয়ালি বলা হয়।

১১৯. জেমস ওয়াইজ, পৃ: ৭১।

১২০. ষষ্ঠী সন্তানের দেবীরূপে পরিচিতা। লোকবিশ্বাস, তিনিই সমস্ত আপদ-বালাইয়ের হাত থেকে সন্তানকে রক্ষা করেন। -বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, (১৯৯৫), *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলিকাতা, পৃ: ৪২৬।

১২১. ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন- সুমন্ত চন্দ্র দাস,বয়স:৭৬, সভাপতি ও মাতব্বর: পূর্ব ঋষিপাড়া পঞ্চায়েত ও মন্দির কমিটি।

উর্মিলা দাস, বয়স: ৬৭, বৈষ্ণবী, পূর্ব ঋষিপাড়া।

শান্তি, বয়স: ৬৩, গৃহিণী, পূর্ব ঋষিপাড়া।

শনিষ্ট, বযস: ৫৭, গৃহিণী, পূর্ব ঋষিপাড়া, প্রমুখ।

১২২. ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন- রেখা রানি ঘোষ, বয়স: ৬৩, গৃহিণী, কায়েৎটুলি।

শান্তা ঘোষ, ছাত্রী, বয়স: ২০, জয়নাগ রোড।

রুমা ঘোষ, বয়স: ৪৩, গৃহিণী, কায়েৎটুলি।

সঞ্জয় ঘোষ, বয়স: ৩৯, ব্যবসা, জয়নাগ রোড।

দেব নারায়ণ ঘোষ, বয়স: ৫৯, ব্যবসা, জয়নাগ রোড।

তোরনী ঘোষ, প্রমুখ।

১২৩. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আঙ্গুরী বেগম, বয়স: ৬৫, গৃহিণী, আমলিগোলা।

১২৪. মোমেন চৌধুরী, পৃ: ১২১।

১২৫. জেমস ওয়াইজ, ৩য় খন্ড, পৃ: ১৫৬।

১২৬. ঐ পৃ: ১২১।

১২৭. ঐ পৃ: ১৬৭।

১২৮. ঐ পৃ: ৬১।

১২৯. ঐ পৃ: ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৩০. ঐ পৃঃ ১৫৫।

১৩১. ঐ পৃঃ ১৬০।

১৩২. ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন- নরেশ, বয়সঃ ৬২, ধোপা, উমেশ দত্ত রোড।

শিবলাল চক্রবর্তী, বয়সঃ ৫৫, ধোপা, উমেশ দত্ত রোড।

নেপাল বাবু, বয়সঃ ৭০, ধোপা, উমেশ দত্ত রোড।

রুমা, বয়সঃ ৪৮, ধোবানী, উমেশ দত্ত রোড।

পূন্নি বালা দাসি, সোহাগ বালা, শ্রীমনি, প্রমুখ।

১৩৩. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- মনিরালা, বয়সঃ ৫৭, গৃহিণী, ওয়াইজঘাট।

১৩৪. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আঙ্গুরি বিবি, বয়সঃ ৮০, গৃহিণী, নবাবগঞ্জ।

১৩৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আরফাননেছা, পূর্বোক্ত।

১৩৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- বশিরন, পূর্বোক্ত।

১৩৭. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সাকিয়া জামাল, পূর্বোক্ত।

১৩৮. পূর্বকালে পুরোনো ঢাকার নারীরা তাদের মাথার চুল রিঠাবীচি, সরিষার খইল বা তেতুল গাছের ছাই দিয়ে পরিষ্কার করত।

১৩৯. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আয়মননেছা, বয়সঃ ১০০, গৃহিণী, আমলিগোলা।

বিবি আয়শা, জরিনা বিবি, পূর্বোক্ত।

১৪০. 'ময়দানের মাটি, কুমারের চাক। মোহাম্মদের কলেমাতে আমার দেহ হল পাক।' - মেহেরুন্নেসা, প্রাগুপ্ত।

১৪১. শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্ সুবহানাহুতায়ালাকে এই অর্থে সালাম প্রদান করার সমর্থন করে না।

১৪২. 'আল্লাহ্ পাক আমার দেহকে পবিত্র করে দাও। আমার নামাজ কবুল করে নিও।' -বশিরন পূর্বোক্ত।

১৪৩. 'চন্দ্র-সূর্য্য, আসমান-জমিন, হাওয়া-বাতাস সবাই সাক্ষি থেকো আমি শরীর পবিত্র করলাম।'- ঐ।

১৪৪. 'কোলে মানিক, আকাশের চাঁদ। আসসালামু আলাইকুম উয়া রাহামাতুল্লাহি উয়া বারকাতুহু।'- মেহেরুন্নেসা, প্রাগুক্ত।

১৪৫. জেমস ওয়াইজ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

১৪৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- রুমা দাস, বয়স: ৫২, ধোবানী, ঢাকেশ্বরী।

১৪৭. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- তোরনী ঘোষ, প্রাগুক্ত।

১৪৮.স্থানীয় মুসলমানদের বিশ্বাস মতে, পানির মালিক খজখিজির (আ:) স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে পানিতে বসবাস করেন। সেকান্দার বাদশা যেরূপ জমির খেরাজ (খাজনা) নিতেন, ঠিক তেমনি খজখিজির (আ:)-ও পানির খাজনা নিয়ে থাকেন। পরিবার পরিজনের সাথে জীবন ধারণের জন্য তিনি মানুষের সাহায্য কামনা করেন। সেই কারণে তার উদ্দেশ্যে পয়সা, লবন, খাদ্য ইত্যাদি পানিতে ভোগ দেয়ার নিয়ম।

১৪৯. মুহাম্মদ আবদুর রহিম, (১৯৮২), *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ: ২০৭।

১৫০. অনুপম হায়াৎ, (২০০১), *নবাব পরিবারের ডায়েরিতে ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ চট্টগ্রাম-ঢাকা, পৃ:৭৭।

১৫১. দলগত সাক্ষাৎকার- শান্তি রানি, বয়স: ৪৮, গৃহিণী, পূর্ব ঋষিপাড়া।

কল্পনা রানি, বয়স: ৪৩, গৃহিণী, পশ্চিম ঋষিপাড়া।

১৫২. জেমস ওয়াইজ, ৩য় খন্ড, পৃ: ১৭১।

১৫৩. ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন- সুমন্ত চন্দ্র দাস, উর্মিলা দাস, শান্তি, শনিষ্ট, প্রমুখ।

১৫৪. ঐ

১৫৫. ঐ

১৫৬. শায়লা পারভীন, সাক্ষাৎকার, অন্তর্ভূক্ত: *ঢাকা ত্রৈমাসিক*, ঢাকার স্মৃতি সংখ্যা, মোহাম্মদ আসাদ সম্পাদিত, ১ম বর্ষ, জুলাই ২০০৮, ঢাকা হেরিটেজ, পৃ: ১১২।

১৫৭. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধায় সম্পাদনা ও অনুবাদ, (২০০৪), *মনুসংহিতা*, সদেশ, কোলকাতা, পৃ: ২৭।

১৫৮. দলগত সাক্ষাৎকার- বিদ্যুত কুমার নাগ, বয়স:৫১, মালিক: কল্পনা বোডিং ও হোটেল, শাঁখারী বাজার।

রতন মালা নাগ, বয়স: ৭৬, গৃহিণী, শাঁখারী বাজার।

আনন্দময় সুর, বয়স: ৫৭, শঙ্খবনিক, শাঁখারী বাজার।

১৫৯. সাহা নারীদের অনেকের ধারণা মতে, আগুনের তাপে গরম করা পানি দিয়ে নবজাতককে গোসল করালে তার স্বাস্থ্যহানী ঘটে। সেজন্য নবজাতককে রৌদ্রতাপে গরম করা পানি দিয়ে গোসল করানো হয়।

১৬০. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সুমিত্রা, বয়স: ৫৮, গৃহিণী, নগরবেল তলী লেন।

১৬১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- বিরেশ চন্দ্র সাহা, পূর্বোক্ত।

১৬২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সোনাবানু, বয়সঃ ৭৪, গৃহিণী, মৌলভী বাজার।

সুলতানারা, বয়সঃ ৭৫, গৃহিণী, মৌলভী বাজার।

রাশিদা খাতুন, বয়সঃ ৭৩, গৃহিণী, পোস্তা।

আয়মননেছা, আরফাননেসা, বশিরন প্রমুখ।

১৬৩. মোমেন চৌধুরী, পৃঃ ১৩৮।

সুধারানী সুর, পূর্বোক্ত।

১৬৪. শায়লা পারভীন, (২০১০), '*ঢাকাই প্রবাদ-প্রবচন*', অন্তর্ভূক্তঃ *ঢাকাই উপভাষা প্রবাদ-প্রবচন কৌতুক ছড়া*, ফিরোজা ইয়াসমিন সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, নিমতলী, ঢাকা, পৃঃ ২৪৪।

১৬৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- বিবি আয়েশা, জরিনা বিবি, বশিরন, সাকিয়া, হাসমি বেগম, হাসনা হেনা, পূর্বোক্ত।

১৬৬. মোমেন চৌধুরী, পৃঃ ১৩৮।

সুধারানী সুর, পূর্বোক্ত।

১৬৭.ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আলাউদ্দিন মালিক, বয়সঃ ৫৪, শিল্পপতি, উর্দুরোড।

১৬৮. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- বশিরন, পূর্বোক্ত।

১৬৯. 'মালিশ করো, বাচ্চার পায়ে শক্তি আসবে।' -সোহাগবালা, পূর্বোক্ত।

১৭০. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- শাবনাম, বয়সঃ ৭২, গৃহিণী, রাসা বাজার।

১৭১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- হাসনা হেনা, পূর্বোক্ত।

১৭২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সমিরন, বয়সঃ ৫৭, গৃহিণী, ভাট মসজিদ।

১৭৩. অনুপম হায়াৎ, পৃঃ ১০।

১৭৪. শায়লা পারভীন, সাক্ষাৎকার, *ঢাকা ত্রৈমাসিক*, পৃঃ ১৮৬।

১৭৫. গাজী রুমানা রহমান ও সোনিয়া বেগম, (২০১০), '*ঢাকার সামাজিক উৎসবের খাবার*', অন্তর্ভূক্তঃ *ঢাকাই খাবার*, হাবিবা খাতুন ও হাফিজা খাতুন সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, নিমতলী, ঢাকা, পৃঃ ১৫৫।

১৭৬. দলগত সাক্ষাৎকার- সায়ান সুর, বয়সঃ ২৩, ছাত্র, শাঁখারী বাজার।

Dhaka University Institutional Repository

সানন্দা সুর ঝিলিক, বয়সঃ ২৬, ছাত্রী, শাঁখারী বাজার।

১৭৭. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকা- নারায়ণ শর্মা, বয়সঃ ৭৮, পুরোহিত ব্রাহ্মণ, জগন্নাথ সাহা রোড।

১৭৮. প্রদ্যোত কুমার মাইতি, পৃঃ ১৬৭-১৬৮।

১৭৯. বেতের তৈরি কলম ও মাটির দোয়াতের কালি দিয়ে কলাপাতায় অক্ষর লেখা হয়ে থাকে। দোয়াতের কৌটার উপর সিঁদুর চর্চিত একটি বরই রাখা হয়।

১৮০. হাকীম হাবীবুর রহমান, (১৯৯৫), *ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে*, অনুবাদ- হাশেম সূফি, ঢাকা ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, পৃঃ ৪২।

১৮১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আফসানি বেগম, বয়সঃ ৯৫, গৃহিণী, রহমতগঞ্জ।

মনজুরুল আলম, বয়সঃ ৬৫, চাকুরী, উর্দুরোড।

সেলিমা রহমান, পূর্বোক্ত।

১৮২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- পিয়ারি বেগম, বয়সঃ ৭৫, গৃহিণী, চুড়িহাট্টা।

১৮৩. রফিকুল ইসলাম রফিক, (২০০৮), *ঢাকায় বিনোদন*, বর্তমান সময়, বাংলা বাজার, ঢাকা, পৃঃ ৭০।

১৮৪. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- নাজির হোসেন নাজির, বয়সঃ ৭০, মাজেদ সর্দারের ছেলে, নাজিরা বাজার।

১৮৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- মাহেবুর, বয়সঃ ৭৬, ব্যবসা, বেগম বাজার।

হেলেন সরকার, বয়সঃ ৫২, শিক্ষিকা, আমলিগোলা।

১৮৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- বশিরন, প্রাগুক্ত।

১৮৭. অপবিত্র শরীরের ছায়া।

১৮৮. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, (২০০৮), *ঢাকার ইতিবৃত্ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি*, গতিধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃঃ১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বিবাহ

সভ্যতার প্রারম্ভেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করে। সমাজের একক পরিবার আর পরিবারেই গড়ে উঠে সমাজের নেতৃত্ব। এ কারণে সভ্য সমাজ তার পরিবার গঠন ও প্রকৃতিকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়ভাবে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে। পরিবারেই যেহেতু গড়ে উঠে নেতৃত্ব সে কারণে নতুন প্রজন্মের পরিচয় নির্ধারণও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। এ সকল চাহিদাকে পূরণ করতে এবং প্রাকৃতিকভাবে নর-নারীর স্বাভাবিক আকর্ষণকে স্বীকৃতি দিতেই সম্ভবত 'বিয়ে' সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতার সৃষ্টি হয়েছিল। একে আনুষ্ঠানিক বলা হচ্ছে এ কারণেই বিয়ের ধারণার বহু আগেই নর-নারী মিলিত হয়েছে, মানব জন্মধারা বজায় রেখেছে। কিন্তু কালক্রমে সমাজ, ধর্ম এমনকি অর্থনৈতিক কারণেও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিয়ের বিধান তৈরি করেছে। এই বিধান কালক্রমে প্রতিটি সমাজের সংস্কৃতিকে একটি শক্তিশালী অনুষঙ্গ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সংস্কৃতির বিবর্তন ও গঠনে রেখেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আমাদের আলোচ্য গবেষণায় উনিশ ও বিশ শতকের ঢাকায় বিয়ে সংক্রান্ত ধারণাটি উভয় ধর্মেই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠেছে।

বিবাহ সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস:

অনুঢ়া রান্নাঘরে তরিতরকারি কুটলে, তার শরীরে কুলার বাতাস লাগলে এবং কেউ তাকে একগালে চড় মারলে বিয়ে হয় না। কোন বর/কনেকে বিয়ের দিন গোসল করানোর সময় গোসলের পরিত্যক্ত পানি যদি অবিবহিত কোন ছেলে বা মেয়ের পায়ে ছোঁয়া লাগে তবে তাদের বিয়ে হবে না। অন্যদিকে, কালো পিঁপড়ার দলকে মুখে ডিম নিয়ে সারিবদ্ধভাবে বাড়ির কোথাও চলতে দেখা গেলে, সে বাড়ীর অবিবহিত পুত্র কন্যার বিয়ে আসন্ন বলে ধারণা।[১] স্থান বিশেষে অনেকে এ ঘটনাকে বৃষ্টি হওয়ার লক্ষণ ধরে নেয়।[২] জলন্ত উনুনের গায়ে ও হাঁড়িতে 'আগুনের মিছিল' (ফুলকি) দৃশ্যমান হলে সে বাড়ির বিবাহ উপযুক্ত ছেলে মেয়ের বিয়ের ইঙ্গিত বহন করে। অবিবাহিত ছেলে মেয়েদের শরীরে প্রজাপতি বসলে অথবা মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেলে তিনমাসের মধ্যেই বিয়ে হয় বলে ধারণা রয়েছে। বাড়ির ছাদে যদি দুই কাক একত্রে বসে 'ঠোকরাঠুকরি' করে তাহলে পুত্র কন্যার বিয়ে হয় বলে বিশ্বাস প্রচলিত। আমাবশ্যা বা পূর্ণিমার রাতে আইবুড়ো মেয়েকে ঘরের বাইরে ডেকে এনে, কারণ না জানিয়ে তার গায়ে পানি ঢেলে দিলে শীঘ্রই তার বিয়ে হয়ে যায়। অনেক সময় বিয়ের কুলায় রক্ষিত কলা আইবুড়ো মেয়েদের খেতে দেয়া হয়, ধারণা

Dhaka University Institutional Repository

শীঘ্রই তার বিয়ে হবে।[৩] তবে কারো কারো বিশ্বাস, এই কলা অবিবাহিত মেয়েদের বিয়ে হওয়ার জন্য নিষিদ্ধ।[৪] গায়েহলুদের অনুষ্ঠানে কোন কুমারী মেয়ে যদি বরের কপালে হলুদ ছোঁয়ায় তবে দ্রুত তার বিয়ে হয়। মেয়ের যেন দ্রুত 'জোড়া মিলে যায়', সে উদ্দেশ্যে বাবা মা তাদের মেয়েসহ মাজারে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে সেখানে জোড়া মোমবাতি জ্বালায়। পুরোনো ঢাকার নবাবগঞ্জ পার্ক অঞ্চলের গোলাম শাসাব এর পুত্র আইবুড়ো মেয়েদের বিয়ের জন্য এখনও পিতার মতই তাবিজ, চিরুনিপড়া, পাতাপড়া দিয়ে থাকেন। তার দেয়া তাবিজ বাহুতে বাঁধলে, চিরুনিপড়া দিয়ে নিয়মিত চিরুনি করলে ও ভিন্ন সাত গাছের সাতটি পাতাপড়া পানিতে ভিজিয়ে সেই পানিতে স্নান করলে শীঘ্রই বিয়ে হয় বলে বিশ্বাস।[৫]

অনেক মায়েরা কন্যার বিয়ের জন্য মানত করে বাড়িতে সাত বিবির কাহিনী পড়ায়। সাত বিবির কাহিনীর খতম শেষে শিরণীর লাড্ডু অনূঢ়াকে খাওয়ানোর রীতি।[৬] উপযুক্ত সময়ে বিয়ের জন্য বাবা মা তাদের কুমারী কন্যাকে দিয়ে মহরম-মিছিলে দুলদুল ঘোড়ার দড়ি ধরায়। মহরম মাসের ছয় তারিখে হোসেনীদালানে সন্ধ্যার পর দুই পাঞ্জায় 'ক্যাচ লাগানো' হয়। অভিভাবকরা হোসেনীদালানের ক্যাচের লাড্ডু তাদের অবিবহিত পুত্র কন্যাদের বিয়ের জন্য মানত করে খাওয়ায়। মানত পুরা হলে পরের বছর ক্যাচে লাড্ডু দেয়ার নিয়ম। মহরম মাসের সাত তারিখে অনেকেই তাদের কুমারী মেয়েদের ব্যবহারের জন্য হোসেনীদালান থেকে হলুদ ও মেহেদী বাটা নিয়ে আসে। আর এই হলুদ ও মেহেদী বাটা কুমারীকে কোন সধবা নারীজন পরিয়ে দিলে তার তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায়। এছাড়াও বিবাহ উপযুক্ত পুত্র ও কন্যার বিয়ে বা জোড়া মিলে যাবার উদ্দেশ্যে মহরমের সময়ে হোসেনীদালানে ইমাম হোসেন ও ইমাম হাসানের প্রতীকী কবরে জোড়া ফুলের মালা চড়ানো হয়। হিন্দু মায়েরা পুত্র কন্যার বিয়ের মানত করে মনসা পূজা দিয়ে থাকে।[৭]

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়াঃ

দুটি পরিবারের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা আত্মীয়তার সূত্রপাত ঘটে। এ সম্পর্ক তৈরির প্রক্রিয়াকে ঘটকালি বলা হয়। ঘটকালির সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা ঘটক নামে পরিচিত। পুরোনো ঢাকার মুসলমান পরিবারে পেশাদার মহিলা ঘটকের মারফতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের রেওয়াজ আছে। শিল্পপতি আনোয়র হোসেন তার আত্মজীবনীতে পুরোনো ঢাকার মহিলা ঘটকের পরিচয় দিয়েছেন- 'এত পর্দানশীন, রক্ষণশীল মেয়েদের দেখার জন্য যে-কোন বাড়িতে যখন-খুশি-তখন ঢুকে পড়তে পারত

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা ঘটকরা এককালে, কারও অনুমতি নেয়ার ধার ধারত না। আগের দিনে সাধারণত মহিলারাই ঘটক হতো, ঢাকাইয়া ভাষায় ওদেরকে "মোতাসা" বলতাম আমরা। এদের বেশ দাপট ছিল পাত্র-পাত্রীর বাড়িতে। বিয়ের কাজ লাগানোর আগেই বলে রাখত কানের দুল, শাড়ি বা গলার চেইন দিতে হবে। দু'পক্ষের মধ্যে যখন খাবারের আদানপ্রদান হতো, তখন ওকে কতখানি দিতে হবে সে-ব্যাপারে "করাল" মানে ওয়াদা করিয়ে নিত। নিজের ভাগ যাতে বেশি হয় সেজন্য বেশি বেশি "ডালা" দিতে বলত।[৮]

পুরোনো ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়েতে আত্মীয় স্বজনরাই মূলতঃ মধ্যস্থতা করে থাকে। অতীতে সাহাদের পুত্র-কন্যা বিয়ের ঘটকালির ক্ষেত্রে আত্মীয়দের চাইতে ব্রাহ্মণের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। ধর্মীয় কারণে বিভিন্ন বাড়িতে তাঁর যাতায়াত ছিল। সে জানত কার বাড়ির ছেলে মেয়েরা বিবাহ উপযুক্ত হয়েছে। তাছাড়া সেসময় ব্রাহ্মণকে সবাই অনেক শ্রদ্ধা করত। তখন অনেকেই তাদের অবিবাহিত পুত্র কন্যার বিবাহের জন্য ব্রাহ্মণকে ঘটকালি করতে বলত। সম্প্রতি হিন্দুদের কোন কোন বর্ণ যেমন, গোয়ালাদের অধিকাংশ পরিবার ইন্ডিয়ায় অভিবাসন করার ফলে বর্তমান তাদের মধ্যে অনেকেই বাধ্য হয়ে ধোপা, নাপিত, ডোম বাদে মোটামুটি চলনসই জাতের সাথে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করছে।[৯] ধোপারা তাদের পুত্রের জন্য জ্ঞাতি ভাইয়ের কারো মেয়েকে পছন্দ হলে নিজ মেয়ের জামাইকে দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়।

শাঁখারী বর্ণে গোত্রীয় প্রথা বিদ্যমান। শাঁখারীদের উল্লেখযোগ্য গোত্রগুলি হল নাগ, সুর, সেন, নন্দী, রক্ষী। পূর্বকালে শাঁখারীদের মধ্যে স্বগোত্রীয় বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল। এখন নিজ গোত্রে বিয়ে হলেও রক্ত সম্পর্কীয়দের মাঝে বিয়ে হয় না।[১০] জেমস ওয়াইজের তথ্যানুসারে, উনিশ শতকে হিন্দুস্তানী তাম্বুলিরা বাঙালি তাম্বুলিদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিল না বলে বিয়ের জন্য তারা বর্ধমান থেকে কনে আনত।[১১] তবে ঢাকার তৈলপার ও তেলিদের মধ্যে বিয়ে হত।[১২] তিয়ারদের মধ্যে তিনটি সামাজিক স্তর স্বীকৃত ছিল। সবচেয়ে নিচের শ্রেণীর লোকেরা উপরের শ্রেণীতে বিয়ে করতে পারত, তবে সেজন্যে মোটা অঙ্কের টাকা মেয়ের বাবাকে দিতে হত। তাই উচ্চ শ্রেণীর চাইতে এদের মধ্যে মেয়েদের গুরুত্ব বেশি ছিল।[১৩] প্রতিবছর বেদেদের সবগুলি বহর এক স্থানে মিলিত হলে তারা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ছেলে মেয়েদের বিয়েশাদী করাত।[১৪] মুসলমান তাঁতীদের 'কওম' জোলাদের থেকে স্বতন্ত্র থাকায় এরা একত্রে খাওয়াদাওয়া করলেও বৈবাহিক সম্পর্ক করত না।[১৫] মাহি ফরোশদের সমাজ খুবই অন্তর্মুখী

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। এরা বৈবাহিক সম্পর্ক নিজেদের মধ্যে করত। তাদের মধ্যে কেউ বাইরে বিয়ে করলে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হত।[১৬]

কনে দেখা অনুষ্ঠান পিতৃতান্ত্রিক বাঙ্গালি সমাজের একটি প্রাচীন প্রথা। এই অনুষ্ঠানে বরপক্ষ বিয়ের জন্য কনে নির্বাচন করে। পুরোনো ঢাকার আদিবাসী সমাজে কনে দেখার পর তার হাতে টাকা দেওয়ার রেওয়াজ আছে। কনে পছন্দের পাত্রী হলে ধনীদের কেউ কেউ প্রথম দেখাতেই স্বর্ণালংকার উপহার দেয়। বিয়ে না হলে অবশ্যই স্বর্ণালংকার ফেরৎ দেয়ার নিয়ম। কনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে দৈহিক সৌন্দর্য্য, পিতার আর্থ-সামাজিক অবস্থান, কনেপক্ষের আপ্যায়ন ইত্যাদি বিচার্যের পাশাপাশি কনের শুভ-অশুভ নির্দেশক কিছু দৈহিক লক্ষণকে স্বীকৃতি দেয়া হত। নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

ক. কোন মেয়ের চুলের আগা সাপের ফনার মত বাঁকা হয়, তা খাগুইর‍্যা, নাগিনী কিংবা স্বর্প চুল নামে পরিচিত। কনের এই জাতীয় চুল অশুভ লক্ষণযুক্ত। যদি স্ত্রী এরূপ চুলের অধিকারী হয়, সেই চুল রাতের বেলায় সাপরূপে স্বামীর নাক দিয়ে দেহে প্রবেশ করে শরীরের রক্ত শুষে নেয়। ফলে স্বামীর অসুখ বিসুখ সবসময় লেগেই থাকে। এই নারীর সংসার 'উজায় না' অর্থাৎ সংসারে অভাব অনটন দেখা দেয়।

খ. ঠোঁট কালো মেয়েদের কালঠুটি বলা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস মতে, এরা চোগলখোর। এদের চোগলখোরীর কারণে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হয়। কালঠুটি কাউকে অভিশাপ দিলে অতিদ্রুত অভিসম্পাত ঘটে।

গ. চিরল দাঁত বা কাঙ্গোই[১৭] দাঁতের কনেরা অলক্ষি।

ঘ. যে মেয়ের চুল বেড়ে কাঁধ পর্যন্ত এসে থেমে যায়, সে চুলকে রাক্ষস-চুল বলা হয়। বিয়ের পর এই মেয়ের স্বামী দ্রুত মারা যায়।

ঙ. 'জোট ভোমরা' (জোড়া ভ্রূ) অশুভ লক্ষণযুক্ত।

চ. বিলাইচোখীরা (বিড়ালের চোখের মনির মত দেখতে) ঝগড়াটে ও অলক্ষি হয়।

ছ. 'দন্তের উপর দন্ত, কথার নাই অন্ত'- যে সকল নারীর দাঁতের উপর দাঁত, তারা অতি কথা বলে।[১৮] স্থান বিশেষে এইরূপ 'কিরিবিরি' দাঁতের অধিকারীকরা সকলেরই পছন্দের পাত্রী বলে বিবেচিত।[১৯]

জ. গাল হাসলে (গালে টোল পরা) দুশ্চরিত্রা ও স্থান বিশেষে বৈধব্যর লক্ষণ মনে করা হয়।

ঝ. হিন্দুদের মাঝে যে কনের কোমর পর্যন্ত মাথার চুল, তারা বর পক্ষের জন্য অপছন্দের পাত্রী। এইরূপ চুল সীতার ছিল। সীতার দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

ঞ. কনের হাতের তালুর রেখা কম থাকা ভাল লক্ষণ নয়।

ট. যে মেয়ের 'হাঁ বড়' অর্থাৎ ঠোট দীর্ঘ, সে স্বামী 'খায়' অর্থাৎ এটি বৈধব্যর লক্ষণ।

ঠ. কনের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল তার পাশের আঙ্গুল অপেক্ষা যদি ছোট হয়, সে তার স্বামীর উপর সবসময় প্রভাব বিস্তার করতে চায়।

ড. হরিণচোখীরা (টানাটানা চোখ বা হরিণানয়ন) অনেক ধূর্ত ও চালাক হয়।

ঢ. হরিণ কানের (লম্বা ও খাড়া কান) মেয়েরা দূর থেকে অপরের কথা শুনতে পায়। তারা একজনের কথা অন্যজনকে বলে সংসারে ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি করে থাকে।

ণ. যেসকল মেয়ের হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত গড়ন-গঠন সমান থাকে, তাদেরকে হস্তীপাইয়া বলা হয়। এই নারীর সংসারে আর্থিক সমৃদ্ধি আসে না।

ত. নারীর খরমপায়া বৈধব্যর লক্ষণ।

থ. ব্যক্তি বিশেষের মাথার চুলে দুইগোল্লা দেখা দিলে, তাদের দুইবিয়ের লক্ষণ বুঝায়।

দ. হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের মাথা অনামিকার সর্বোচ্চ রেখা অতিক্রান্ত করলে, সেই পাত্রপাত্রীরা 'নরগন' বলে পরিচিত। এই সর্বোচ্চ রেখা যদি আঙ্গুলের অগ্রভাগের বরাবর হয়, তবে তারা 'দেবগন'। আর রেখার নীচে কনিষ্ঠ আঙ্গুলের অগ্রভাগ থাকলে তাদেরকে বলা হয় 'রাক্ষসগন'। নরগন ও দেবগন পাত্রপাত্রীর মধ্যে বিয়ে মঙ্গলজনক। আর এদের সাথে রাক্ষসগন পাত্রপাত্রীর বিয়ে হলে অমঙ্গল হয়।

ধ. কনের বামহাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুলের নীচের দিকে বিয়ে ও সন্তান রেখা থাকে। দুটি রেখা থাকলে দ্বিতীয় বিয়ের লক্ষণ বুঝায়।

ন. যে নারীর চুলের আগা ফেটে যায় তার স্বামীর সংসারে আর্থিক সমৃদ্ধি আসে না।

প. কনের বামহাতের সকল আঙ্গুলের অগ্রভাগের তালুতে গোল বা চক্রাকারে রেখা থাকা সুলক্ষণযুক্ত। অন্যদিকে, যে নারীর হাতে এইরূপ রেখা থাকে না তার সংসার-জীবন সুখের হয় না।

ফ. কনের একটি চোখ অন্যটির অপেক্ষা কিছুটা ছোট থাকলে সেটি ফরিদা চোখ নামে পরিচিত। ফরিদা চোখের নারীরা কিসমতয়ালি (ভাগ্যবতী)।

ব. কালো বর্ণের কনেরা অনেকেরই পছন্দের পাত্রী ছিল বলে ঢাকার প্রচলিত প্রবাদ থেকে জানা যায়-

'কালা কালা কাজলের মাটি,
তার লিগা ছয় মাস হাঁটি।
গাঙ্গের পানি ঘোলাও বালা,

Dhaka University Institutional Repository

কালা বউ দেখতেও বালা।'[২০]

ভ. যে সকল কনের হাতে আঙ্গুল লম্বা আর চিকন, তাদের বিয়ের পর স্বামীর সংসারে আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটে।

পাত্র পছন্দের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণ হিন্দুরা পাত্রের বংশ পরিচয়কে অধিক গুরুত্ব দিত। অভিজাত মুসলমান সমাজেও বিয়ের আগে পাত্র ও পাত্রীর 'কুর্‌সী নামা' (বংশ পরিচয়) উভয় পক্ষই গ্রহণ করত। পাত্রের বিদ্যা বা কর্মদক্ষতার চাইতে এই পরিচয় অধিক প্রয়োজনীয় ছিল।[২১] শাঁখারীরা পাত্রের বাপ দাদার সুনামের পাশাপাশি তার শাঁখার কাজের দক্ষতা যাচাই করে দেখে।

বাতপাক্কাঃ

বর-কনে উভয়পক্ষ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে সম্মত হলে তাদের মুরুব্বিদের নিয়ে বিয়ের কথাবার্তা চুড়ান্ত করনের উদ্দেশ্যে কনের বাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে মিলিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি স্থানীয় মুসলমানদের কাছে 'বাতপাক্কা', 'হাতপান, বা 'আতপান' নামে পরিচিত। শাঁখারীরা 'জোকার', গোয়ালারা 'পাঁচ আদমী' আর সাহা'রা 'পাকাকথা' বলে থাকে। জনৈক গবেষক স্থানীয় মুসলমানদের বাতপাক্কা বা হাতপানের বর্ণনায় লিখেছেন- 'ঢাকার আদিবাসী সমাজে পানচিনিতে বর এবং কন্যা উভয় পক্ষের মহল্লার সর্দারগণ উপস্থিত থাকেন। বরপক্ষ নির্দিষ্ট দিনে পান, সুপারি, জর্দা, সাদা পাতা, আধ থেকে একমণ মিষ্টি, কনের জন্যে কাপড় চোপড় ইত্যাদি নিয়ে কন্যার পিতৃগৃহে উপস্থিত হয়। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার পর চুক্তিপত্র হয়। উভয় পক্ষকে একটি করে চুক্তিপত্রের কপি দেওয়া হয়। যদি কোন পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করে, তবে তাকেই ক্ষতিপূরণের দায় গ্রহণ করতে হয়। চুক্তিপত্রের পর কন্যাকে সুসজ্জিত অবস্থায় মজলিসে আনা হয়। তার হাতে থাকে একটি মিষ্টি থালা। সেই থালা হাতে সে বরপক্ষের মুরুব্বিদের সামনে এসে দাঁড়ালে যিনি তার থালা থেকে মিষ্টি গ্রহণ করেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "মিষ্টি মিঠা না বউ মিঠা?" মিষ্টি গ্রহণকারী বলেন, "বউ মিঠা।" ঢাকার কোন কোন অঞ্চলে একই নিয়মে ছেলের হাতে পানের ডালা দিয়ে কন্যাপক্ষের মুরুব্বিদের সামনে আনা হয়। এই অনুষ্ঠান পাত্রের পিতৃগৃহে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে যে ভোজ হয়, তাকে জোড় খাওয়া বলে।'[২২]

Dhaka University Institutional Repository

বাতপাক্কায় বরপক্ষের পুরুষদের সাথে মহিলারা আসলে মিষ্টি, পান, সুপারির পাশাপাশি কনের জন্য বিয়ের অনুষ্ঠানের অনুরূপ সামগ্রি, যেমন বেনারসি শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, প্রসাধনী, একসেট স্বর্ণালংকার আনার নিয়ম। বিয়ের অনুষ্ঠানের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই পর্বটিতে আগত অতিথিদের আপ্যায়নে মোরগ পোলাও, আস্ত মুরগির রোস্ট, নার্গির কোফতা, সামি কাবাব বা জালি কাবাব, গরু-মুরগি-খাসির রেজালা, রুই-চান্দা-চিংড়ি মাছ ভাজা, খাসির লেগ রোস্ট, বোরহানি, শাহি টুকরা, জর্দা, ছানার জর্দা, ফলমূল, কফি ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়। পনের বিশ বছর যাবত বাতপাক্কার অনুষ্ঠানে বরের আগমন লক্ষ করা যায়। অনুষ্ঠানস্থলে সবার সামনে বর কনের আঙুলে আংটি পরায়। পূর্বকালে বাতপাক্কায় বর আসত না বলে কনেপক্ষ সেদিন রাতে বরের জন্য খাবার পাঠাত যা 'দুলার খাওন', 'দুলাকা খানা' বা 'জামাই খাওন' নামে পরিচিত। এখন বর অনুষ্ঠানে আসলেও তার খাবার পাঠানোর রেওয়াজ চালু আছে। কয়েক রকম পোলাও, রেজালা, আস্ত খাসির রোস্ট, আস্ত মুরগির রোস্ট, কবুতরের রোস্ট, রকমারি কাবাব, হরেক পদের পিঠা, নানান ধরনের মিষ্টদ্রব্য, বোরহানি, ইলিশ কাবার, চিংড়ি লবস্টার, ফলমূল ইত্যাদি খাবার আট দশটি ভ্যানগাড়িতে করে বরের বাড়িতে পাঠানো হয়। এর সাথে বরের বন্ধুদের জন্য কোমল পানীয় এবং সিগারেটও থাকে। সাত আট বছর থেকে দুলার খাওন অনুষ্ঠানের পরদিন বা দুই চার পর পাঠানোর নিয়ম চালু হয়েছে। সেদিন এ খাবার উপলক্ষে বরের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা হয়। বরপক্ষ খাবারের হাঁড়ি পাতিল কনের বাড়িতে খালি পাঠায় না। এর সাথে মিষ্টি বা ফলমূল দিয়ে পাঠানো হয়।

গোয়ালাদের পাঁচ আদমি অনুষ্ঠানের দিন উভয়পক্ষ ব্রাহ্মণের সামনে গুরুস্থানীয় আত্মীয় ও বর-কনের অভিভাবক দেনলেনের বিষয়টি চূড়ান্ত করে। ব্রাহ্মণদ্বয় পঞ্জিকা দেখে বিয়ের দিন-ক্ষণ-লগ্ন ও পালিত বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে শুভলগ্ন ঠিক করেন। এর পরপরই সোহাগান (সধবা) কর্তৃক জোকার দেওয়ানো হয়। অতীতে গোয়ালাদের বিয়েতে জোকার দেয়ার নিয়ম ছিল না। সম্প্রতি এ নিয়ম চালু হয়েছে। বরপক্ষ পাঁচ আদমি অনুষ্ঠানে কনের বাড়িতে পান, সুপারি ও লাড্ডু মিষ্টি নিয়ে আসে।

উনিশ শতকে জেমস ওয়াইজ বর্ণনানুসারে- 'গোয়ালাদের বিবাহ অনুষ্ঠান জাকজমকপূর্ণ। বরের বাবা মিষ্টি, ফুলের মালা ও চন্দন প্রলেপ নিয়ে গোত্র 'পঞ্চায়েতের' প্রধান মন্ডলের বাড়িতে যান। অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য গুরুর, পুরোহিত ও আত্মীয় স্বজনদের তিনি আহবান করেন। সমবেত সবাইকে মিষ্টি ও

Dhaka University Institutional Repository

ফুলের মালা দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। মন্ডলের নেতৃত্বে সবাই তখন যাত্রা করেন কনের বাড়িতে। কনেকে সাজানো হয় ফুল দিয়ে। এভাবে সম্পন্ন হয় বাগদান অনুষ্ঠান। চূড়ান্ত বিবাহ অনুষ্ঠানের আগে প্রতিবন্ধক হিসেবে কোনো দৈব-দুর্বিপাক উপস্থিত হলেও এ বিবাহ গণ্য হবে সিদ্ধ হিসাবে। এ রকম হলে কন্যাকে গণ্য করা হবে বিধবা হিসাবে। সে আর বিয়ে করতে পারবে না।'[২৩]

সাহা'দের পাকা কথা অনুষ্ঠানে বরপক্ষ ও কনেপক্ষের মধ্যে বিয়ের সম্বন্ধ এবং শুভদিন দেখে বিয়ের দিন-ক্ষণ-লগ্ন স্থির করা হয়। বিয়ের পাটিপত্র লেখার শুরুতে সাদা কাগজের উপর তিনটি সিঁদুরের ফোঁটার নিচে স্বস্তিকা চিহ্ন অংকন করা হয়। পাটিপত্রে বর-কনের ও তাদের পিতা-মাতার নাম, ঠিকানা, বিয়ের দিন-ক্ষণ-লগ্ন আর দানে কি দেয়া হবে তা লিখা হয়। পাটিপত্রের নীচে বর-কনের অভিভাবকের স্বাক্ষরের মাঝে ব্রাক্ষ্মণ পুরোহিত স্বাক্ষর করেন। পাটিপত্রের এককপি বরের অভিভাবক ও আরেক কপি কনের অভিভাবকের কাছে রক্ষিত থাকে। পাটিপত্র লেখা সমাপ্ত হলে বেজোড় সংখ্যক ত্রয়োরা তিনবার জোকার প্রদান করে।

যৌতুক দানদাহেজ:

বিবাহে বর-কনেকে যেসব মূল্যবান দ্রব্য প্রদান করা হয় তাই যৌতুক। বিয়েতে কনের পিতার যৌতুক প্রদানকে স্থানীয় হিন্দুরা দান আর মুসলিমরা দানদাহেজ বলে থাকে। পূর্বকালে যৌতুক তথা দানপ্রথা হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের মাঝে সীমা বদ্ধ ছিল। কারন হিন্দু ধর্মে মেয়েরা পৈত্রিক সম্পত্তি পেত না। তাই বিয়েতে শর্তমাফিক ও ঐচ্ছিকভাবে অর্থ ও তৈজসপত্র দানে দেয়া হত। অন্যদিকে, নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজে, যেমন পাল ও ঋষি মেয়েরা আয়বৃদ্ধি মূলক কাজে নিয়োজিত থেকে পিতার সংসারে উপার্জন করত। সেজন্য তাদের সমাজে কন্যাপণ প্রথা চালু ছিল। মুসলিম সমাজে কনেকে মোহরানা প্রদান করা শাস্ত্রীয় নির্দেশ। কালক্রমে হিন্দু নিম্নবর্ণ ও মুসলিম সমাজের যৌতুক প্রথার প্রচলন ঘটেছে। বর্তমানে এ প্রথার প্রকটতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এখন কনের পিতা বিয়েতে টিভি, ফ্রিজ, পালঙ্ক, আলমিরাসহ ঘরের যাবতীয় আসবারপত্র যৌতুক দিয়ে থাকে। এমনকি নগদ অর্থ, স্বর্ণালংকার ও বর-কনের জামাকাপড় দেওয়া হয়। উচ্চবিত্তরা যৌতুকে বরকে দামি গাড়িও উপহার দিয়ে থাকে। বিয়ের দিন কমিউনিটি সেন্টারে পুষ্পমালায় সজ্জিত যৌতুকের গাড়ি প্রদর্শিত হয়। এ প্রসঙ্গে আবদুল মোহাম্মদ আবদুল কাইউম লিখেছেন- 'ঢাকাবাসীদের ভাষায় পয়সাওয়ালা অর্থাৎ, উচ্চ-বিত্ত সমাজে, যৌতুক বা

Dhaka University Institutional Repository

দানদাহেজের ক্ষেত্রে বিত্ত-প্রদর্শনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বরকে প্রদত্ত আসবারপত্র, গৃহস্থালির তৈজসপত্র এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিলাস-দ্রব্যও কুলির মাথায় চাপিয়ে বিয়ের দিন বা তার আগে, মিছিল করে বরের বাড়িতে বা মজলিশে পৌছে দেয়া হতো। সম্ভব হলে ব্যান্ডপার্টিও থাকতো। নিম্ন-বিত্ত সমাজে দানদাহেজের বাহুল্য বা প্রদর্শন দেখিনি।'[২৪]

সময়ের পরিক্রমায় যৌতুক উপাদানেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। পূর্বকালে মুসলমান বিয়েতে দানদাহেজে হুক্কা ও পানদান দেয়ার রেওয়াজ ছিল। উচ্চবিত্তরা স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করে আর মধ্যবিত্তরা অন্তত রূপা দিয়ে বানিয়ে দিত।[২৫] বিশ শতকের চল্লিশ পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত কোথাও কোথাও এ রীতির প্রচলনের কথা জানা যায়। পাকিস্তান আমলে কনের পিতাকে দানদাহেজে দিতে হত ঘরের আসবারপত্র, তৈজসপত্র, রেডিও, সাইকেল, বর-কনের বস্ত্র ও সোনার বেল্টের ঘড়ি। অনেকক্ষেত্রে বরপক্ষ ভেবালুবা, ক্যামি, সায়মা বা টিসর্ট ব্যান্ডের ঘড়ি, রেলি সাইকেল ও মার্সি ব্যান্ডের রেডিও দাবী করত। উল্লেখ্য, বিয়ের দানদাহেজে সংসারের যাবতীয় তৈজসপত্র দেয়া হলেও ঝাড়ু, সাপি ও ছাই এ তিনটি জিনিস দেয়া হত না অমঙ্গলের ভয়ে। বিশ শতকের ষাট দশকের শেষার্ধে টিভি, ফ্রিজ আর আশি দশকে ভিসিআর, গাড়ি দানদাহেজে সংযুক্ত হয়েছে।

জেমস টেলর লিখেছেন- 'একজন কুলিন যখন বংশজের কন্যা বিয়ে করেন, তখন তিনি তাঁর বর্তমান স্ত্রীদের সংখ্যার অনুপাতে পণের অর্থ গ্রহণ করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি তিনি তাঁর প্রথম বংশজ স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ের সময়ে ১,৫০০ টাকা পণ পান, তাহলে সম্ভবত তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ের সময় পাবেন ১,৪০০ টাকা। এই টাকার পরিমাণ ৪০ থেকে ৩০ টাকায় নেমে না আসা পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটি পরবর্তী বিয়েতে অর্থের পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। তিনি মনে করেন যে, একজন বংশজ ব্রাহ্মণ কন্যার পানিগ্রহণপূর্বক তিনি তাঁকে উচ্চ সম্মান প্রদান করে থাকেন; সুতরাং তিনি তাঁর স্ত্রীপুত্র কন্যাদের ভরণ-পোষণের দায়দায়িত্ব -যা' একজন কুলীন পালন করে থাকেন তা' হচ্ছে তাঁর কন্যাদের জন্য বিয়ের বন্দোবস্ত করা। একমাত্র পুরুষ শিশু সন্তানই পিতার কৌলিন্য লাভ করে থাকে। অতএব, বিয়ের ব্যাপারে শ্রোত্রীয় ও বংশজ যুবকদের প্রলুব্ধ করার মতো অর্থ সম্পদ অবশ্যই কন্যাদের থাকতে হয়। কুলীনদের মধ্যে অবশ্য খুব কম ব্যক্তিই আছেন যাঁরা কন্যাদের বিয়েতে যৌতুক দেবার মত

Dhaka University Institutional Repository

ধনসম্পদের অধিকারী। এর ফলে বংশজ স্ত্রীদের গর্ভজাত কুলীন কন্যাদের বেশীর ভাগই নিঃসঙ্গ বা অবিবাহিতা থেকে যায়।'[২৬]

পুরোনো ঢাকার মুসলমান সমাজে দানদাহেজের পাশাপাশি কনেকে বরপক্ষ কর্তৃক প্রচুর স্বর্ণালংকার উপহার দেয়ার রেওয়াজ আছে। অভিজাত ধনীরা এখনো বিয়েতে কনেকে এক'শ, দু'শ ভরি স্বর্ণালংকার দিয়ে থাকে। দশ-পনের বছর আগেও মধ্যবিত্তরা সম্মান রক্ষার্থে পনের-বিশ ভরি স্বর্ণালংকার বিয়েতে ছেলের বউকে দিত। যদিও এর অধিকাংশটাই আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে সালামী স্বরূপ বিয়ের কিছুদিন আগেই নেয়া হত। জানা যায়, ব্রিটিশ আমলতো বটেই, এমনকি পাকিস্তান আমলেও ধনীরা সোনা-রূপার সুতায় বোনা শাড়ি ও কারুকার্য করা ব্লাউজ কনেকে উপহারস্বরূপ দিত।[২৭]

থালে টাকা:

পঞ্চায়েত মাতব্বরের উপস্থিতিতে বরপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে কন্যাপণের টাকা থালায় করে কনের পিতার হাতে তুলে দেয়ার অনুষ্ঠানটি ঋষিদের কাছে 'থালে টাকা' নামে পরিচিত। অতীতে কনের পিতা কন্যাপণ হিসাবে রূপার এক টাকা থেকে শুরু করে পাঁচ টাকা পর্যন্ত পেত। পাকিস্তান আমলেও প্রায় একশত টাকা পর্যন্ত কন্যাপণ দেয়ার কথা শোনা যায়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ বিশ শতকের আশি দশক থেকে কন্যাপণের প্রথায় শুধুমাত্র 'থালায় চার টাকা' দেয়ার রীতি চালু হয়। অনুষ্ঠানের দিন বরের পিতা তার পাঁচ-সাত জন আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে কনের বাড়িতে আসে। সাথে আনে টাকার থালা। থালায় চার টাকা সহ একটি সিঁদুর কৌটা, ধান, দূর্বা, ফুল, মাটির প্রদীপ ও ধুপবাতি থাকে। অনুষ্ঠানস্থলে বরের পিতা সেই সিঁদুর কৌটা থেকে সিঁদুর নিয়ে চার টাকার উপর পাঁচটি ফোঁটা দেয়। এরপর নারায়ণের আসনের সামনে দাড়িয়ে বলে- 'সাক্ষাৎ দেবতা পুরোহিত, সাক্ষাৎ দেবতা পরমেশ্বর এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি, আমার পুত্রের নাম অমুক। আমার ছেলের জন্য থালে টাকা দিবার অনুমতি প্রার্থণা করিতেছি।'[২৮] তখন উপস্থিত ব্রাক্ষণ, পঞ্চায়েত মাতব্বর ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অনুমতি সাপেক্ষে বরের পিতা কনের পিতার হাতে থালাটি তুলে দিলে, তিনি থালাটি কনের মা'কে দেয়। কনের মা থালাটি কলসের উপর রাখে। বরের মা বা কনের মা সেখান থেকে সিঁদুর নিয়ে সামান্য একটু কনের সিঁথিতে ছুঁয়ে আশীর্বাদ করে। এ সময় এয়োরা জোকার দেয়। পুরুষরা বলে- 'শ্রী রাধাকৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি ধ্বনি বল মন হরি বল। প্রেমধ্বনি কোসিরাধে শ্রী কৃষ্ণ প্রেমানন্দে সবাই হরি ধ্বনি বল মন।'[২৯] থালে টাকা অনুষ্ঠানেই বিয়ের দিন,

Dhaka University Institutional Repository

তারিখ, শুভ লগ্ন ও বিয়ের দেনলেন সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ করা হয়। বিয়ের তারিখ ঠিক হলে বর ও কনের পিতা পঞ্চায়েতকে মিষ্টির জন্য টাকা দেয়। এই মিষ্টিকে বলা হয় 'হাসিখুশির মিষ্টি'। বরপক্ষ থেকে হাসিখুশির মিষ্টি বাবদ যে পরিমান টাকা মহল্লা পঞ্চায়েত আদায় করে তার অর্ধেক পরিমান কন্যাপক্ষ থেকেও নেয়া হয়। থালে টাকা অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের ভাত-মাছ বা পোলাও-মাংস, চানাচুর, চা-বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

কনেপণ প্রসঙ্গে জেমস ওয়াইজ লিখেছেন- 'কায়েতের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হলে খনের বাবাকে টাকা দিতে হয় অনেক। হাজার টাকাতো বটেই। কখনও কখনও দুই হাজার টাকাও দিতে হয় কায়েত জামাইকে। আগেকার কালে কিন্তু স্বিকৃত নিয়ম ছিল হয় চোদ্দ টাকা আর নয়তো দু'হাজার টাকা। এখনও বিয়ের আগে কনের বাবাকে জিজ্ঞেস করেন যে সে টাকাটা পেয়েছে কিনা। বনেদি পরিবারে বিয়ের অনুষ্ঠানে পৌরাহিত্য করেন পুরোহিত। বিয়ের আগে আচার হলো উপবাস করার, আর উপবাস কালে কালির পূজা করার।'[৩০]

বিয়ের কেনাকাটা:

বিয়ের কেনাকাটায় শাঁখারীরা সর্বপ্রথম হলুদ সাথে দশটি মাটির প্রদীপ, সাহা আর ঋষিরা হলুদ এবং গোয়ালারা হলুদ, সিঁদুর, শাঁখা ও কনের হলুদের শাড়ি একদরে কিনে। মুসলমানরাও হলুদ এবং মাটির হাড়ি ক্রয়ের মাধ্যমে বিয়ের কেনাকাটা শুরু করে। আবার বিয়ের জামা-কাপড় ক্রয় কালে সর্বপ্রথম জুতা কেনার নিয়ম। পূর্বকালে মুসলমানদের অনেকেই সর্বপ্রথম হলুদের পাশাপাশি সিঁদুর এবং মাটির লোটাও কিনত। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়-ই বিয়ের কুলায় 'সীতা বান' দেখে কিনে। যে কুলার একদিকের প্রান্তভাগে বেতের প্রথম বাঁধন থেকে প্রতিটিকে রাম, লক্ষণ, সীতা নামে পর পর গুণে শেষের বাঁধনটি সীতা নামে হলে সেটি কেনা হয়। সীতা বাঁধনের কুলা সুলক্ষণযুক্ত। অন্যদিকে, এই বিয়ের কুলার শেষ বাঁধনটি রাম বা লক্ষণ নামে শেষ হলে তা কেনা হয় না।

উনিশ শতকে কলকাতা অপেক্ষা অত্রঅঞ্চলের মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ-অনুষ্ঠানে অধিক অর্থ ব্যয় হত বলে জেমস টেলর লিখেছেন। তার উল্লেখিত বর্ণনা অনুসারে- 'বিবাহ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের খরচপত্রের বিরাট তারতম্য ঘটে থাকে; কিন্তু শহরে অধিক অবস্থাপন্ন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নলিখিত হারে এর পরিমান নিরূপণ করা যেতে পারেঃ যেমন, উচ্চশ্রেণীর জন্য ১০০০ থেকে ২০০০ টাকা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ৪০০ থেকে ৮০০ টাকা, এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য ১০০ থেকে ২০০ টাকা। যে সকল ব্যক্তি তাদের পদমর্যাদা দ্বারা স্থিরীকৃত অর্থের পরিমাণ লঙ্ঘন করেন, তাঁরা অধিক সম্মানিত অধিবাসীগণের মধ্যে তাঁদের নিজের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে ব্যর্থ হন এবং এ উপলক্ষে তাঁদের আচরণ দলের সদস্যদের নিকট নিন্দনীয় বলে গণ্য হয়ে থাকে। অবশ্য এ অর্থের বেশীর ভাগ অংশ রাত্রিকালীন শোভাযাত্রার সময় পথে পথে ছড়িয়ে দেয়া হয়। সাধারণত এই ধরণের মিছিলে দেশীয় দুর্দশাগ্রস্ত, অর্ধাহারী, টাট্টু ঘোড়ার উপর সমাসীন দামামা-বাদকদল ও ছিন্নবস্ত্র পরিহিত পতাকাবাহীদের একটি সারিসহ- বর বা কনের বন্ধুবান্ধব, বাদ্যকর, কৃত্রিম পুষ্পরাজি, রঙিন আলো এবং আতশবাজি ইত্যাদি বহু কিছু থাকে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নিতান্ত দরিদ্র শ্রেণীগুলোর সর্বনিম্ন খরচে যে অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হতে পারে তার পরিমাণ হচ্ছে দশ টাকা।'[৩১]

নারায়ণ পূজাঃ

পুরোনো ঢাকার গোয়ালা ধোপাদের নিয়মানুযায়ী, বিবাহের চার-পাঁচদিন পূর্বে বর/কনের বাড়িতে নারায়ণ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন বর/কনের বাবা মায়ের উপোস থাকার রীতি। একে ধোপারা বলে 'জোড়া ওপাস'। এক্ষেত্রে গোয়ালাদের নিয়ম একটু ভিন্ন। ইচ্ছা করলে বাবা মা উভয়ের মধ্যে যেকোন একজন উপোস থাকলেই চলে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মায়েরা উপোস থাকে। নারায়ণ পূজায় বর/কনের ঘনিষ্ট আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করা হয়। ধোপাদের আত্মীয় স্বজনরা মাটির ঘটিভরে কাঁচা দুধ, নকুল আর বাতাসা নিয়ে আসে। যাবার সময় তাদেরকে ঘটিভরে ঘোলা প্রসাদ[৩২] দেওয়া হয়। একটি কাঠের চৌকিতে নতুন সাদা কাপড় বিছিয়ে পূজার আসন পাতা হয়। পূজার উপাচার হিসেবে ব্যবহৃত হয় ফুলের তোরা, মালা, পূর্ণঘট, আইপান-সিঁদুর চর্চিত একফানা কলা, পানের উপর দুটো সুপারি, প্রতি পাঁচ প্রকারের পাঁচটি আস্ত বা কাটা ফল ও পাঞ্জেরি[৩৩]। এছাড়া আইপান-সিঁদুর চর্চিত একটি বড় মাটির হাড়িতে ঘোলা প্রসাদ থাকে। ধোপাদের আত্মীয় স্বজনদের আনা কাঁচা দুধ ঘোলা প্রসাদে ঢালা হয়। বর/কনের বাবা-মা পূজায় উপবেসনে ব্রাহ্মণের সাথে মন্ত্র পাঠ করে। ব্রাহ্মণ কাসার বাটিতে কাঁচা দুধের সাথে গঙ্গাজল আর তুলসি পাতা মিশিয়ে এতে সংশোধন মন্ত্র পড়ে চর্ণমিত তৈরি করে। চর্ণমিত বাবা মায়ের হাতের তালুতে দেয়া হলে তারা সেটি খেয়ে উপোস ভাঙ্গে। এরপর তারা ঘোলা প্রসাদসহ অন্যান্য প্রসাদ খায়।

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের দাওয়াত:

ঢাকায় বিশ শতকের পঞ্চাশ-ষাট দশক থেকে নিমন্ত্রণে বিয়ের কার্ডের প্রচলন ঘটে। বিয়ের কার্ডের প্রচলনের পূর্বে স্থানীয় মুসলমানদের বিয়েতে লবঙ্গ, কিসমিস, মোনাক্কা পরবর্তীতে লজেন্স ও পাই পয়সা দিয়ে দাওয়াত দেয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সৌন্দর্য্যের জন্য রূপার নেউতা বাটায় লবঙ্গ, কিসমিস আর মোনাক্কার মধ্যে আফসান মিশিয়ে এবং লবঙ্গ ও পাই পয়সাকে পান্নি কাগজে মুড়িয়ে নেয়া হত। নিমন্ত্রয়িতা সালাম জানিয়ে চার পাঁচটি লবঙ্গ, কিসমিস বা মোনাক্কা দাওয়াতির হাতে দিয়ে বলত- 'অমুকের বিয়ার নেউতা, যাইবেন কোলাম।'[৩৪] সাহাদের বিয়েতে বর/কনের বাবা মা পাঁচটি আস্ত পান আর একটি সুপারি দাওয়াতির হাতে দিয়ে পুত্র কন্যার বিয়ের নিমন্ত্রণ জানাত। সেই সময় বর/কনের বাবা মা ব্যতিত অন্য কাউকে দিয়ে বিয়েতে নিমন্ত্রণ করাকে অশোভনীয় মনে করা হত। ধোপাদের মাঝে নারায়ণ পূজা সমাপ্তের পরপরই উপস্থিত অতিথিদের সবাইকে মৌখিকভাবে বিয়ের দাওয়াত দেয়ার রীতি চালু রয়েছে। অতীতে গোয়ালাদের রীতি অনুযায়ী, নারায়ণ পূজার পর ঘোলা প্রসাদ, ফল আর পাঞ্জেরি নিয়ে বর/কনের পরিবারের লোকেরা আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে গিয়ে বিয়ের দাওয়াত দিত। বিয়ের নিমন্ত্রণের জন্য কনের বাবা মা নারায়ণ পূজার প্রসাদ নিয়ে সর্বপ্রথম বরের বাড়িতে যেত। বরের বাবা মাও অনুরূপ দাওয়াত দিতে কনের বাড়িতে আসত। বিয়ের নিমন্ত্রণে তারা আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে নারায়ণ পূজার প্রসাদ পাঠানোর পাশাপাশি গত পনের বিশ বছর থেকে বিয়ের কার্ডের ব্যবহার শুরু করে। ইদানিং ধোপা আর ঋষিদের বিয়ের নিমন্ত্রণেও বিয়ের কার্ডের দেখা যায়। ঋষিদের মাঝে বিয়ের আগের দিন বর/কনের পিতা কর্তৃক মহল্লায় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে পঞ্চায়েতে ডেকে নিমন্ত্রণ জানানোর রেওয়াজ আছে। এটি তাদের কাছে পান ভাঙ্গানি নামে পরিচিত। এই উপলক্ষে ঋষি পিতা একটি থালায় পান ও মিষ্টি নিয়ে পঞ্চায়েতে যায়। সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সামনে পানের থালা আর মিষ্টি রেখে তাদের ভক্তি করে। এসময় পঞ্চায়েতের সর্দার তাকে জিজ্ঞেস করে- 'এটা তুমি কি কাজের জন্য দিলা ?' প্রত্যুত্তরে সে বলে- 'আমার পুত্র/কন্যার বিয়ে। আপনাদের সবার নিমন্ত্রন্ন। এইটা শুভ কামে দিলাম।'[৩৫] ঋষিরা পুত্র কন্যার বিয়ের নিমন্ত্রণে বিয়ের কার্ড পরিচিতিদের মাঝে বিতরন করলেও নিকট আত্মীয়গণ মুখে দাওয়াত পাওয়াকে অধিক সম্মাননা আত্মীয়বন্ধন ও মর্যাদা রক্ষা বলে মনে করে থাকে। এ বিষয়টি স্থানীয় মুসলমানদের কারো কারো মাঝেও দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

মনসা পূজা:

সাহা'দের বর/কনের মা বিয়ের কয়েকদিন আগে বাড়িতে মনসা পূজা দিয়ে থাকে। ঘরের মেঝেতে পাতা পূজার আসনে জলপূর্ণ মাটির ঘট স্থাপন করা হয়। দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগে দেয়া হয় দই, মিষ্টি আর পাঁচ রকম ফল। বর/কনের মা উপোস থেকে পূজায় উপবেসন করে। ব্রাহ্মণ দই, মধু, কাঁচাদুধ ও তুলসী একত্রে মিশিয়ে এতে সংশোধন মন্ত্র পড়ে চর্ণামিত তৈরি করে। পূজা শেষে বর/কনের মা সেই চর্ণামিত খেয়ে উপোস ভাঙ্গে। এরপর উপস্থিত সবাইকে চর্ণামিত খেতে দেয়া হয়।

সোন্দা কোটাই:

সোন্দা কোটাই বিবাহ পূর্বক একটি আচারিক অনুষ্ঠান বিশেষ। বর/কনের গায়ে মাখার হলুদ-সোন্দা আনুষ্ঠানিকভাবে কুটে তৈরি করা হয় বলে এই অনুষ্ঠানটি স্থানীয়দের কাছে সোন্দা কোটাই নামে পরিচিত। মুসলমান ও গোয়ালাদের মধ্যে গায়ে হলুদের আগের দিন, ধোপাদের মধ্যে নারায়ণ পূজার তিন বা চারদিন আগে সোন্দা কোটাই অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে, সাহা নারীরা ব্রাহ্মণের দেয়া শুভ-দিন-ক্ষণ অনুযায়ী বিয়ের কয়েক দিন আগে কাহেলছিয়ায় হলুদ কুটে রাখে। হলুদের সাথে পাঁচটি কড়ি, একটু ধান আর দূর্বা মিশানো হয়ে থাকে। ধোপা আর গোয়ালাদের রীতি অনুযায়ী, ঐদিন পাঁচ সোহাগান (সধবা) বাড়ির উঠোনে একটি চুলা তৈরি করে। চুলার মধ্যে আইপানের পাঁচটি ছাপ অংকন করা হয়। এর সাথে আইপান-সিঁদুরে চর্চিত করা হয় কাহেলছিয়া। এই আচার পালনের পূর্বে সোহাগানরা মাথায় তেল মাখে। কপালে সিঁদুরের টিপ দেয়। একটি নতুন হাঁড়িতে হলুদ, পোলাও চাল, সোন্দা, গিলা আর মাশকালাই ডাল দিয়ে চুলার আগুনে নিমটালা (হালকা ভাঁজা) করা হয়। এসময় তারা জোকার দিয়ে থাকে। সমস্ত উপকরণ গোয়ালা নারীরা একবার চুলায় ভাঁজলেও, ধোপা নারীরা ভাঁজে পাঁচবার। কাহেলছিয়ায় কোটার সময় কিছুক্ষণ পরপর কোটাহলুদ হাঁড়িতে নিয়ে চুলায় ভাঁজা হয়। সোহাগানরা কাহেলছিয়ায় কোটাহলুদ পাতলা কাপড়ে চেলে নেয়। অমসৃন হলুদ শীলপাটায় বেটে ফেলা হয়। জানা যায়, অতীতে যাতাকলে হলুদ গুড়া করে নেয়া হত।[৩৬] বর/কনের জন্য তৈরি করা হলুদ গুড়া একটি নতুন মাটির হাঁড়িতে রাখা হয়। নতুন মাটির খরাতে চন্দনপঙ্ক আর ধূপ জ্বালিয়ে উক্ত হলুদ গুড়ার উপর রেখে নতুন সরা দিয়ে হাঁড়ির মুখ ঢেকে ফেলা হয়। বর/কনের মা সেই হাঁড়িটি ঠাকুর ঘরে দেবতার সামনে রাখে। সেখানে মাটির প্রদীপ, আগরবাতি ও ধূপ জ্বালানো হয়। বর/কনের মা প্রণাম করে দেবতার উদ্দেশ্যে বলে- 'শাদীমে হামো খাড়া হয়ে, যেসা ভালামতন সাব হো যায়।'[৩৭] হলুদের হাঁড়িটি সাবধানে তুলে রাখা হয়,

Dhaka University Institutional Repository

যাতে এর উপর কোন প্রকার 'ছুতছাওয়া' না পরে। সোহাগানদের পান-সুপারি, চা-বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, যে সোহাগান চুলায় হলুদ টালে তাকে গোয়ালা মা একটি থালায় করে সোয়াকেজি চাল, আলু আর কিছু টাকা সিধা দেয়।

মুসলমান নারীরা অনুষ্ঠানের আগের দিন হলুদকে সরতা দিয়ে কেটে পানিতে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নেয়। এরপর হলুদকে গরম কড়াইতে অল্প আঁচে নিমটালা করা হয়। সুগন্ধির জন্য হলুদের সাথে সোন্দাও মেশানো হয়। বর/কনের গায়ের ময়লা পরিষ্কার করে ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আরো মেশানো হয় একমুঠো গম ও পোলাও চাল। পূর্বকালে সাত সোহাগান হলুদ কোটার আগে সাতজন নাবালিকা অবিবাহিত কন্যা-শিশুদের দ্বারা কাহেলছিয়ায় হলুদ কুটিয়ে নিত। হলুদ কোটা আরম্ভ করার পূর্বে সাত সোহাগান নিজ কপালে লিপষ্টিকের টিপ দেয়। স্থান বিশেষে মুসলিম এয়োরা এই সময় সিঁথিতে সিঁদুর[৩৮] এবং কপালে সিঁদুর বা জর্দার রং দিয়ে টিপ পরে। আলপনা করা কাহেলছিয়ায় সিঁদুরে সাতটি ফোঁটা দেয়া হত। পরবর্তী কালে ফোঁটায় জর্দার রং ব্যবহার শুরু হয়। সাত সোহাগান তাদের ডান হাতে মশাল ধরে কাহেলছিয়ায় সাত বার হলুদ কোটে। সাত সোহাগান কর্তৃক 'সাত কোটা' সম্পন্ন হলে বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত ছাড়া উপস্থিত সবাই হলুদ কোটায় অংশগ্রহণ করে। একটি সাদা কাপড় জর্দার রং-এ রাঙ্গিয়ে সেই কাপড়ে কোটা হলুদ চেলে নেয়া হয়। গুড়া হলুদ একটি মাটির হাঁড়িতে তুলে রাখা হয়। অতীতে হাঁড়িতে হলুদ গুড়ার মাঝে ছোট্ট চাটাই-এর উপর লোবান জ্বালানো হত, তার পরবর্তীতে আগরবাতি জ্বালাত। লোবান বা আগরবাতির ধোঁয়ায় ধূমায়িত হলুদের হাঁড়িটিকে মাটির সরায় ঢাকা হত। সাত রকম ফুলে গাঁথা মালা সরার উপর স্থাপন করে সোহাগানরা হাঁড়িটি ঘরের মাঝখানে রাখত। হাঁড়িটির চারপাশে সাত সোহাগান গোল হয়ে বসে তিনকুল পড়ে মোনাজাত করত। মোনাজাত শেষে হাঁড়িটি ঘরের মাঁচায় তুলে রাখত, যেন কোন ছুতছাওয়া না লাগে।[৩৯]

গায়ে হলুদঃ

গায়ে হলুদ বিবাহকালীন বিশেষ মাঙ্গলিক আচারানুষ্ঠান। বিয়েতে বর/কনের গায়ে হলুদ মাখানোর রীতি বেশ প্রাচীন। হলুদ মাখানোর পেছনে দু'টি উদ্দেশ্য কাজ করে। এক, হলুদ যেমন সৌন্দর্যবর্ধক অন্যদিকে বিশুদ্ধতার প্রতীক।[৪০] অতীতে বিয়ের একমাস, পনেরদিন, সাতদিন বা তিনদিন আগে বর/কনের গায়ে হলুদ মাখানো শুরু হত। এখন বিয়ের দু'একদিন আগে বা বিয়ের দিন হলুদের অনুষ্ঠান

Dhaka University Institutional Repository

হয়। একই দিনে গায়ে হলুদ এবং বিয়ে অনুষ্ঠিত হলে শাঁখারীদের ভাষায় একে 'হদ্দহদ্দী' বলা হয়। গায়ে হলুদের কুলায় থাকে কাঁচা কলা, ধান, দূর্বা, হলুদবাটা, মেহেদীবাটা, পান বা রুটি, সুপারি, জলন্ত প্রদীপ ইত্যাদি। এ সবই মাঙ্গলিক বস্তু। উদাহরণস্বরূপ কলা ও পান উর্বরতাবাদের,[৪১] কুলা ও ধান ঐশ্বর্যের প্রতীক। দূর্বাঘাস একাধারে বংশবিস্তার ও অমরত্বকে নির্দেশ করে। দীর্ঘস্থায়ী বিবাহিত জীবন এবং বংশবিস্তারের কামনায় প্রাচীনকাল থেকে বিয়ের ও বিভিন্ন আচারে ধানের সঙ্গে দূর্বার প্রচলন প্রতিষ্ঠা পায়।[৪২] জলন্ত প্রদীপ অশুভ ভূত প্রেত অশরীরী আত্মাদের বিতাড়িত করে।[৪৩] পুরোনো ঢাকায় গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানটি নামের ক্ষেত্রে এলাকা ও বর্ণভেদে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এ অনুষ্ঠানটি মুসলমানদের কাছে 'বালাবালি', 'লগ্‌গন', 'তেলাই' বা 'হলদি' নামে পরিচিত। শাঁখারীরা 'ইন্দ্রহলুদ', ধোপা ও গোয়ালারা 'লাগান' আর ঋষিরা 'সোনাবস্ত্র' বলে থাকে।

শাঁখারীদের বিয়ের দু'তিনদিন আগে ইন্দ্রহলুদ অনুষ্ঠিত হয়। অপেক্ষাকৃত গরীব শাঁখারীরা অবশ্য বিয়ের দিন সকাল বেলায় ইন্দ্রহলুদের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকে। সেদিন শাঁখারীরা বর/কনের জন্য একদরে হলুদ কিনে আনে। সেই হলুদ একজন আয়ো পাটায় বাটে। হলুদ বাটার কালে আয়োদের কর্তৃক জোকার দেয়ার রীতি। বর/কনেকে ইন্দ্রহলুদ উপলক্ষে নতুন কাপড় পরানো হয়। কনে পরিধান করে লালপেড়ে সাদা শাড়ি আর বর ধুতি ও গেঞ্জি বা শার্ট। শাঁখারীদের বিয়েতে বর/কনের হলুদের বস্ত্র বিয়ের বিভিন্ন আচারানুষ্ঠানেও ব্যবহৃত হয়। পূর্ব নির্ধারিত সন্মানজনক ব্যক্তি কর্তৃক বর/কনের কপালে সর্বপ্রথম হলুদ ছোঁয়ানোর পরই এয়োরা তাদের সমস্ত গায়ে হলুদ মাখে। এখানে উল্লেখ্য, যে এয়ো হলুদ বাটে সে বর/কনের গায়ে হলুদ মাখতে পারে না। বর/কনের গায়ে হলুদ মাখা শেষ হলে উপস্থিত সবাই একে অপরের গায়ে হলুদ মেখে আনন্দ করে। এর পরপরই বর/কনেকে কাঠের পিঁড়িতে বসিয়ে বাড়ির উঠোনে গোসল করানো হয়। সম্মানযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক বর/কনের মাথায় দু'তিন ঘটি পানি ঢালার পর আয়োরা বর/কনেকে গোসল করিয়ে দেয়। বর/কনের সমস্ত গায়ে হলুদ মাখানো ও তাদের গোসল করানোর দায়িত্বটা মূলতঃ বোন ও বৌদিরাই পালন করে থাকে। অন্য আত্মীয় আয়োরা তাদের সহযোগীতা করে। গোসলের পর বর/কনের মাথায় ধান-দূর্বা ছিটিয়ে আর্শীবাদ করা হয়। দু'টি জলন্ত আগুনে মুছরি[৪৪] দু'হাতে নিয়ে বর/কনের সম্মুখে ডানহাত বামহাতের উপর রেখে স্বস্তিকা করা হয়। এরপর বামহাত ডানহাতের উপর, আবার ডানহাত বামহাতের উপর এনে আগুনে মুছরি বর/কনের মাথার উপর দিয়ে ছুঁয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পিছনে ফেলা হয়। আয়োরা একইভাবে দু'টো হাঁসের ডিমও বর/কনের মাথার উপর দিয়ে পিছনে ছুঁড়ে ফেলে। ইন্দ্রহলুদে আগত আত্মীয় স্বজনদের মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

গোয়ালারা বিয়ের দু'দিন আগে লাগানের অনুষ্ঠান করে। এ উপলক্ষে জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে নেউতা (দাওয়াত) দেয়া হয়। পূর্বকালে এ অনুষ্ঠান বর/কনের নিজ নিজ বাড়িতে আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে উৎযাপিত হলেও এখন উভয়পক্ষই বর/কনেকে হলুদ দিতে যায়। লাগানের দিন সকালে বরপক্ষ কনের বাড়িতে দই-মাছের সাথে পান, মিষ্টি আর কনের জন্য শাড়ি পাঠায়। দুপুরবেলায় বর/কনে ও তার পরিবারের সবাই একত্রে বসে 'মাচ্ছিভাত' (মাছ-ভাত) খায়। লাগান বাঁধার পর তিন চারদিন তারা আর মাছ খেতে পারবে না। সন্ধ্যাকালে ঘরের ভেতর বর/কনের লাগান বাঁধা হয়। কনেকে অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি করার প্রাক্কালে তার শরীরে যদি কোন অলংকার থাকে তা খুলে ফেলার রীতি। এ উপলক্ষে কনেকে পরিধান করানো হয় লালপেড়ে হলুদ শাড়ি আর বরকে সাদা ধুতি বা লুঙ্গি ও গেঞ্জি। ঘরের অভ্যন্তরে পাতা আলপনা করা পিঁড়িতে বর/কনেকে বসানো হয়। এসময় ব্রাহ্মণ পুরোহিত মন্ত্রপড়ে হলুদ সুতোয় সুপারি ও হরিতকী বেঁধে লাগান তৈরি করে তা বর/কনের হাতে পরিয়ে দেয়। লাগান বরের বামহাত আর কনের ডানহাতে বাঁধার নিয়ম। লাগান বাঁধার পর ব্রাহ্মণ তার হাতের মধ্যমা আঙ্গুলে বর/কনের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে তিনবার হলুদ বাটা ছোঁয়ায় এবং মাথায় ধান-দূর্বা ছিটিয়ে আশীর্বাদ করে চলে যায়। ব্রাহ্মণ চলে গেলে পাঁচ সোহাগান সজ্জিত কুলা বর/কনের মুখের সামনে ডান থেকে বাম তিন বা পাঁচবার ঘুরায়। কপালে হলুদ বাটা ছুঁইয়ে, মাথায় ধান-দূর্বা ছিটিয়ে আশীর্বাদ করে। এ আচারটি গোয়ালাদের কাছে 'পারশ্না' নামে পরিচিত। পারশ্না পর্বের পর কনের দাদী, নানী বা মা একটি লৌহখন্ড কনের কোমরে গুঁজে দেয়। এ লৌহখন্ড বিয়ের দিন পর্যন্ত কনের সাথে রাখার নিয়ম গোয়ালাদের বিশ্বাস, এর ফলে হলুদ-সোন্দার গন্ধে অশরীরী আত্মারা প্রলুব্ধ হবে না।[৪৫] লাগান বাঁধা সম্পন্নের পর বর/কনে ঘরের ভেতর অবস্থান করে। তারা নিজের পরিবারের লোকজন ব্যতিত অন্য কারো সামনে পারতপক্ষে যায় না। এমনকি লাগানের পর তারা কাউকে স্পর্শ করে না। কনে ঘরের ভেতর লম্বা ঘোমটা টেনে বসে থাকে। তাদের মতে, এ সময় কনেকে যত কম লোক দেখবে বিয়ের দিন কনের ততই শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। পূর্বকালে বর/কনে এসময় জুতা পরিধান করা থেকে বিরত থাকত। তাদের রান্নাঘরের চুলা স্পর্শ করা নিষেধ ছিল। লাগানের দিন থেকে বিয়ের গোসল পর্যন্ত সোহাগানরা বর/কনেকে দৈনিক সাতবার হলুদ মাখায়। তারা

Dhaka University Institutional Repository

বর/কনের গায়ে মাখা ঝরে যাওয়া পরিত্যাক্ত হলুদ শীতলপাটি থেকে তুলে সযত্নে রাখে। বিবাহ আচারে এটি ব্যবহৃত হয়।

অতীতে ধোপাদের বিয়ের আগের দিন লাগানের অনুষ্ঠান হত। সেদিন প্রত্যুষে বর/কনে মাথা পরিষ্কার করে ধুয়ে স্নান করত। স্নানের পর কনেকে লালপেড়ে হলুদ শাড়ি পরানো হত। ব্রাহ্মণের দেয়া শুভক্ষণ অনুযায়ী পাঁচ সোহাগান ঘরের ভেতর বর/কনের মুখমন্ডল ও হাতে-পায়ে হলুদ মাখাত। বিকেল বেলায় বর/কনের ভাই ও বোনের স্বামীরা মাড়োয়া বাঁধত। সন্ধ্যাবেলায় বর/কনেকে মাড়োয়ায় নিয়ে পুনরায় হলুদ মাখা হত। বর্তমানে লাগান আর বিয়ে একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়। ফলে বিয়ের দিন সকাল বেলায় লাগান বাঁধা আর মাড়োয়ার আচারসমূহ পালিত হয়ে থাকে। এসময় কনের বাড়ির মাড়োয়াতে ব্রাহ্মণ এসে মন্ত্র পড়া আরম্ভ করলে বর ও কনে পক্ষের পুরুষদের মাঝে পাল্টাপাল্টি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ খেলায় দুজন করে উভয়পক্ষের চারজন মুখোমুখি বসে। তাদের প্রত্যেককে একটি করে লাড্ডু মিষ্টি দেয়া হয়। উভয় দলের প্রতিপক্ষের মাঝে পাঁচবার লাড্ডু মিষ্টি আদানপ্রদান শেষে সকল প্রতিযোগী একটু করে লাড্ডু মিষ্টি খায়। এরপর তাদের সামনে পোস্তের দানা সহযোগে গুড়ের শরবত রাখা হয়। পূর্বের ন্যায় শরবতের গ্লাস পাঁচবার আদানপ্রদানের পর প্রত্যেকে গ্লাসে চুমুক দিয়ে একটু শরবত পান করে। সবার শেষে তাদের সামনে রাখা হয় দু'ঝুড়ি ধান আর দু'প্রস্থ লম্বা কাপড়। দু'দলের প্রতিপক্ষের মাঝখানে কাপড় বিছানো হলে প্রতিযোগীরা কাপড়ের নিজ নিজ প্রান্ত ধরে বসে। প্রতিযোগীরা দ্রুত ঝুড়ি থেকে ধান তুলে কাপড়ের উপর রাখে। নিজেদের মধ্যে পাঁচবার ধান দ্রুত আদানপ্রদান সম্পন্ন করে, যে প্রতিযোগী সর্বপ্রথম তার সামনে রাখা ধানগুলি কাপড়ে বেঁধে 'রাম রাম' বলে দাড়িয়ে যায় সে 'বাজি মারে' অর্থাৎ বিজয়ী হয়। কাপড়ে বাঁধা ধান মাড়োয়াতে যত্নসহকারে তুলে রাখা হয়। বিয়ের দিন এ ধান ভাঙ্গার রীতি।[৪৬] এরপর কনেকে বরের বাড়ি থেকে দেয়া লালপেড়ে সাদাশাড়ি, ফুলের গহনা, কোমর ও গলায় লাল কাইতন পরিয়ে মাড়োয়াতে আনা হয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিত কনেকে নিজ কোলে বসিয়ে মন্ত্র পড়েন। মন্ত্র পড়া শেষ হলে ব্রাহ্মণ কনেকে ধান-দূর্বায় আশীর্বাদ করে চলে যায়। মাড়োয়াতে পাঁচ সোহাগান তিনবার করে বর/কনের কপালে হলুদ বাটা ছোঁয়ায় ও একটু দই খাওয়ায়। বর/কনের কপালে অতিথিদের সবার হলুদ দেয়া শেষ হলে সোহাগানরা বর/কনের গায়ে হলুদ মাখায়। লাগানে অভ্যাগতদের মাছেভাতে আপ্যায়ন করা হয়। বর/কনেও সেদিন মাড়োয়াতে বসার পূর্বে ভাত-মাছ খায়। বিবাহ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

বর/কনের মাছ খাওয়া নিষেধ। লাগানের দিন বরপক্ষ কনের বাড়িতে দই-মাছ পাঠায়। আরো থাকে লাগানের শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, ফুলের গহনা, প্রসাধন সামগ্রি, স্বর্ণের চুড়ি বা গলার চেইন।

আগে মুসলমানদের বালাবালি বর/কনের স্ব স্ব আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে পালিত হত। বালাবালির দিন সকালে বরপক্ষ কনের বাড়িতে দই-মাছ পাঠাত। দই-মাছে থাকত বড় দু'টি রুই মাছ, দই, পান, সুপারি, জর্দা, সাদা, খয়ের, মিষ্টি, বাচকান্নার শাড়ি ও মুরগি। ইদানিং ধনীদের অনেকেই দইমাছের সাথে গরু বা ছাগল, হাঁস, তিতর, কবুতর, টিয়া, ময়না ইত্যাদি ব্যান্ডপার্টি সহকারে কনের বাড়িতে পাঠায়। বরের বাড়ি থেকে পাঠানো দইমাছের অর্ধেকটা উকিল বাপকে দেয়ার নিয়ম।

এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আবদুল কাইউম লিখেছেন- 'সাধারণত প্রথমে বরপক্ষের লোকজন তত্ত্ব ও মিষ্টি বা অন্যান্য গায়ে হলুদের উপচার নিয়ে কনের বাড়িতে যায়। এই উপচারের সঙ্গে অবশ্যই থাকতো দই এবং বেশ বড়ো আকারের দুটি মাছ। একটি বরের প্রতীক, অন্যটি কনের। সেকারণে বর-রূপ মাছের মুখে গুঁজে দেয়া হয় সিগারেট। অন্য মাছটির মুখ কাপড়ের ঘোমটা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। মাছ যে কুটবে, তার উপঢৌকনস্বরূপ মাছের ভেতরে টাকাও দেয়া হয়ে থাকে। এই মাছ ভেজে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে আগত বরের বাড়ির লোকজনকে আপ্যায়িত করা হয়। এই গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে, সাধারণত মেয়েরাই অংশগ্রহণ করতো। শুধু তাই নয়, এই অনুষ্ঠানের হলুদ কোটা বা বাটার দায়িত্ব বাড়ির মেয়েরা বা অতিথিরা পালন করে থাকে। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে, অধুনা-হলুদ শাড়ি পরিধানের রেওয়াজ আমি দেখিনি। গায়ে হলুদের দিন আচার অনুষ্ঠান শেষে, আত্মীয় স্বজন ও দুই পক্ষের অতিথিদের মুখেও হলুদ মাখামাখির পর শুরু হয়- রঙ্ ছিটানোর খেলা। বরপক্ষের লোকেরা পিচইকরীর রঙে বা আবীরের রঙে, অনেকটা নাস্তানাবুদ হয়ে ফিরে যাবার সময় বলে যায় যে, পরবর্তী দিন বা বরের গায়ে হলুদের দিন তারা এর প্রতিশোধ নিবে।'[৪৭]

পূর্বকালে বালাবালির দিন তেলাই বা তেলুয়াইতে বসার আগে বর/কনে গোসল করে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ত। কোন কোন স্থানে গোসলের আগে কনের গায়ে হলুদ মাখা হত এবং অমঙ্গলের আশঙ্কায় কনের শরীর থেকে গয়না গাঁটি, তাবিজ, মাদুলী সব খুলে ফেলা হত।[৪৮] বিয়ের দিনে কনের শ্রী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কেউ কেউ এমনটি করত। গোসলের পর কনের হাতে একটি কাঁচাপয়সা দিয়ে তাকে কোলে

Dhaka University Institutional Repository

করে ঘরে আনা হত। কনে হলুদের দিন বাবার দেয়া লালপাড় সাদা শাড়ি[৪৯] পরবর্তী কালের প্রচলনে লালপাড় হলুদ শাড়ি পরত। বর পরিধান করত সাদা লুঙ্গি ও সাদা গেঞ্জি। বরের মাথায় সাদা টুপি থাকত। সোন্দা কোটাই-এর দিন রাত্রে সোহাগানরা গায়ে হলুদের উপচার তৈরি করে রাখত। কুলায় সজ্জিত গায়ে হলুদের উপচারে থাকত এক ফানা কলা, ধান, দূর্বা, হলুদ বাটা, মেহেদী বাটা, মাটির প্রদীপ, রুটি বা পান ও সুপারি। নতুন কুলাটি প্রথমে চুন দিয়ে সাদা রঙ করা হত। চুন-রঙ শুকিয়ে গেলে জর্দার রঙ, আলতা ও সবুজ রঙ দিয়ে ফুল লতাপাতা অংকন করা হত। এখন অবশ্য বিয়ের জন্য নক্সা করা কুলা কিনতে পাওয়া যায়। এক ফানা কাঁচকলাও চুন দিয়ে সাদা রঙ করে সোহাগানরা এতে আলতা বা জর্দার রঙ-এ তর্জনীর সাহায্যে ফোঁটা দিয়ে নক্সা অংকন করত। কয়েকটি দূর্বাঘাস একত্রে আঁটি বেঁধে নিচের অংশ সিগারেটের পান্নি কাগজে মুড়ে ফেলা হত। কিছু ধান রঙ করা হত সোনালী বা রূপালী আফসানে। কেউ কেউ আবার সিগারেটের পান্নি কাগজে একটি করে ধান মুড়ে নিত। আটা বা ময়দায় হলুদ অথবা হলুদ রঙ মিশিয়ে লবন ছাড়া চারটি রুটি অল্প তেলে হালকা ভাজা হত। রুটি চারটি একত্রে হলুদ স্বচ্ছ পান্নি কাগজে মুড়ে লাল সূতা বা পাঠ্‌ঠা দিয়ে বাঁধা হত। তেলায়ের সময় বরের দু'হাতে রুটি আর কনের হাতে পান থাকত। এই পান কনের সাথে তার শ্বশুড়ালয়ে দেয়া হত। বর/কনে চারদিক ঘুরে সবাইকে সালাম দিয়ে মেঝেতে পাতা নতুন শীতলপাটিতে বসত। তাদের সম্মুখে শিশুদের সারিবদ্ধভাবে বসানো হত। শিশুদের উপঢৌকন দেয়া হত একটি করে পোটলা। হলুদ কাপড়ে বাঁধা পোটলায় থাকত কলাসহ কয়েক রকম ফল, পয়সা, মুড়ি বা খই উখরা। শোনা যায়, ব্রিটিশ আমলে বালাবালির দিন সাতজন নাবালিকা অবিবাহিতা কন্যা শিশুকে দিয়ে রোজা রাখানো হত। মাগরিবের আযানের প্রাক্কালে তারা কনে শিশুর চারপাশে বসত। আযান দিলে সবাই পানি পান করত। তাদের সবাইকে প্লেটে করে ক্ষীর, পাঁচ রকম কাটা ফল, এক পোটলা মুড়ি ও এক পোটলা খই খেতে দেয়া হত।[৫০] সাত সোহাগানের হাতে রাখী ছুঁইয়ে বর/কনের হাতে রাখী পরানোর নিয়ম। এখানে উল্লেখ্য, আড়াই নাইয়র পর্যন্ত বর/কনের হাত থেকে রাখী খোলা নিষেধ। সাত সোহাগান কর্তৃক এক তেলাই বা তেলোয়াই সম্পন্ন হলে অন্য সবাই বর/কনেকে হলুদ দিত। প্রত্যেক সোহাগান তেলাই-এর সময় কলার ফানা বর/কনের মাথায় তিনবার ছোঁয়াত। সজ্জিত কুলা বুক থেকে কপাল সম্মুখে তিনবার উঠা নামা করানো হত। প্রদীপের আগুনে বর/কনের দু'কান সেঁকে তেলাই প্রদানকারী হলুদ বাটা নিজ ও বর/কনের কপালে তিনবার ছোঁয়াত। শেষে বর/কনের মুখে অল্প পরিমান মিষ্টি জাতীয় খাবার দেয়া হত। বিয়ের গোসল পর্যন্ত সাত তেলাই সম্পন্ন করার নিয়ম।

Dhaka University Institutional Repository

মাড়োয়া বা মারোচাঃ

মাড়োয়া হল চতুষ্কোন বিশিষ্ট মঞ্চ। মাড়োয়ায় বিয়ের বিভিন্ন মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়। উর্দুভাষী মুসলমানরা একে মারোচা বলে থাকে। মাড়োয়া সাধারণত বর/কনের ভাই ও দুলাভাই সম্পর্কীয়রা তৈরি করে। পূর্বকালে মুসলমানরা সোন্দা কোটাই-এর দিন রাত্রে বাড়ির উঠোনে আলপনা করা একটি কাঠের জলচৌকি পেতে মারোচা তৈরি করত। চারজন যুবক মূলসহ কলাগাছ কাঁধে নিয়ে জলচৌকির চারপাশ সাতবার প্রদক্ষিণ করত। এরপর জলচৌকির চারপাশে চারটি কলাগাছ পুঁতে ফেলত।[৫১] মারোচার উপর একটি হলুদ কাপড়ের চাঁদোয়া দেয়া হত। জলচৌকির সামনে দুটি অম্রপল্লব শোভিত আলপনা করা মাটির লোটা থাকত। ময়দার মিশ্রণে কাঠের চামচা ডুবিয়ে কলাগাছের চারকোনায় চারটি ছাপ অংকন করা হত। রঙ বেরঙ-এর ঘুড়ির কাগজে মারোচা সজ্জিত করা হত। জেমস ওয়াইজ লিখেছেন, হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল চার কলাগাছের তৈরি মারোচা। সেসময় মারোচা ছাড়া বিয়ে সিদ্ধ হত না।[৫২] হিন্দুদের বিয়েতে ভুইমালিরা বিবাহ অনুষ্ঠানের স্থানে মারোচা তৈরি করত। এ কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে বরের বাড়ি থেকে এক টাকা ও কনের বাড়ি থেকে আট আনা দেয়া হত।[৫৩]

গোয়ালা ও ধোপাদের বিয়েতে লাগানের দিন বিকেলে বাড়ির উঠোনে চারটি বাঁশ দিয়ে মাড়োয়া তৈরি করা হয়। সম্প্রতি গোয়ালাদের মাঝে বাঁশের সাথে চারটি কলাগাছ বাঁধার নিয়ম চালু হয়েছে। ঘুড়ির কাগজ, চুমকি, ঘাস, গেন্দাফুল, আমপাতা ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে মাড়োয়া সাজানো হয়। মাড়োয়ার উপর কাপড় দিয়ে চাঁদোয়া টাঙ্গানো হয়। মাড়োয়াতে আলপনা করা দু'টি পিঁড়ি থাকে। পিঁড়ির সম্মুখের মেঝেতেও আলপনা করা হয়। সেখানে থাকে দু'টি হাঁড়ি ও একটি কলস। গোয়ালারা হাঁড়িগুলি উল্টিয়ে তার উপর মাটির সরায় রাখা মাশকালায়ের ডালের মাঝে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালায়। ধোপারা জলপূর্ণ হাঁড়ির ভেতর পাঁচটি কড়ি ও হলুদ রাখে। কলসের উপর থাকে দু'টি সরিষা তেলের প্রদীপ। মাড়োয়ায় আচার পালন কালে প্রদীপ দু'টি জ্বালানোর নিয়ম। এর সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে পাঁচটি পুরি রাখা হয়। প্রত্যেকটি পুরির উপর অল্প পরিমাণ ক্ষীর থাকে। মাড়োয়া তৈরির কাজ সম্পন্ন হলে গোয়ালারা মাড়োয়াতে পাঁচজন শিশুকে বসিয়ে লুচি পায়েস খেতে দেয়। একে বলা হয় 'মাড়োয়া জুঠা কারনা'।[৫৪] এই আচার পালনের পরপরই বর/কনেকে মাড়োয়ায় হলুদ মাখা হয়। হলুদ মাখার সময় বর/কনের মা পিছনে দাড়িয়ে নিজ

Dhaka University Institutional Repository

শাড়ির আঁচল সন্তানের মাথার উপর রাখে। এসময় মাড়োয়াতে আরেকটি লোকাচার পালিত হয় যা ধোপাদের কাছে 'হালদি উঠানা' নামে পরিচিত। এ লোকাচারে সোহাগানরা ধান, দূর্বা ও ফুলের পাপড়ি দু'হাতে তুলে বর/কনের হাটু, কাঁধ ও কপাল ছুঁয়ে মায়ের শাড়ির আঁচলে রাখে। এরপর সোহাগানরা বর/কনের শরীরে হলুদ মাখায়।

জলভরণ:

বর/কনের স্নানের জল তোলা বিয়ের একটি উল্লেখযোগ্য আচারিক অনুষ্ঠান। হলুদের দিন প্রত্যুষ্যে শাঁখারী মা অন্য পাঁচজন আয়োর সঙ্গে নিকটস্থ জলাশয় থেকে স্নানের জল তুলতে যায়। নদী থেকে জল তোলার প্রাক্কালে বর/কনের মা একটি সিঁদুর চর্চিত পানকে খানিকটা চিনিতে মুড়ে গঙ্গামায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে বলে- 'বিয়ে অব্ আমার মাইয়া/পোলার, পান চিনি দিলাম।'[৫৫] বর্তমানে নদী দুষিত ও পুকুর নিকটস্থ না থাকায় তারা কালিবাড়ি থেকে কলসে ভরে আনে গোসলের পানি। আবার শাঁখারীদের কারো কারো নিয়ম অনুযায়ী বর/কনের দুলাভাইরা স্নানের জল তুলে আনে। যে ঘরে বিয়ে হয় সেখানে সতর্কতার সাথে দশামঙ্গল পর্যন্ত এই জল তুলে রাখার রীতি। বিবাহকালীন অন্যান্য সময়ে বর/কনের স্নানের জলের সাথে এই জল মিশিয়ে নেয়া হয়।

গোয়ালা বর/কনের স্নানের পানি বিয়ের আগের দিন অপরাহ্নে সংগ্রহ করার রীতি। পানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বর/কনেকে সাথে নিয়ে পাঁচ সোহাগান, মা, দাদী, নানী, বড়বোন, দুলাভাই বাদ্যবাজনা সহকারে গান গাইতে গাইতে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পানি আনতে যায়। বোন কাঁখে নেয় অম্রপল্লব সমেত আলপনা করা নতুন মাটির কলস। মায়ের এক হাতে ছুরি আর অন্য হাতে একটি পিতলের থালা থাকে। থালায় রক্ষিত থাকে জলন্ত প্রদীপ, আইপানের বাটি, সিঁদুরকৌটাসহ প্রতিটি পাঁচটি করে পান, সুপারি ও ছোট পিতলের হাঁড়ি। হাঁড়ির ভেতর মাশকালাই-এর ডাল থাকে। ছুরির মাথায় একটি সুপারি গাঁথা হয়। অতীতকালে ছুরির বদলে তালোয়ার ব্যবহার হত। পাকিস্তান আমল থেকে ছুরি ব্যবহারের প্রচলন হয়। বর/কনের দুলাভাইয়ের হাতে থাকে একটি কোদাল। মা নিজ হাতে পানি দিয়ে পুকুর পাড়/সিড়ি ধুয়ে পরিষ্কার করে সেখানে পাঁচটি আইপানের ছাপ ও সিঁদুর ফোঁটা অংকন করে। দুলাভাই কোদাল দিয়ে পুকুরপাড়ের মাটি কেটে মায়ের কোঁচরে দেয়। মা নিজ কোঁচর থেকে একমুঠো মাটি নিয়ে আইপান-সিঁদুর চর্চিত স্থানের পাশে রাখে। এ মাটির উপর পান-সুপারি রেখে পাঁচবার আইপানের ছিটা দেয়া হয়। বোন

Dhaka University Institutional Repository

ও দুলাভাই পুকুর থেকে পাঁচঘটি পানি তুলে কলসে ঢালে। স্বামী পুকুর থেকে পানি তুলে দেয় তার স্ত্রীকে, স্ত্রী সেই পানি কলসে ঢালে। পুকুর থেকে প্রতিবার ঘটি ভরে পানি তোলার কালে দাদী বা নানী কেউ একজন দুলাভাইকে জিজ্ঞেস করে- 'কিসকা বেয়াকা পানি ভারতা'। তখন দুলাভাই উত্তর দেয়- 'মেরা শালা/শালী অমুককা বেয়াকা পানি ভারতে'।[৫৬] কলসে ঘটি দিয়ে পানি ভরা কালে, কলসের মুখের মাঝ-স্থানে ছুরি স্থাপন করা হয়। এটি গোয়ালাদের কাছে 'পানিকাটনা' নামে পরিচিত। কলসে পানি ঢালার সময় সোহাগানরা জোকার তোলে। পানি ভরণ শেষে সবাই গঙ্গাকে প্রণাম করে বিয়েবাড়ী ফিরে আসে। পানির কলস অম্রপল্লব দিয়ে ঢেকে মাড়োয়াতে তুলে রাখা নিয়ম।

ঋষিদের বিয়েতে অধিবাসের সময় পাঁচজন ত্রয়ো একত্রে বাদ্যবাজনার সঙ্গে গান গাইতে গাইতে পানি তুলতে যায়। একে বলা হয় 'অধিবাসের জল'। ত্রয়ো দলের বোন বা ভাবীর কাঁখে ফুলের মালায় পেঁচানো কলস থাকে। অন্য একজন ত্রয়ো কুলাতে করে পান, সুপারি, মাটির প্রদীপ, ধান, দূর্বা, সিঁদুর, বাইটা ও ফুল নিয়ে সর্বআগে চলে। অতীতে পুষ্পশা পুকুর[৫৭] বা বুড়িগঙ্গা নদী থেকে বর/কনের স্নানের জল তুলে আনা হত। জলভরণ পর্বের পূর্বে ত্রয়োরা সিঁদুর চর্চিত পান, সুপারি, ধান, দূর্বা ও ফুল দিয়ে গঙ্গামাকে বিয়ের নিমন্ত্রণ জানাত। তারপর ছুরি দিয়ে নদীর পানিতে ক্রস চিহ্নের ন্যায় কাটার পর কলসে জল ভরা হত। এখন মন্দির বা রাস্তার কল থেকে অধিবাসের জল কলসে ভরা হয়। জল ভরা কলসের মুখ নতুন গামছা দিয়ে বেঁধে ত্রয়োরা বিয়ে বাড়ি ফিরে। কিন্তু বাড়িতে ঢোকার সময় প্রবেশদ্বারে শিশুরা তাদের গতিরোধ করে মিষ্টি খেতে চায়। এসময় একজন ত্রয়ো অম্রপল্লব দিয়ে শিশুদের মুখে পানিছিটা দেয়। অন্যজন সব শিশুর কপালে একটু হলুদ বাটা ছুঁইয়ে তাদেরকে মিষ্টি খাইয়ে দেয়। যে ঘরে অধিবাস অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে স্নানের জল সযত্নে তুলে রাখার রীতি। তার আগে অধিবাস ঘরের দরজা থেকে কনের মা জলপূর্ণ কলসটি তুলে ঘরের ভেতর রাখে। সেই কলসের উপর নিজ শাড়ির আঁচল বিছায়। পাঁচজন ত্রয়ো মায়ের শাড়ির সেই আঁচলের উপর তাদের শাড়ির আঁচল পাতে। বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত সধবারা সবাই আঁচলে পয়সা রাখলে কনের মা সে পয়সা তুলে নিয়ে আঁচলের আড়ালে রাখা কলসের মধ্যে ছাড়ে।[৫৮] এসময় গীতগাউনীরা সংগীত পরিবেশন করে। শেষে কলসে রাখা পয়সা গীতগাউনীদের দেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বকালে পুরোনো ঢাকার মুসলমান সমাজে বালাবালির দিন বর/কনের গোসলের পানি সাতজন অবিবাহিত কিশোরেরা নদী থেকে আনতে যেত। এদের মধ্যে কেউ বউ সাজত, কেউবা বর। অন্য একজন কাঁখে কুলা নিত। কুলায় থাকত হলুদ, সোন্দা, পান, সুপারি, ধান, দূর্বা ও কলা। কিশোরেরা সাথে আরো নিত লাল-সবুজ রং-এ আলপনা করা দু'টি মাটির লোটা ও সরা। লোটা দু'টির একটি ছিল চারমুখ বিশিষ্ট, যেখানে চারটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো হত। লোটার ভেরত রাখা হত সাতটি আমপাতা। মাটির সরাতে ছোট্ট চাটাই-এর উপর সরিষা তেলের প্রদীপ জ্বালানো হত। কিশোরেরা আটার তৈরি পাতলা মিশ্রণে চামচা ডুবিয়ে বাড়ির সদর দরজা থেকে নদীর পাড় পর্যন্ত মাটিতে ছাপ অংকন করে চলত। নদীর পাড়ে গিয়ে কিশোরেরা ওজু করত। নদীর পানি অঞ্জলি ভরে তিনবার তুলে তাতে দোয়া-কালাম পড়ত। এরপর তারা লোটায় রক্ষিত আমপাতা ও চাটাইয়ে জলন্ত প্রদীপসহ নদীর পানিতে ভাসিয়ে দিত। শেষে নদীর পানিতে লোটাটি ডান বাম ঘুরিয়ে দ্রুত তাতে পানি ভরে নিত। জলপূর্ণ লোটা মাটির সরাতে ঢেকে কিশোরেরা বাড়ি ফিরে আসত। এ পানি সতর্কতার সাথে তুলে রাখার নিয়ম ছিল।[৫৯]

মেহেদী পারা ও বর/কনের হাতে মেহেদী আঁকা:

স্থানীয় মুসলমানদের বিয়েতে বর/কনের হাতে মেহেদী লাগানো একটি অত্যাবশকীয় বিবাহ রূপসজ্জা হিসেবে পরিগনিত। একসময় গায়ে হলুদের দিন সকালে সাত সোহাগান একটি নতুন কুলাতে সিঁদুর, সরিষার তেল, আস্ত পান, মিষ্টি ও মালা নিয়ে গাছ থেকে মেহেদী পারতে যেত। গাছের তলায় একটি পান ও তিনটি মিষ্টি রেখে গাছকে বিয়েতে নিমন্ত্রণ করা হত। মেহেদী পারার পূর্বে সোহাগানরা গাছকে বিয়ে দিয়ে সোহাগান করে নিত। এ লক্ষ্যে সরিষা তেলে সিঁদুর গুলিয়ে গাছের তলায় বা স্থান বিশেষে গাছের ডালে সাতটি সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া হত। এরপর গাছের ডালে ফুলের মালা পরানো হত।[৬০] কোন কোন স্থানে লাল সূতা বাঁধার রীতি।[৬১] শেষে কুলা দিয়ে মেহেদী গাছকে বরণ করা হত। সোহাগানরা গান গেয়ে গাছ থেকে মেহেদী পারত।

সোহাগানরা বিয়ের মেহেদী শীলপাটায় বেঁটে মাটির বা প্লাস্টিকের ছোট বাটিতে তুলে কুলায় রাখে। ধনীরা বিয়ের সময় মেহেদী লাগাতে কনেকে বিউটি-পার্লারে নিয়ে যায়। টিউব মেন্দী দিয়ে কনের দু'হাতের এপিঠ ওপিঠ সুন্দর করে নক্সা অংকন করা হয়। মধ্যবিত্ত পরিবার তাদের পরিচিত যুবতীদের মধ্যে যারা সুন্দর করে মেহেদী লাগাতে পারে, তাদেরকে দিয়ে কনের হাতে পায়ে মেহেদী লাগায়।

Dhaka University Institutional Repository

একসময় বাটা মেহেদী কনের দু'হাত ভরে লাগানো হত। একে স্থানীয় ভাষায় 'লেপা মেন্দি' বা 'সুপ মেন্দি' বলা হয়। প্রচলিত ধারণা, কনের হাতের মেহেদীর যত লাল হবে, কনে ততই স্বামী সোহাগিনী হয়ে থাকে।[৬২] শেষ নবী দাড়িতে মেহেদী লাগাতেন বলে অনেকেই পায়ে মেহেদী লাগানোকে গুন্নাহ্‌র কাজ মনে করত। বিয়েতে বরের হাতের আঙ্গুলের মাথায় টুপি পরানোর মত ও হাতের তালুতে বাটা মেহেদী লাগিয়ে লাল ফোঁটা অংকন করত।

জামাই ছান:

শাঁখারীদের মধ্যে বিয়ের আগের দিন জামাই ছান অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন কনের বৌদি, ঠাকুরমা, দিদিমা সহ যাদের সাথে বরের রসিকতার সম্পর্ক রয়েছে, এমন পাঁচজন আয়ো জামাই ছান (স্নান) করাতে বরের বাড়িতে আসে। সঙ্গে থাকে প্রয়োজনীয় সামগ্রি যেমন, হলুদ বাটা, তেল, সাবান, ধান, দূর্বা, আগুনে মুছরি, হাঁসের ডিম ও মিষ্টি। কনের বাড়ির আয়োরা বরের হাত পা সহ মুখমন্ডলে হলুদ ও মাথায় তেল মাখে। গোসলের পর ধান-দূর্বায় আশীর্বাদ করে আগুনে মুছরি ও হাঁসের ডিম বরের মাথার উপর দিয়ে পিছনে ছুড়ে ফেলে।

অধিবাস:

সাহা ও ঋষি সমাজে বিয়ের দিন ভোরবেলায় বর/কনের অধিবাস হয়। অধিবাস শুরুর আগে বর/কনেকে স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র পরিধান করানো হয়। এয়োরা বর/কনেকে নতুন শীতলপাটিতে বসিয়ে তাদের কপালে তিনবার হলুদ ছোঁয়ায় ও মাথায় ধান-দূর্বা ছিটিয়ে আশীর্বাদ করে। এরপর বর/কনের সমস্ত শরীরে হলুদ মাখা হয়। এসময় ঋষি কনের হাতে এয়োরা শাঁখা পরায়। সেদিন বর/কনে ও তাদের বাবা-মা'য়ের উপোস থাকার রীতি। ঋষি বাবা ও মা কন্যাদানের পর উপোস ভাঙ্গে। অন্যদিকে, সাহা'রা বৃদ্ধি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উপোস থাকে।

ধান কোটা:

শাঁখারীদের বিয়েতে বৃদ্ধি অনুষ্ঠান আরম্ভের পূর্বে কনের বাড়ির আয়োরা কাহেলছিয়ায় এক পোয়া ধান কোটে। এ থেকে অর্ধেক পরিমান কোটা চাল দুধ যোগে মিষ্টান্ন রান্না করা হয়। বৃদ্ধি অনুষ্ঠান সম্পন্নের পর কনে তার পিতার সাথে বসে এই মিষ্টান্ন খায়। বাকি অর্ধেক কোটা চাল তুষসহ রেখে দেয়া হয়। বিয়ের

Dhaka University Institutional Repository

দিন কনের ছোট ভাই-বোন, বৌদি সহ রসিকতা সম্পর্কীয়রা দুষ্টামীর ছলে তুষসহ চালের মিষ্টান্ন রান্না করে বরকে খেতে দেয়।[৬৩]

বিয়ের পিঁড়িতে বসার পূর্বে ধোপা বরের মাড়োয়ায় ধান কোটার রীতি। বর তার চারজন জ্ঞাতিভাইকে নিয়ে লাগানের দিন পাল্টাপাল্টি খেলায় কাপড়ে যে ধান বাঁধা ছিল সেই ধান কোটে। এসময় মন্ত্র পাঠরত ব্রাহ্মণ তাদের চারপাশ পাঁচবার ঘুরে তাদেরকে 'কাঁচাসূতা'তে বেঁধে ফেলে। বরের সাথে যারা ধান কোটে তাদের একজন কোটা ধান থেকে চাল বের করে। অন্যজন ব্রাহ্মণের বাঁধা কাঁচাসূতা কেটে ফেলে। বিবাহ আচারে ব্যবহারের জন্য এ চাল ও কাঁচাসূতা ব্রাহ্মণকে দেয়া হয়।

বৃদ্ধিঃ

ঢাকার সাহা, শাঁখারী ও ঋষিদের বিবাহাদি উপলক্ষে অবশ্য করণীয় শ্রাদ্ধকে বৃদ্ধি বলা হয়। বৃদ্ধি অনুষ্ঠানে বর/কনের পিতা তার প্রয়াত পিতৃপুরুষের নামে জল ও পিন্ড দান করে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বর/কনের পিতা পরিধান করে নতুন ধুতি, পাঞ্জাবী বা গেঞ্জি ও গলায় কাঠের মালা। ঋষি পিতা এসময় কোমরে লাল কাইতন বাঁধে। বিয়ের দিন সকাল বেলায় ব্রাহ্মণের দেয়া শুভ লগ্ন অনুসারে বৃদ্ধিপূজা আরম্ভ হয়। পূজার প্রয়োজনীয় উপচার হিসেবে ব্যবহৃত হয় সোয়াকেজি চাল, পাঁচ রকমের পাঁচটি ফল, বটপাতা, ও মাটির সরা। মাটির সরাতে থাকে অল্প পরিমানে খই, উখরা, চানাচুর, ছাতু ও কলা। প্রয়াত পূর্বপুরুষের নামে বর/কনের পিতা একটি কাঁসা বাটিতে কলা, চাল, কাঁচাদুধ, চিনি ও মধু একত্রে মিশিয়ে পাঁচ বা সাতটি কলার খোলে ভরে গোলাকৃতি পিন্ড তৈরি করে। এরপর প্রতিটি পিন্ডের উপর একঠি করে তুলসী পাতা স্থাপন করা হয়। এ সময় ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়তে থাকে। বর/কনের পিতাও ব্রাহ্মণের সাথে মন্ত্র পাঠ করতে থাকে। মন্ত্র পাঠকালীন সময়ে ব্রাহ্মণ তালিকা অনুসারে যখন যে প্রয়াত পুরুষের নাম উচ্চারণ করে পিন্ড-জল দানকারী তার নামে তৈরি করা পিন্ডে জল ঢালে। প্রয়াত পূর্বপুরুষের নামে পিন্ড ও জল দান শেষে বর/কনের পিতা প্রণাম করে বলে- 'পূর্ব পুরুষের নামে পিন্ড দিলাম। আমার ছেলে/মেয়েকে তুমি আশীর্বাদ কইরো।'[৬৪] বৃদ্ধি অনুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মণকে নববস্ত্র, টাকা, গামছা ইত্যাদি দাক্ষিণ্য দেয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য, শাঁখারীদের মাঝে কনের বাড়িতে বৃদ্ধি পূজা আরম্ভের প্রাক্কালে ব্রাহ্মণকে দিয়ে হাতিহরা প্রদীপ জ্বালানো হয়। এটি পরবর্তী দশদিন পর্যন্ত বিবাহের মাঙ্গলিক আচারানুষ্ঠান পালনকালে জ্বালানোর রীতি রয়েছে। পক্ষান্তরে, এসময় বরের বাড়িতে একটি নতুন গামছায় কলার মাইজ পেঁচিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দর্পণ তৈরি করে সেটি বরের মায়ের হাতে দেয়। বরের মা ব্রাহ্মণের তৈরি করা দর্পণটি সযত্নে তুলে রাখে।

কোল লওনী ও কান বিন্দানী:

বর/কনের মঙ্গলার্থে অনুষ্ঠেয় প্রয়াত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধি সম্পন্নের পর পরই শাঁখারী বর/কনে তাদের পরিজনদের সবার কোলে একবার করে বসে। এ সময় বর/কনে সকলকে প্রণাম করলে তারা সকলে আর্শিবাদ করে। এই অনুষ্ঠানটি তাদের কাছে 'কোল লওনী' নামে পরিচিত। কনের বাড়িতে এসময় কনেকে কোলে নিয়ে বাবা মা অনেক কান্নাকাটি করে। এই অনুষ্ঠান শেষ হলে কনেকে ঘরে নিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে আত্মীয়স্বজনদের সামনে আনা হয়। আত্মীয় স্বজন সবাই কনেকে বিয়ের উপহার প্রদান করে। শাঁখারীরা এই অনুষ্ঠানটিকে বলে 'কান বিন্দানী'।

হালদি উতারনা:

ধোপা সোহাগানরা 'হালদি উতারনা' (হলুদ নামানো) লোকাচারটি বিয়ের দিন বর/কনের গোসলের পূর্বে পালন করে থাকে। তারা প্রথমে বর/কনের শরীরে হলুদ মাখে, তারপর শরীর ঢলে গায়ের হলুদ ছাড়ায়। এ সময়ে একটি পাথরের ছোট নোড়া বর/কনের কপাল, দু'গাল, বাহু ও হাঁটু ছুঁইয়ে নযর নামানো হয়। পাঁচ সোহাগানের প্রত্যেকে একবার করে নযর নামিয়ে থাকে।[৬৫]

আমগাছের সাথে কোলাকুলি:

অতীতে গোয়ালাদের বিয়েতে এই লোকাচারটি কনের বাড়ীতে পালিত হত। বিয়ের দিন কনে গোসলের আগে বাড়ির ভেতরের একটি আমগাছকে আইপান-সিঁদুরে চর্চিত করত। এরপর গাছের চারপাশ ঘুরে সাদা সুতায় গাছটি বাঁধত। শেষে কনে গাছের সাথে কোলাকুলি করত। বর্তমানে এই প্রথাটি অপ্রচলিত।

ক্ষৌর কর্ম:

আগে বিয়ের দিন বরের গোসলের আগে নাপিত আসত। নাপিত বরের ও তার আপন চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো ভাই, বিশেষ করে অবিবাহিত যারা, তাদের সকলের মাথার চুল, দাড়ি,

Dhaka University Institutional Repository

হাতে-পায়ের নখ কেটে দিত। নাপিতের পারিতোষিক পরিশোধ করতে হত বরকেই। নাপিতরা বরের কাছ থেকে কখনোই এক টাকার কম পেত না। খানদানি পরিবার হলে তো কথাই নেই, কোন কোন সময় নাপিতরা বিশ-পঁচিশ টাকা আয় করতে পারত। এছাড়াও একটি কুলায় আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে নাপিতের জন্য বখশিস তোলা হত।[৬৬] এর সাথে ঘর থেকে চাল, ডাল, আলু, পেয়াজ, বেগুন সিধা দেয়া হত। বর ও বরযাত্রীর হাজামাত সম্পন্নের পরপরই সবাই রঙ খেলত। একে অপরের গায়ে রঙ মাখামাখি করে আনন্দ ফূর্তি করত। রঙ খেলার সূচনা ঘটত নাপিতকে দিয়ে। কেউ কেউ গুড়া রঙ আস্তে করে নাপিতের মাথায় দিয়ে পিছন দিক থেকে এক গ্লাস পানি নাপিতের মাথায় ঢেলে দিত।

ধোবানী কর্তৃক পালিত লোকাচারঃ

গোয়ালা কনের স্নানের পূর্বে এই লোকাচার পালনের জন্য ধোবানীকে ডাকা হত। ধোবানী একটুকরো কাঁচাহলুদ কনের থুতনিতে ছুঁইয়ে বলে- 'তেরা মু সোন্দার, না মেরা মু সোন্দার।' কনে উত্তর দেয়- 'মেরা মু সোন্দার।' আবার কনের থুতনিতে হাত দিয়ে বলে-'তেরা মু কালা, না মেরা মু কালা।' কনে উত্তর দেয়- 'তেরা মু কালা।' এরপর একটুকরো আদা কনের মুখে ছুঁইয়ে বলে- 'তেরা মু ঝাল, না মেরা মু ঝাল।' কনে উত্তর দেয়- 'তেরা মু ঝাল।' সর্বশেষে একটু গুড় কনের মুখে দিয়ে বলে- 'তেরা মু মিঠা, না মেরা মু মিঠা।' কনে বলে- 'মেরা মু মিঠা।'[৬৭] এই আচার পালন সম্পন্ন হলে কনের মা সোয়াকেজি চাল, পাঁচ রকম তরকারি, সরিষার তেল ধোবানীকে সিধা দেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিয়ের দিন ধোপা কনের স্নানের আগে পাঁচ সোহাগান কর্তৃক এই লোকাচারটি পালিত হয়।[৬৮]

বিয়ের স্নানঃ

পুরোনো ঢাকায় বিয়ের দিন বর/কনেকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করানো প্রচলিত রীতি। স্নানের প্রাক্কালে তাদের শরীরে হলুদ মাখানো হয়। শাঁখারীদের বিয়েতে এসময় সম্মানযোগ্য ব্যক্তি বর/কনের কপালে হলুদ ছোঁয়ায় এবং মাথায় সর্বপ্রথম পানি ঢেলে স্নানকার্য শুরু করেন। এরপরই শাঁখারী ত্রয়োরা বর/কনের গায়ে হলুদ মাখিয়ে স্নান করায়। পূর্বকালে মুসলমান বর/কনেকে মারোচাতে স্নান করানোর রেওয়াজ ছিল। মুসলিম ত্রয়োরা বিয়ের দিন কূয়ার পাড় ধৌত করে কূয়ার মুখপাড়ে সাতটি সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে কূয়াকে পবিত্র করে তারপর কূয়া থেকে পানি তুলত।[৬৯] পরবর্তীকালে সাত সোহাগান রাস্তার কল থেকে পানি ভরে নিয়ে আসত। পানি আনতে আসা যাওয়ার পথে তারা সবাই সমস্বরে গান গাইত।

লোকবিশ্বাস, যে সোহাগান বর/কনের মাথায় সর্বপ্রথম পানি ঢালে সে অনেক নেকি লাভ করে এবং তার জোড়া কায়েম[৭০] থাকে। বর/কনের মাথায় সর্বপ্রথম কলস দিয়ে পানি ঢালার অগ্রাধিকারিনি তাদের ভাবীরা পেত। বর/কনের মাথায় পানি ঢালার পর সপ্তম ও শেষ তেলাই সম্পন্ন করা হত। বিয়ের আগের দিন রাত্রে সুগন্ধির জন্য কনের মাথার চুলে সোন্দা বেটে দেয়া হত। স্নানে বর/কনের মাথার চুল ধোয়া হত গিলা বাটা দিয়ে। প্রথমে ডান এরপর বাম দিকে সাবান মাখা হত। বর্ষীয় সধবা নারীরা বর/কনের গায়ে সাবান মাখলেও পায়ে মাখত না। এ কাজ বন্ধু-বান্ধবী, ভাবী ও দুলাভাইরা করত। স্নানের শেষ পর্যায়ে কাঁচা দুধে ধান ও দূর্বা মিশিয়ে বর/কনের মাথায় ঢেলে দেয়া হত। স্নানকালে বর/কনের তিনবার ওজু করার নিয়ম। স্নান শেষে বর/কনের মা তাদের হাত ও পায়ের নখ নিজ দাঁত দিয়ে 'খুটত'। কেউ কেউ আবার সন্তানের হাতে পায়ে চুমু দিত। একটি মাটির সরায় ধূপ, দূর্বা, নারিকেলের ছোবড়া ও সরিষা বর/কনের মাথার উপর দিয়ে পিছনে ছুঁড়ে ফেলা হত। প্রচলিত বিশ্বাস, অমঙ্গল দূর হবে এতে। এরপর বর/কনের হাতে একটি কাঁচা পয়সা দিয়ে কোলে করে ঘরে আনা হত। সাধারণত ভাবী ও দুলাভাইরাই বর/কনেকে কোলে করে ঘরে আনত। কনের হলুদের ভেজা শাড়ি মারোচাতে ফিরোল্টার দিন পর্যন্ত রেখে দেয়া হত। কনে স্নানের পর বরের বাড়ি থেকে দেয়া মুখদেখাই-এর শাড়ি পরিধান করে। গায়ে হলুদ ও মুখ দেখাই শাড়ি কনের বর্ষীয় সধবা আত্মীয়কে দেওয়ার রেওয়াজ আছে।

ধোপা ও গোয়ারা বর/কনেকে বিয়ের দিন অপরাহ্নে স্নান করানো হয়। গোয়ালা সোহাগানরা স্নানের শেষ পর্বে পুকুর থেকে আনা কলসের পানি বর/কনের মাথায় ঢালে। তবে বরের মাথায় অর্ধেক কলস পানি ঢেলে বাকি অর্ধেক পরবর্তী আচারের জন্য তুলে রাখা হয়। স্নানের পর বর/কনেকে ঘরে নেয়ার কালে তাদের নযর নামানোর উদ্দেশ্যে একটি মাটির খরায় জ্বলন্ত গইটা ঘরের প্রবেশদ্বারে রাখে, বাম হাতে সরিষা নিয়ে বর/কনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনবার ঘুরিয়ে তা গইঠার আগুনে নিক্ষেপ করে। সরিষাদানা ভস্মিত হলে মাটির খরাটি মেঝেতে উল্টে ফেলা হয়। কনে তার বাম পায়ের গোড়ালি ও বর ডান পায়ের গোড়ালি দিয়ে ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে। এসময় বর/কনের পিছন ফিরে তাকানো রীতিবিরুদ্ধ। ধোবানী মায়েরা বর/কনের 'নযরগজর' নামানোর জন্য টোকাটাকি জ্বালায়। এবং একটি মাটির প্রদীপ বর/কনের চেহারার সম্মুখে ডান থেকে বামদিক পাঁচবার ঘুরাতে ঘুরাতে 'টোকাটাকি টোকাটাকি' বলে প্রবেশদ্বারের মেঝেতে উল্টে ফেলা হয়। বর/কনে সেটি তাদের বাম পায়ের গোড়ালি দিয়ে ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে। গঙ্গাপূজা সমাপ্তির পর নদীতে নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে ভাঙ্গা প্রদীপের

Dhaka University Institutional Repository

টুকরাগুলো সযত্নে তুলে রাখা হয়। শাঁখারী বর/কনের স্নান শেষে এয়োরা ধান, দূর্বা, আগুনে মুছুরি ও হাঁসের ডিম দিয়ে তাদেরকে আশীর্বাদ ও বরণ করে। শাঁখারীদের বিয়ের পিঁড়িতে বর/কনের হলুদের কাপড় বিছানোর রীতি। সেজন্য স্নানের পরপরই বরের হলুদের ধূতি ও কনের শাড়ি দ্রুত শুকানো হয়।

কনে সাজঃ

ব্রিটিশ আমলে আলতা ছিল কনে সাজের একটি অন্যতম প্রসাধন সামগ্রি। হিন্দুদের বিয়েতে কনের হাতে মেহেদী লাগানোর প্রচলন নেই। হিন্দু কনের হাত-পা ও মুসলিম কনের পা আলতা দিয়ে রাঙ্গানো হত। মুসলমান সমাজে বিয়ের দিন বরপক্ষ আলতা না আনলে বা আনতে ভুলে গেলে অনেকে বিয়ে ভেঙ্গে দিত।[৭১] কনের চোখে কাজল স্থান বিশেষে মুসলমান কনের চোখে সুরমাও পরানো হত। মুসলমান নারীরা কনের দাঁত মিছরি দিয়ে ঘষে দিত। হিন্দু কনের কপাল থেকে গাল পর্যন্ত চন্দনের ফোঁটা অংকন করা হত। কেউ কেউ সামান্য একটু সিঁদুর কনের ঠোঁটে হালকা করে মাখত।[৭২] ঢাকায় লিপস্টিকের প্রচলন ঘটার পূর্বে লাল ট্যাবলেট কথিত একটি ঠোঁটের প্রসাধন ছিল। সেটি জিহবার সাথে একটু ভিজিয়ে ঠোঁটে মাখা হত। এরপরে কনের হাতে-পায়ের নখে নেলপলিশ ও কপালে নেলপলিশের টিপ দেয়া হত। স্থানীয় নারীরা নানান কারুকলার নক্সায় খোপা বাঁধতে পারত। কনের খোপায় জুরাবন পরানো হত। জেমস ওয়াইজের তথ্যানুসারে, উনিশ শতকে হিন্দুদের বিয়েতে কনের মাথায় মালাকারদের তৈরি খোপা পরানো হত। চুলের খোপার একদিকে থাকত বেলি ফুল অন্য দিকে থাকত গোলাপ।[৭৩] বরপক্ষ বিয়েতে তাদের সামর্থ্যের আলোকে কনেকে নানাবিধ স্বর্ণালংকার উপঢৌকন দিত। কাঁঠাল পাতায় তৈরি ফুলের গহনাও কনেকে পরানো হত। হিন্দুদের মাঝে কনে বিয়ের দিন বাবার দেয়া লাল রেশমি শাড়ি পরিধান করত ব্লাউজ ও পেটিকোট ছাড়া। উনিশ শতকে মালাকারদের বিয়েতে কনেকে মুর্শিদাবাদের রেশমের শাড়ি পরানো হত।[৭৪] মুসলমান কনে কাবিনের সময় পাড়বিহীন লাল শাড়ি পরত যা লালসালু কাপড় নামে পরিচিত ছিল। এই শাড়িতে নববধূর চেহারা বর আয়নাতে প্রথম দর্শন করত বলে স্থানীয়রা একে মুখদেখাই-এর শাড়ি বলত। হিন্দু কনের মাথায় টোপর ও মুসলিম কনের মাথায় মুকুট পরানোর রেওয়াজ আছে। আগে মুকুটে পাখির পালক দেয়া থাকত। মুসলিম কনেকে নাকে নথ পরানোর কালে সাতজন সধবার নাক স্পর্শ করার নিয়ম। পাকিস্তান আমলে কনেসাজে স্নো, পাউডার, নেলপলিশ, আলতা, কাজল, লিপস্টিকের ব্যবহার চালু হয়। পনের বিশ বছর আগেও পরিচিতদের মাঝে যারা কনেকে

Dhaka University Institutional Repository

সাজাতে পারত মূলত তাদের আগে থেকে বলে রাখা হত। তারা বিনা পারিতোষিকে কনে সাজাত। সম্প্রতি কনেকে পার্লারে নিয়ে সাজানো হয়ে থাকে।

বর সজ্জা:

বিবাহ যাত্রার পূর্বে বরসজ্জা একটি অত্যাবশকীয় আচার হিসেবে পরিগণিত। সাধারণত বরের ভাবী, দুলাভাই ও বন্ধুবান্ধবরা বর সাজায়। হিন্দু বিয়েতে বোন-জামাইরা বরকে নতুন ধূতি ও পাঞ্জাবী পরিধান করায়। বৌদিরা বরের কপাল থেকে গাল পর্যন্ত চন্দনের ফোঁটা অংকন করে দেয়। ইদানিং বর তার কপালে শুধুমাত্র চন্দনের তিলক ঠেকায়। শাঁখারীদের কেউ কেউ বরের চোখে কাজল ও ঠোঁটে সামান্য একটু লিপষ্টিক মাখে।[৭৫] সাহা বর স্নো, পাউডার ও চোখে কাজল পরে। এছাড়া বর তার হাতে ঘড়ি, আংটি ও গলায় স্বর্ণের চেইন পরে। হিন্দুদের বিয়েতে বর সজ্জার শেষ পর্বে বরের মাথায় টোপর পরানোর রীতি। ঋষি মা জয়জোকার ধ্বনি তুলে বরের মাথায় টোপর পরিয়ে দেয়। মুসলমানদের বিয়েতে বরের দাঁত মিছরি দিয়ে ঘষা হত। দুলাভাই বরের চোখে সুরমা পরাত, গায়ে আতর মাখত। মুসলমানদের এ আচার সম্পর্কে মোমেন চৌধুরী লিখেছেন- ' ঢাকার আদিবাসী সমাজে বরসজ্জাকে মেয়েলী আচার হিসেবে গণ্য করা যায়। বিবাহের দিন বর-কনেকে ত্রয়োস্ত্রীরা গোসল করান। তারপর তাদের ঘরে আনা হয়। বরকে কাপড় পরায় সাতজন যুবক। কিন্তু আচকান পরানো সময় তারা সরে দাঁড়ায়। মা সাত যুবকের গায়ে আচকান ছুঁয়ে দিলে তারা ছেলের গায়ে আচকান পরায়। মাথার ফেটা (পাগড়ী) সাতজন জীয়স (ত্রয়োস্ত্রী)-এর মাথায় এক এক করে পরিয়ে অতঃপর বড়োচাচী ছেলের মাথায় পরিয়ে দেন। সেরা (কপালে পরানো হয়) সাত জীয়সের কপাল ছুঁয়ে বড়োচাচী ছেলের কপালে পরান। তারপর সাত যুবক মিলে বরের গলায় মালা পরায়।[৭৬]

বর বিদায়:

পূর্বকালে বরের মায়েরা ছেলের সাথে বিয়ে করাতে যেত না। যাত্রাকালে বর মায়ের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিত। স্বাধীনতা উত্তরকালে মুসলমানরা তো বটেই, হিন্দুদের কোন কোন বর্ণে ছেলের বিয়েতে মায়ের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। মুসলমান বিয়েতে বরসজ্জা সম্পন্ন হলে মা কর্তৃক 'দইমঙ্গল' বা 'দাইমাঙ্গাল' আচার পালনের রীতি। এই আচার পালনের উদ্দেশ্যে মধ্যাহ্নভোজে রান্না করা ভাত বা পোলাও থেকে অনেকখানি 'আগভাত' বা 'আগপোলাও' তুলে রাখা হয়। একটি গামলায় সেই

Dhaka University Institutional Repository

আগভাত বা পোলাও-এর সাথে দই ও চিনি মিশিয়ে মা প্রথমে বর-পুত্রকে খাওয়ায়। পরে উপস্থিত সকলে এই দইভাত খাওয়ার সুযোগ পায়। এ প্রসঙ্গে মোমেন চৌধুরী লিখেছেন- 'ঢাকায় দধি-মঙ্গলের জন্যে এক হাঁড়ি দই আগে থেকে রেখে দেয়। এক পাতিল ভাত গামলায় ঢেলে তাতে দই মাখিয়ে দিয়ে বর তিন লোকমা দই-ভাত খায়। অন্যেরাও তাতে অংশগ্রহণ করে।'[৭৭] দইমঙ্গল সমাপ্তির পর বরের মা তার হাতের তালুতে তেল নিয়ে বরের মাথায় দেয়। বরও অনুরূপভাবে মায়ের মাথায় তেল মাখে। বিদায়কালে বর মাকে বলে- 'মা তোর লিগা বান্দি আনবার যাই।'[৭৮] বিয়ের উদ্দেশ্যে গমনের পূর্বে শাঁখারী মা ছেলেকে নিজ কোলে বসিয়ে দুধ ও সন্দেস খাওয়ায়। এরপর বর, বরের মা ও পরিজনেরা সবাই কান্নাকাটি করে। যাত্রাকালে বর মাকে বলে- 'মা বিয়া করতে যাইতাছি।'[৭৯] এসময় মা ছেলের হাতে দর্পণ দিয়ে তাকে বিদায় জানায়। বাসী বিয়ের আগ পর্যন্ত বরের হাতে দপর্ণ রাখার নিয়ম। অতীতে গোয়ালাদের বিয়েতে নাপিতের কাছ থেকে দর্পণ কিনে আনা হত। নাপিত লাল রুমালে একটি পান ও আমপাতা পেঁচিয়ে দর্পণ তৈরি করত। বর্তমানে বিবাহ সামগ্রির দোকানে দর্পণ কিনতে পাওয়া যায়। বিবাহ যাত্রার প্রাক্কালে গোয়ালা বরকে মাড়োয়ায় নেয়া হয়। মাড়োয়ায় বরের মা হাতে এক গ্লাস দুধ নিয়ে বসে থাকে। মায়ের পাশে মাসি বা বোন এক খিলি পান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বর মায়ের চারপাশ সাতবার ঘুরে এবং প্রতিবার ঘুরে আসার পর এক চুমুক দুধ পান করে। এভাবে সাত চুমুকে গ্লাসের সমস্ত দুধ পান করার নিয়ম। দুধ পান শেষে মা নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে ছেলের মুখ মুছিয়ে দেয়। এরপর ছেলের মুখে এক খিলি পান দেয়। মা ছেলের হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের নখ দাঁত দিয়ে কাটে। যাত্রাকালে বর মাকে বলে- 'মা মায় যাতে।' মা জিজ্ঞেস করে- 'কাহা যাতা?' বরের প্রত্যুক্তি- 'তেরা কিলে বান্দি লানে যাতে।'[৮০] বিয়ের উদ্দেশ্যে গমনের পূর্বে ধোবানী মা ছেলেকে নিজ হাতে লাড্ডু মিষ্টি, দুধ ও পানি খাওয়ায়। এরপর খিলিপান ছেলের মুখে দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। এ আচারটি ধোপাদের কাছে 'শপ্‌কে দেনা' নামে পরিচিত। আচার পালন শেষে ধোবানী মা ছেলের হাতে অম্রপল্লব ও সাদা সূতায় বাঁধা একটি কাজলদানী ছেলের হাতে তুলে দেয়। সাহা মা দু'পা মেলে মাদুরে বসে ছেলেকে এক গ্লাস দুধ পান করায়। এরপর মা ছেলের মুখমন্ডল ও বুকে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলে বর মাকে প্রণাম করে। এসময় ত্রয়োরা বরের হাতের তালুতে নারিকেল তেল দেয়। বর সেই তেল মায়ের মাথায় মাখে। সাহা বিশ্বাস মতে, মায়ের মাথায় তেল মাখার অর্থ বিবাহিত জীবনে বউ-এর উপর মা'কে সেবায় প্রাধান্য দেয়া। বিবাহ যাত্রাকালে ত্রয়োরা বরের হাতে দর্পণ ও কলাগাছের মাইজ দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহযাত্রাঃ

বিপদাপদ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সাহা ও ঋষিরা বিবাহ যাত্রায় বরের সঙ্গে একজন ভাগ্নেকে রাখে। সেই ভাগ্নে বিয়ে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বরের সাথেই থাকে। মুসলমান সমাজের বিবাহযাত্রা পরিচয়ে মোহাম্মদ আবদুল কাইউম উল্লেখ করেছেন- 'অবস্থাপন্নদের বিয়েতে, বরযাত্রীরা মিছিল করে টম্‌টম্‌গাড়ি হাঁকিয়ে চশবাজার ঘুরে, ক'নে বাড়িতে যেতো। বরের সঙ্গে আরো দুয়েকটি টম্‌টম্‌ গাড়ি ছাড়াও পেছনে থাকতো ঘোড়ার গাড়ির মিছিল। এই মিছিল চশবাজারের চারপাশে কয়েক চক্কর ঘুরে তারপর যথস্থানে রওয়ানা দিত। কোন বরযাত্রী চশবাজারের চতুষ্পার্শ্বে কয় চক্কর ঘুরতো, তাতে বরপক্ষের মান-ইজ্জত বা বিত্ত প্রকাশ পেত। রাস্তার দু'পাশের লোক দাঁড়িয়ে, এক, দুই, তিন ক'রে, চক্কর গুন্‌তে থাকত। সাধারণ বিত্তের লোক হ'লে, অথবা কন্যাপক্ষের বাড়ি খুব কাছে হলে, বরযাত্রীরা, হেঁটেই রওয়ানা দিত। পদব্রজে বরযাত্রার সঙ্গে দু'য়েকটি হ্যাজাক-বাতিরও ব্যবস্থা থাকতো।' পূর্বকালে, বরযাত্রার সময় পট্‌কা ফোটানো, 'হাউই' বাজি পোড়ানো এবং ফানুস উড়ানোর রেওয়াজ ছিল।[৮১] নাজির হোসেন লিখিছেন, পুরোনো ঢাকার বড় বড় বিয়ে শাদীতে আতসবাজির দ্বারাই বরযাত্রী কন্যাপক্ষ ও উপস্থিত মেহেমানদের মুগ্ধ করত।[৮২] জেমস ওয়াইজের তথ্যানুসারে- হিন্দু মালাকাররা বিবাহোৎসবের জন্য কিছু কিছু আতশবাজি বানাত।[৮৩]

আগ বাড়ানিঃ

মোমেন চৌধুরী লিখেছেন- 'বর তার "চলন" বা বরযাত্রী নিয়ে বিবাহের উদ্দেশে যাত্রা করলে পথিমধ্যে একাধিক বার বিভিন্ন গ্রামের লোক বা লাঠিয়ালদের দ্বারা বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। তাদের পান-সুপারি দিয়ে তুষ্ট করলে বাধা অপসারিত হয়। বরযাত্রী কন্যাগৃহের নিকটবর্তী হয়ে পান-সুপারি ও টাকাসহ "সালামী বাটা" পাঠায়। কন্যাপক্ষ পানদানে পান ও টাকা দিয়ে বরকে "আগ বাড়ানি" দেয়। কন্যা বিদায়ের সময় শাশুড়ী ও অন্যান্য বর্ষীয়ান অত্মীয়েরা বরকে প্রতি-সালামীরূপে ওই বাটা ফেরৎ দেয়।'[৮৩]

বর বরণঃ

হিন্দুদের বিয়েতে বরযাত্রা কনের বাড়ি বা বিবাহস্থলে এসে পৌছলে কনের মা বরকে বরণ করে নেয়। কনের মা কর্তৃক বরকে বরণ করে নেয়াকে ধোপা ও গোয়ালারা 'চোমাকে লেনা' বলে। গোয়ালা ও ধোবানী মা বরের মুখের সামনে বরণকুলা পাঁচবার ঘুরিয়ে বরের নযর নামায়। ধোপাদের বরণ কুলায়

Dhaka University Institutional Repository

থাকে সরিষা তেলের প্রদীপ, আস্ত-নিখুঁত পান, আলতাপাত্তা, ধান, দূর্বা ও ফুলের পাপড়ি। আর গোয়ালাদের কুলায় ধান, দূর্বা, পান, আলতাপাত্তার সাথে পাঁচটি করে গইটা, আটার প্রদীপ ও পেলেন্দি থাকে। আলতাপাত্তা সহ পানটি প্রদীপের আগুনের শিখায় কিছুক্ষণ ধরে এর তাপে বরের দু'গাল সেকা হয়। ধোপা বরের মাথায় কনের মা একত্রে মিশ্রিত ধান, দূর্বা ও ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে আশীর্বাদ করে। অন্যদিকে, গোয়ালা কনের মা গইটা, আটার প্রদীপ ও পেলেন্দি বরের মাথার উপর দিয়ে পিছনে ছুঁড়ে ফেলে এবং বর কাপড়ে পুঁটলি বাঁধা লাড্ডুমিষ্টি শাশুড়ির কোঁচরে দেয়। অতীতে এসময় বাড়ির ত্রয়োরা গান গাইত-

'আয়া ভোসরিকি জানা লাড়কি লেনে কো।
আরে বেটাকা বাপ, লাড়কি যো লেনে আয়া
আচ্ছা শাড়ি লেকে আইয়ো, আচ্ছা শাড়ি লেকে আইয়ো।
নাইলে যে তোমরা মুমে মারেনে।'[৮৫]

সাহাদের বিয়েতেও বর বরণের প্রথা আছে। সাহা কনের মা বরণ কুলা হাতে ধান, দূর্বা বরের মাথায় ছিটিয়ে ও প্রদীপের শিষ কপালে ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করে। অতীতে শাঁখারীদের বিয়ে রাস্তায় অনুষ্ঠিত হত। তখন জামাই বরণের প্রথা ছিল না। শাঁখারীদের বাড়িঘরে ও কমিউনিটি সেন্টারে বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের মাঝে জামাই বরণের নিয়ম চালু হয়েছে। বর আসলে শাঁখারী মা সদর দরজায় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রদীপের আলোয় বরের মুখদর্শন করে।

বর বরণ পর্বের পরপরই শালাশালীরা বরের গেট ধরে। গেট ধরাই নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দর কষাকষি চলে। বিয়েতে গেট ধরাই টাকা নিয়ে যাতে কোন প্রকার অপ্রীতিকর অবস্থার অবতারনা না ঘটে সেজন্য অনেকেই কথাপাকার দিনই এই বিষয়টি ফায়সালা করে রাখে। কনের আত্মীয় স্বজনরা বরকে বাড়ির ভিতর নিয়ে একটি ঘরে বসায়। ঋষি বর কনের প্রতিবেশীর ঘরে বসে। ধোপা শালাশালীরা নতুন দুলাভাইয়ের জন্য দুধ ও লাড্ডু মিষ্টি আনে। এর জন্যও বরকে টাকা দিতে হয়। গোয়ালা শালাশালীরা বরকে শরবত খাইয়ে ও বরের পা ধুইয়ে বখশিস আদায় করে। ঋষি বরকে শালাশালীরা 'টকজেতার মিষ্টি' খাইয়ে বরের কাছ থেকে টাকা নেয়। নতুন বরকে বোকা বানানো উদ্দেশ্যে হলুদ ও রঙ দিয়ে নকল

Dhaka University Institutional Repository

ট্যাং, লবনের শরবত বা মিষ্টিতে মরিচ মাখানো হয়। এরপর ঋষি কনের মা, মামী, কাকীরা এসে বরকে দুধ খাওয়ায়।

মোমেন চৌধুরীর তথ্যানুসারে, পুরোনো ঢাকার কোন কোন অঞ্চলে বর আগমনের সংবাদ শোনার পর কন্যা থালার জলে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর তার সঙ্গে থাকে একটি রূপার টাকা। প্রথম শ্বশুড়বাড়ি যাওয়ার সময় সে এটি সঙ্গে নিয়ে যায়।[৮৬]

মুসলমান বর বরযাত্রীসহ বিয়ে করতে আসলে কনের পিতা, উকিলবাপ, চাচা, মামা ও অন্যান্য মুরুব্বিরা তাকে অভ্যার্থনা জানিয়ে সদরে নিয়ে বসায়। বিশ শতকের ষাট দশকের মধ্যবর্তী সময়ে ঢাকা মিউনিসিপ্যালটি কর্তৃক নির্মিত লালবাগে শায়েস্তা খাঁন কল্যান কেন্দ্র ও ফরাশগঞ্জে মইনউদ্দিন চৌধুরী মেমোরিয়াল হল প্রতিষ্ঠার আগে কনের বাড়িতেই বিয়ে অনুষ্ঠিত হত।[৮৭] তখন বর বসত কনের বাড়ির নিকটবর্তী মসজিদ, সরকারি বাংলাঘর, প্রতিবেশীর বেঠকখানা বা পঞ্চায়েতের সদরে।[৮৮] কেউ কেউ বাড়ির পাশে খোলা মাঠে ময়দানে মঞ্চ তৈরি করে বরকে বসাত।[৮৯] এছাড়া যাদের বড় বাড়ি ছিল তারা বাড়ির খোলা জায়গায় বরকে বসানোর জন্য মঞ্চ তৈরি করত।

বরযাত্রীতে আগত নারীরা অন্দর মহলে বসত। সেখানে তাদেরকে কনের ভাবীরা অভ্যার্থনা জানাত যা স্থানীয়দের কাছে 'হারসানদাল' নামে পরিচিত ছিল।[৯০] অন্দরমহলে মহিলা অতিথিদের প্রথমে ফুলের মালা, মটরকলাই বা লাউ-এর বীচির মালা দিয়ে বরণ করা হত।[৯১] এরপর কনের ভাবীরা অতিথিদের গালে স্নো মাখত। শেষে ছোট টাই গ্লাসে জাফরান, পেস্তা ও চিনি সহযোগে দুধের শরবত পান করানো হত। এসময় কনের ভাবীদের অন্যজন একটি বাটিতে পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। শরবত পানশেষে বাটির পানিতে টাইগ্লাসটি ধুয়ে পরবর্তী অতিথির জন্য শরবত ঢালা হত। বরপক্ষের অতিথিরা সবাই শরবত পান করে বাটির পানিতে পয়সা ফেলত। উল্লেখ্য, এ পয়সা কনের ভাবীরা নিত।

ফোকলরবিদ আবদুল হাফিজ ঢাকা থেকে সংগৃহীত লোক ধাঁধাঁ'য় বিবৃত করেছেন, বিয়ের আসরে পাত্রপক্ষ বসার সঙ্গে সঙ্গে পান-সুপারি দেওয়া হত। কিন্তু পান খাওয়া সহজ ছিল না, কেননা তার আগেই কন্যাপক্ষের কেউ হয়তো প্রশ্ন করে বসত-

পান খাও পন্ডিতের ব্যাটা
কতা কও ঠারে,
পা-সুপারির জন্মবার্তা
কইয়া দাও আমারে।
পা-সুপারির জন্মকতা
যে না কইয়া পারে;
পানের বদলবপের পাতা
আইন্যা দিমু তারে।

এ প্রশ্নেরও পাঠান্তর আছে, যেমন-

পান খাও পাইন্যা বাই
কতা কও ঠারে
পা-সুপারির জর্ম অইচে
কোন অবতারে ?
যুদি না কইয়া পান খাও,
ছাগল অইয়া গেচু-কচুর পাতা খাও,

বরপক্ষেও থাকত চুর লোক। তিনি উত্তর দিতেন-

পান খাই পাইন্যা বাই
কতা কই ঠারে,
পা-সুপারির জন্ম
কিষ্ট অবতারে।
যুদি হয় বিষ্টি
পানের অয় চিষ্টি
ছাও পাও তুইল্যা বেচে আটে আর বাজারে।[৯২]

Dhaka University Institutional Repository

প্রীতি উপহারঃ

বিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত বিয়েতে প্রীতি উপহার বিতরণের প্রচলন ছিল। প্রীতি উপহার হল এক ধরণের উপহার-পত্র। পাকিস্তান আমলে পাতলা ও স্বচ্ছ রুমাল-জাতীয় রঙ্গীণ বর্ডার আঁকা কাগজে বা সাধারণ রঙ্গিন কাগজে এবং বাংলাদেশ আমলে চটি বই আকৃতিতে সোলানী বা রুপালী কালিতে নরম কাগজে ছাপানো হত। বেয়াইরা প্রীতি উপহারে বর-কনে বা তাদের ভাই বোনদের লক্ষ্য করে ছড়া, তাদের কাল্পনিক সাক্ষাৎকার, কৌতুক ইত্যাদি ছাপাত। সাধারণত প্রেসে মজুত বিভিন্ন পুরোনো 'প্রীতি উপহার পত্র' নমুনা দেখে বর-কনে বা তাদের ভাই বোনদের নাম যথাস্থানে উল্লেখ করে, ছাপার ব্যবস্থা করা হত। এছাড়া কেউ কেউ নিজেরাই নতুন করে ছড়া লিখে প্রীতি উপহার পত্র ছাপাত। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম লিখেছেন- 'সমকালীন বিষয়ের প্রক্ষেপ এতে লক্ষ করা যেত। যেমন- একটি উপহার পত্রে দস্যু মোহনের ছদ্মবেশে বরের আগমন ঘটেছে বন্দিনী কন্যারূপী 'রমা' নামের মেয়েকে উদ্ধারের জন্য। কোন কোন প্রীতি উপহার পত্রে শ্লীলতার সীমা লংঘন লক্ষ করা যেত। বরের আগমনের পরপরই উভয়পক্ষের লোকেরা, নিজ নিজ উপহার পত্র বিলি করত। এই প্রীতি উপহারপত্র সংগ্রহ করতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ও তরুণ তরুণীরা বিশেষ তৎপর হত।'[৯৩]

শিল্পপতি আনোয়ার হোসেন জানিয়েছেন- 'বিয়ের অনুষ্ঠানে আরেকটা জিনিসের প্রচলন ছিল তখন- ফুলের তোড়া। তবে এই তোরা আসল ফুল দিয়ে বানানো নয়, টাকার ফুল দিয়ে বানানো। বড় টাকা, মানে একশ' বা পাঁচশ' টাকার নোট দিয়ে খুব কায়দা করে বানানো হতো বড় আকৃতির ফুল। ছোট টাকার নোট দিয়ে বানানো হতো পাতা। তোড়াটা উপহার হিসেবে দেয়া হতো নতুন দম্পতিকে। কখনও আবার কৃত্রিম ফুল-পাতার সঙ্গে আটকে দেয়া হতো টাকা। খুব-আগ্রহ উদ্দীপক ছিল এই তোড়ার ব্যাপারটা- বিয়ের পর যখন কে কী উপর দিল সেটা মজা করে দেখত সবাই মিলে, তখন আগেই খোঁজ নেয়া হতো ক'টা তোড়া পাওয়া গেছে।'[৯৪]

বিবাহ কার্যঃ

বিয়ের লগ্ন শুরুর পূর্বে ঋষি বরকে কনেপক্ষের ত্রয়োরা পুনরায় সজ্জিত করে। তারা বরের মুখ ধৌত করে স্নো, পাউডার ও চোখে কাজল পরিয়ে দেয়। কনের পিতা বিয়ে উপলক্ষে বরের মা'কে নতুন শাড়ি

Dhaka University Institutional Repository

দান করে। বর যখন বিয়ের পিঁড়িতে বসে তখন তার মা সেই শাড়ি পরিধান করে 'জোয়ার পাইলা' ধরে বসে।[৯৫] জোয়ার পাইলার উপর শাড়ির আঁচল বিছিয়ে রাখার নিয়ম।

বিবাহ লগ্ন আরম্ভ হলে বরকে বিবাহ মন্ডপ বা মাড়োয়ায় এনে পিঁড়িতে বসানো হয়। শাঁখারী ও ঋষিদের বিয়েতে কনের পিতা বিবাহ মন্ডপে বসার প্রাক্কালে গলায় গামছা পরে উপস্থিত সকলের নিকট করজোড়ে ক্ষমা চায়। কন্যা সম্প্রদানের উদ্দেশ্যে বিবাহ মন্ডপে বসার অনুমতি প্রার্থনা করে বলে- 'আমি কন্যা দায়গ্রস্ত। মুক্তি লাভের জন্য আপনারা আমাকে অনুমতি দিন। আমি পিঁড়িতে বসি।'[৯৬] ঋষি বর ও কনের পিতা পঞ্চায়েত মাতব্বরের কাছে করজোড়ে বিবাহ কার্য আরম্ভ করার অনুমতি প্রার্থনা করে। পঞ্চায়েত মাতব্বর অনুমতি দিলে বিবাহ কার্য শুরু হয়। বিবাহ মন্ডপে বর/কনে, কনের পিতা ও ব্রাহ্মণ বসে। বর্ণভেদে বিবাহ মন্ডপে বর ও কনে পক্ষের দু'জন ব্রাহ্মণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দান পর্বের মাধ্যমে বিবাহ কার্যের সূচনা ঘটে। এ পর্বে ব্রাহ্মণ কনের পিতার সকল প্রকার দান সম্পন্ন করায়। কনের পিতার কাছ থেকে ব্রাহ্মণ দান সামগ্রির তালিকা নিয়ে সবার সম্মুখে মন্ত্র পড়ে তালিকা পাঠ করে শোনায়। ব্রাহ্মণের সাথে কনের পিতাকেও দান সামগ্রির তালিকা পাঠ উচ্চারণ করতে হয়। পূর্বকালে কনের পিতা যা কিছু দানস্বরূপ দিত, যেমন- আসবারপত্র, লেপ-তোষক, খাট-পালঙ্ক, হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদি বিবাহ মন্ডপের পাশে জনসম্মুখে সাজিয়ে রাখা হত। শাঁখারী ও সাহা পিতা কর্তৃক ব্রাহ্মণ দান, নাপিত দান ও তার বিবাহিতা কন্যার স্বামীদের বস্ত্র দান সম্পন্নের পর পরই নতুন বরের সাথে দানকার্য শুরু হয়। বরের পিতা দুটি কাঁসার থালায় রক্ষিত বর ও কনের বিয়ের বস্ত্র বরের হাতে তুলে দিয়ে বিবাহ মন্ডপ সাময়িকভাবে ত্যাগ করে। বন্ধুবান্ধব ও দুলাভাইরা বরকে শ্বশুড়ের দেয়া বিয়ের ধুতি, পাঞ্জাবী, উত্তরীয়, গেঞ্জি ও জাঙ্গিয়া পরিধান করায়। কনেকেও বাবার দেয়া লাল বেনারসী শাড়ি পরিয়ে বিবাহ মন্ডপে আনা হয়। অতীতে ধোপা ও গোয়ালা কনেকে ননদের স্বামীরা কোলে করে নিয়ে আসত। এখন তারা নিজের পায়ে হেটে আসে। এসময় সোহাগানরা জোকার ধ্বনি তোলে। অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত জনেরা কনের উপর ফুল ছিটায়। ধোপা কনে বিয়ের পিঁড়িতে বসার পর পরই ব্রাহ্মণ ঠাকুর মন্ত্র পড়ে একত্রে মিশানো পোলাও চাল, ধান, দূর্বা ও ফুলের পাপড়ি তার উপর ছিটিয়ে দেয়। তখন উপস্থিত সবাই ব্রাহ্মণের সাথে জোকার দেয়। অম্রপল্লব শোভিত জলপূর্ণ মাটির ঘটের উপর বরের ডানহাতে কনের বামহাত ও তাদের হাতের উপর কনের পিতার হাত রেখে ব্রাহ্মণ কাঁচাসুতা দিয়ে বাঁধে। গোয়ালারাদের বিয়েতে কাইশা দিয়ে হাত বাঁধার নিয়ম। ব্রাহ্মণের সাথে বর, কনে ও কনের পিতা মন্ত্র উচ্চারণ করে। মন্ত্র পড়া শেষ হলে হাতের

Dhaka University Institutional Repository

বাঁধন খোলা হয়। কনের বাবা মাড়োয়া ছেড়ে ঘরে চলে যায়। ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়ে কাহেলছিয়ায় কোটা চাল, দূর্বা ও ফুলের পাপড়ি আমপাতায় পেঁচিয়ে সেটি কাঁচাসুতা দিয়ে বেঁধে কাংনা তৈরি করে। এই কাংনা বরের ডান ও কনের বামহাতে পরিয়ে দেয়া হয়। ধোপা বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। এরপর মালাবদল হয়। এপর্বে বর ও কনে একে অপরের গলায় সাতবার মালা বদল করে। মালাবদলের পর ব্রাহ্মণ ঠাকুর মন্ত্র পড়ে ধোপা নববধূর শাড়ির আঁচলে পাঁচটি হরিতকী, একটি সুপারি, পয়সা, ফুলের পাপড়ি ও কাহেলছিয়ায় কোটা চাল বেঁধে সেটি বরের চাদরের সাথে গীট দেয়। গোয়ালা কনের শাড়ি বা ওড়নার আঁচলে পাঁচটি পান ও একটি সুপারি বাঁধার নিয়ম। যজ্ঞ আগুনের চারপাশ ধোপা ও গোয়ালা বর-কনে সাতপাক ঘোরে। সেখানে কনের ছোট ভাই বা বোন বরের বাড়ি থেকে আনা খই ছোট্ট একটি নতুন কুলায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বর-কনে প্রতিবার যজ্ঞ আগুনের চারপাশে সেই খই ছিটাতে ছিটাতে ঘুরে। ধোপা বর-কনে কুলার খই নিয়ে তাদের মাথার উপর দিয়ে পিছনে ছুড়ে ফেলে। এসময় বিবাহস্থলে উপস্থিত সবাই বর-কনের উপর ফুলের পাপড়ি ছিটায়। সোহাগানরা জোকার ধ্বনি তোলে, শঙ্খ বাজায়। গোয়ালাদের বিয়েতে সাতপাক ঘোরা সম্পন্নের পর বর ও কনেকে পিঁড়িতে বসিয়ে তাদের মাথায় চাদর বা ওড়না দেয়া হয়। বর শঙ্খের তৈরি আংটি দিয়ে নববধূর সিঁথিতে সাতবার সিঁদুর পরিয়ে দেয়।

সাহা, শাঁখারী ও ঋষি কনেকে তার রসিকতা সম্পর্কীয় যেমন দুলাভাই বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে বিবাহ মন্ডপে নিয়ে আসে। এসময় বরের বন্ধুবান্ধব ও দুলাভাইরা বরের পিঁড়ি শূণ্যে তুলে ধরে। কনের পিঁড়ি বরের পিঁড়ির কাছে আসলে আয়োরা কনের বামহাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে কাজল লাগায়। কনে বরের কপালের বামপাশে কাজলের ফোঁটা দেয়। কনে দু'হাতে দুটি পান নিয়ে বরের বাহুদ্বয় স্পর্শ করে বিয়ের পিঁড়িতে বিছানো হলুদের শাড়ি নীচে রাখে। আয়োরা কনের হাতে দেয় পাঁচটি মাটির কৌটা রক্ষিত একটি রামথালি। রামথালির কৌটাসমূহে পাঁচ রকম উপকরণ ধান, যব, লবন, চিনি ও হলুদ রেখে ঢাকনায় ঢাকা হয়। বরকে একটি করে কৌটা তুলতে হয়। এ আচার পালনের মধ্য দিয়ে উপস্থিত সবাই বর-কনের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে ধারনা লাভ করে। বরের সর্বপ্রথম সিঁদুর তোলা সুলক্ষণযুক্ত। সিঁদুর তুললে দাম্পত্য জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়। ধান-যব তুললে সংসারে আর্থিক সমৃদ্ধি আসে। চিনিতে সংসার জীবন মধুর হয়। লবন অলক্ষণযুক্ত। বর লবন তুললে ধরে নেয়া হয় স্বামী-স্ত্রীর অমিল থাকে আর সংসার জীবনে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।[৯৭] এরপর মালাবদল পর্বে বর-কনে একে অপরের গলায় মালা পরায়। শাঁখারী কনেদের বরের গলায় প্রথম মালা পরানো রীতি। মালাবদলের পর বরের পিঁড়ির চারপাশ কনের পিঁড়িকে

Dhaka University Institutional Repository

সাতবার ঘোরানো হয়। প্রতিবার ঘুরে এসে কনে বরের সম্মুখে ফুলকোটে আর ফুলফোটায়। ফুলকোটা শেষে কনে প্রতিবার বরকে নমস্কার করলে বর কনেকে কিছুটা ফুল দেয়। সাতপাক ঘোরার পর বর-কনের পিঁড়ি নিচে নামানো হয়। কনের পিতা কন্যাদান সম্পাদন করতে বিবাহ মন্ডপে আসে। এসময় ব্রাহ্মণের সাথে বর, কনে ও কনের পিতা মন্ত্র উচ্চারণ করে। কনের পিতা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের হাতে আংটি দেয়, ব্রাহ্মণ সেটি বরের ডানহাতের অনামিকায় পরিয়ে দেন। এরপর ব্রাহ্মণ পুরোহিত বরের হাতের উপর কনের হাত রেখে কাইশা দিয়ে বেঁধে দেন। বর-কনের হাতের উপর কনের পিতা তার হাত রেখে বরকে কন্যাদান করে। কন্যা সম্প্রদানের পর পরই কনের মা কাপড়ে বাঁধা একটি পুঁটলি ব্রাহ্মণের কাছে দিলে, ব্রাহ্মণ সেটি কনের শাড়ির আঁচলে বেঁধে দেন। এই পুঁটলিতে থাকে ধান, কড়ি, কাঁচা পয়সা, হরিতকী, সুপারি ও প্রদীপ। এটি কনের জীবনের খোরাক যা সে বাবার বাড়িতে খেয়েছে এবং ভবিষ্যতে খাবে। এ সবকিছু পুঁজি হিসেবে কনের মা কনেকে দিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করে।

জেমস ওয়াইজ লিখেছেন- 'শাঁখারীদের বিবাহের অনুষ্ঠান রাম-সীতার বিবাহের অনুরূপ। পশ্চিম বঙ্গে বিবাহরীতি মহাদেব ও পার্বতীর অনুরূপ। প্রথম অনুষ্ঠানের আচার অনুযায়ী বর-কনে দু'জনকে টুলের উপর বসিয়ে বিবাহ-মন্ডপের চারদিকে ঘোরানো হয়। আর দ্বিতীয় আচার অনুযায়ী বর দাড়িয়ে থাকে আর তার চারদিকে ঘোরানো হয় কনেকে। বিয়ের সময় কনে পরে লাল শাড়ি আর মাথায় টোপর।'[৯৮]

ঋষি কনে পিঁড়িতে বসে দু'হাতে দুটি পান দিয়ে মুখ ঢেকে বিবাহ মন্ডপে আসে। বরের পিঁড়িও উচুতে শূণ্যে তুলে ধরা হয়। কনে বরকে নমস্কার দেয়। এরপর বরের পিঁড়ির চারপাশে কনের পিঁড়িকে সাতবার ঘোরানো হয়। কনের পিঁড়ির সম্মুখে কনের ভাই জ্বলন্ত পঞ্চপ্রদীপ হাতে নিয়ে বরের চারপাশ ঘোরে। প্রতিবার ঘুরে আসার পর কনে ফুলকোটে। ফুলকোটায় কনে দু'হাতে ফুলের পাপড়ি নিয়ে ডান হাতের পাপড়ি বরের সম্মুখে ও বাম হাতের পাপড়ি পিছনে ছুড়ে ফেলে। এসময় বরও অনুরূপভাবে ফুল ছিটায়। সাতপাক ঘোরা শেষ হলে মালাবদল হয়। ঋষিদের রীতিতে বর কনের গলায় প্রথম মালা পরায়। মালাবদলের পর মুখচন্ডি পর্বে বর-কনে একে অপরের চোখে চোখ রাখে। এ পর্বের সমাপ্তি ঘটলে বর-কনে বিবাহ মন্ডপে বসে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত জলপূর্ণ ঘটের উপর বর, কনে ও কনের পিতার হাত কাইশা দিয়ে বাঁধেন। মন্ত্র পড়া শেষ হলে ব্রাহ্মণ একটি নতুন গামছা তাদের হাতের উপর রাখেন। কনের পিতা সেই গামছায় ব্রাহ্মণকে দাক্ষিণ্য আশীর্বাদ দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বিয়ে সংগঠিত হয় ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (গ্রহণ) দ্বারা। বিবাহের পক্ষদ্বয়, নারী ও পুরুষের বা তাদের অভিভাবক অথবা প্রতিনিধিদের ইজাব কবুলের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হয়। পূর্বকালে মসজিদের ইমাম সাহেবের খুদবা পাঠের মাধ্যমে বিবাহ কার্যের শুভ সূচনা ঘটত। এরপর কাজি সাহেব প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করতেন। এখন কাজি সাহেবের তত্ত্বাবধানে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। বিবাহ সভায় কাজি সাহেবকে ডেকে আনার দায়িত্ব মূলত: কনেপক্ষের। তবে তার পারিতোষিক পরিশোধ করে বরপক্ষ। কনেপক্ষের একজন প্রতিনিধি (যাকে স্থানীয়রা উকিলবাপ বলে থাকে) এসে বরপক্ষের তিনজন সাক্ষীকে নিয়ে কনের কাছে যায় বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। কনেকে উকিলবাপ বলে- 'অমুক জায়গার নিবাসী, অমুকের পুত্র, অমুক, এত টাকা দেনমোহরে তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে- তুমি কি রাজি আছো ?'[৯৯], এই প্রশ্ন পর পর তিনবার করা হয় এবং কনেকে তিনবারই স্পষ্ট কণ্ঠে তার সম্মতি প্রকাশ করতে হয়- সাক্ষীরা সেই সম্মতি শোনে। এছাড়া কনের সম্মতি শোনার জন্য কনের মা, চাচী, খালারাও তার পাশে বসে থাকে। সাক্ষীসহ বরের বাপ সদরে বরের কাছে ফিরে যায় এবং সেখানে গিয়ে বরের দু'হাত ধরে বরকে তিনবার প্রশ্ন করে একইভাবে এবং শেষকালে বলে...'আপনি কি কবুল করছেন ?', এক্ষেত্রে বরকে স্পষ্ট স্বরে জবাব দিতে হয়- 'আমি কবুল করছি।' কাজি সাহেব নবদম্পতির মঙ্গল কামনা করে মোনাজাত করেন। এরপর বরকে সবাই অভিনন্দন জানায়। বরপক্ষের লোকেরা খোরমা বা মিষ্টি বিতরন করে।

জেমস ওয়াইজ লিখেছেন- 'আগেকার দিনে জোলাদের মধ্যে এক রেওয়াজ প্রচলিত ছিল সাধারণত: যা মুসলমানদের নযরে পড়ে না। মুসলমানদের বিয়েতে কাজির সামনে চুক্তিনামা হিসাবে যে কাবিন করতে হত তা এরা করত না। তবে পরবর্তীকালে ওই প্রথা তো চালু হয়ই। তার উপর মোহরানা প্রথাও চালু হয়।[১০০]

চামারদের বিবাহ অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো ব্যক্তি। দিনক্ষণ নির্দ্ধারণ করেন ব্রাহ্মণ। রীতি অনুসারে কিছু টাকা দিতে হয় কনের বাবাকে। বিবাহের অনুষ্ঠানে বর বসে কনের বাবার কোলে। বরের বাবা পান কিছু অলংকার আর এক পাত্র মদ। বিবাহ সম্পন্ন হলে সবাইকে দেয়া হয় মদ। বিবাহ অনুষ্ঠানে বর কনের বসার জন্য মাচান বানানো না হলেও কোনো হিন্দুস্তানি নাপিতকে দিয়ে সাদা রং করা

Dhaka University Institutional Repository

হয় একটি জায়গা। ওই বিশেষ জায়গায় বিয়ের সময় বর কনেকে বসতে দেওয়া হয়। মেয়ের বাবা আলতা রঞ্জিত করেন বর ও কনের পা। না হয় লাক্ষার রস দিয়ে ন্যাকড়া ভিজিয়ে মেখে দেয়া হয় বর-কনের পায়ে। বিবাহ অনুষ্ঠানে বর-কনের সব আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা হল কিনা তার তদারকি করাও তার দায়িত্ব।[১০১]

লালবেগিদের বিবাহের আচার অনুষ্ঠান আংশিকভাবে মুসলমানদের ও আংশিকভাবে হিন্দুদের। মুসলমানদের মত বিয়ের ঘটকালি কওে জনৈক বয়স্ক মহিলা। বিয়েতে কাবিন দেওয়ার রীতি নেই মুসলমানদের মত। তবে ইশারার বা প্রতিশ্রুতি দিতে হয় সে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করবে না। মুসলমানদের মত বিবাহ অনুষ্ঠানের আগের দিন কান্দুরি অনুষ্ঠান হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে কোনো আচার্য্য ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। কনের বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠান হলে বর পঞ্চায়েতকে দেয় পাঁচ আনা।[১০২]

ঢাকা শহরে গন্ধবনিকদের শক্তিশালী ছয়টি দল আছে। এই দলগুলোর দলপতি বা প্রধানরা বেশ গণ্যমান্য লোক। এদের একটি দলের বিবাহরীতি অদ্ভুত রকমের। তারা যখন প্রথমে পূর্ববঙ্গে আসে তখন থেকে এই রীতি প্রচলিত। বর একটি চম্পা গাছের ডালে বসে থাকে, আর কনেকে গাছের চতুর্দিকে ঘোরানো হয় সাত বার। চম্পাগাছ পাওয়া না গেলে একটি চাঁদোয়ার নিচে চম্পা গাছের একটি ডাল রাখা হয়, অথবা চম্পাগাছের একটি কাষ্ঠখন্ড রাখা হয়, নতুবা চম্পা ফুলের আকৃতির অলঙ্কার দিয়ে কাজ সারা হয়। অন্য দলভুক্তদের বিয়ে হয় শূদ্র আচারে। গোপনে কেউ কেউ অদ্ভূদ আচার পালন করে। কনের বিয়ের পোষাক হল লালপেড়ে হলুদ কাপড় (চোলি)। বিয়ের পর দশদিন পর্যন্ত কনে পরে থাকে এই কাপড়।'[১০৩]

দাইমাঙ্গাল:

গোয়ালা ও ধোপাদের বিবাহ কার্য সম্পন্নের পর কনের বাড়ির সোহাগানরা বর ও কনেকে ঘরে বিছানো মাদুরে বসিয়ে দাইমাঙ্গাল অনুষ্ঠান পালন করে। এ পর্বে বর ও কনেকে পরস্পরের হাতে দই, ক্ষীর ও পান খাওয়ানোর রীতি। ধোপা সোহাগানরা প্রথমে দুইবাটি দই ও দুইখিলি পান বর ও কনের সামনে রেখে পাঁচবার স্থান পরিবর্তন করে। প্রথমে বর চামচে করে একটু দই ও একখিলি পান কনের মুখে দেয়। এরপর কনেও বরকে খাওয়ায়। গোয়ালাদের বিয়ের এ পর্বে পাঁচ সোহাগান বর ও কনের

Dhaka University Institutional Repository

সামনে দুই বাটি দই ও দুই গ্লাস পানি রাখে। বাটিগুলিতে থাকে দই, ক্ষীর ও এক খিলি পান। বাটির দই ও ক্ষীর বর তার হাতের দু'আঙ্গুলে তুলে কনেকে পাঁচবার খাওয়ায়। এরপর বর নিজ হাতে কনেকে পানি পান করিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেয়। শেষে একখিলি পান খাওয়ায়। একই পন্থায় কনেও বরকে খাইয়ে নিজ শাড়ির আঁচল দিয়ে বরের মুখ মুছায়।

ক্ষীরবুজনী:

মুসলমানদের বিয়েতে কাবিন ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নের পর বরকে অন্দরমহলে আনা হয়। পূর্বকালে ঢাকার কোন কোন স্থানে বর অন্দরমহলে আসলে তাকে জলচৌকির উপর দাড় করানো হত। কনের মা এসময় বরের পিছন থেকে আচকন ধরে বদনা বা গ্লাসে পানি পান করত। লোকবিশ্বাস, এতে কনে শীতল মেজাজী হবে আর শ্বশুড়ালয়ের সবার প্রতি সহনশীল মনোভাব প্রকাশ করবে।[১০৪] এরপর কনের হলুদের ভেজা শাড়ি দিয়ে বরের দু'পা পেঁচানো হত আর বর এ অবস্থা থেকে নিজ পা'কে মুক্ত করত। হলুদের শাড়ি দিয়ে পর পর তিনবার বরের পা পেঁচানোর রীতি। পুরোনো ঢাকার কোন কোন স্থানে আড়াই নাইয়রে উক্ত আচারটি পালিত হতে দেখা যায়। মোমেন চৌধুরীও এ আচারটির অভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন। তার বর্ণনা অনুসারে- 'ঢাকার আদিবাসী সমাজে বরকে অন্দরমহলে এনে প্রথমে কলাতলায় নিয়ে যায়। তারপর তার পায়ে কন্যার গায়ে হলুদের কাপড় পেঁচানো হয়। বর সেই প্যাঁচ খোলে। এইভাবে তিনবার করতে হয়। এরপর তাকে নির্দিষ্ট কক্ষে নিয়ে যায়। সেখানে কন্যার দাদী, নানী, ভাবী তাকে বসিয়ে এক গেলাস সরবত এবং সাত খিলি পান খেতে দেন। বর সরবত পান করে কিন্তু পানের খিলি মুখে নিয়ে ফেলে দেয়। অত:পর কন্যার মা আসেন। তিনি জামাতার দাওয়ান (আচকান) ধোয়া জল পান করেন। এই সময় বর তাঁকে নজরানা হিসাবে টাকা দেয়। যাঁরা বরকে পান সরবত খাওয়ান, তারাও নজরানা পান। অত:পর কন্যাকে এনে বরের বামপাশে বসানো হয়। সেখানে কন্যার হাতে বর আর বরের হাতে কন্যা মিষ্টি খায়। এই পর্ব সমাপ্ত হলে তাদের মাথার উপর চাদর দিয়ে ঢেকে শাহ্‌নজর করায়।'[১০৫]

কনের ভাবী, নানী বা দাদী সম্পর্কের আত্মীয়রা বর ও কনেকে পাশপাশি বসিয়ে ক্ষীরবুজনী করায়। এ পর্বের প্রথমে বরকে দিয়ে কনের হাত ধোয়ানো হয়। হাত ধোয়ানোর পর বর তার পকেট থেকে রুমাল বের করে কনের হাত মুছিয়ে দেয়। ভাবী, নানী বা দাদী এই কাজে সাহায্য করার জন্য বরকে 'হাত

Dhaka University Institutional Repository

ধোলাই'এর টাকা বখশিস দিতে হয়। বর ও কনের ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে মিষ্টিদ্রব্য (জর্দা, পায়েস, ফিরনী) দেয়া হলে একে অপরের মুখে তিনবার দেয়। এক গ্লাস সরবতের অর্ধেক বর পান করে বাকি অর্ধেক নিজ হাতে কনেকে পান করায়। বিয়ের ওড়না দিয়ে বর ও কনের মাথা ঢেকে একখানা আয়নায় পরস্পরের চেহারা দেখানো হয়। বর ও কনে আয়নায় পরস্পরের মুখ দেখে বলে এ পর্বটি 'মুখদেখাই' নামে পরিচিত। এবারও মুখদেখাইতে সহযোগিতা করার জন্য বরকে মুখদেখাই বখশিস প্রদান করতে হয়। কনের হাতে বর আংটি পরিয়ে দেয়। এরপর মালাবদল হয়। মালাবদলে বর ও কনে একে অপরের গলায় মালা পরায়। মালাবদলের পর বর ও কনেসহ উপস্থিত সবাই নবদম্পতির মঙ্গল কামনা করে দোয়া করে। পূর্বকালে মুসলমানদের মাঝে মালাবদলের নিয়ম ছিল না। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে মালাবদলের প্রচলন ঘটেছে। সেসময় ক্ষীরবুজনীর বর ও কনেকে দুই রাকাত নফল 'শুকরিয়া নামাজ' পরানো হত। পরবর্তীকালে নামাজের পরিবর্তে মোনাজাত করার প্রচলন শুরু হয়েছে। ক্ষীরবুজনীর পরপরই বরকে শ্বশুড়ালয়ের পিতৃস্থানীয় অভিভাবকদের সাথে পরিচয় করানো হয়। এসময় নবদম্পতি তাদের পা ছুঁয়ে সালাম করে।

কনে সমর্পণ:

অত্রঅঞ্চলে উভয় সম্প্রদায়ে কনে বিদায়ের প্রাক্কালে কনের পিতা ও পিতৃস্থানীয় অভিভাবক কর্তৃক বর ও তার পরিবার প্রধানের হাতে কনেকে আনুষ্ঠানিক সমর্পণের রেওয়াজ প্রচলিত। মুসলিম সমাজে এই পর্বটির নাম 'সফুরত' বা 'সাফুরাত'। আর হিন্দু সম্প্রদায়ের ধোপা ও গোয়ালারা একে 'শপ্‌কে দেনা' বলে থাকে।

কনে বিদায়:

কনে সমর্পণের পর আসে কনে বিদায়ের পালা। ধোপাদের বিয়েতে কনে বিদায় কালে মা কনেকে নিজের কাছে বসিয়ে লাড্ডুমিষ্টি, পানি ও একগ্লাস দুধ পান করায়। এরপর কনের মুখে একখিলি পান গুঁজে দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করে। শেষে কনের কোঁচরে পাঁচটি পান, পাঁচটি সুপারি, একটি কাঁচাপয়সা, পাঁচটি হলুদ ও কিছুটা চাল দেয়। কনে তার দু'হাত ভরে আতপচাল নিয়ে নিজ মাথার উপর দিয়ে পিছনে ফেলে বলে- 'মা বাপকা ঘার ভারকে যা।'[১০৬] পূর্বকালে মুসলমান সমাজেও অনুরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। কনে বিদায়কালে চাল ছুড়ে ফেলে বাবা মায়ের ঘর ভরে যেত। প্রচলিত বিশ্বাস, কন্যা তার

Dhaka University Institutional Repository

সৌভাগ্য নিয়ে শ্বশুড়বাড়ি গেলেও এই সংস্কারের ফলে পিতার সংসারে আর্থিক সংকট দেখা দেয় না। গোয়ালা কনে এই আচার পালনকালে দাদী বা নানী কেউ একজন জিজ্ঞেস করে- 'কা কার রাহি ?' কনে জবাব দেয়- 'মা বাপকা ঘার বারকে যাতে।'[১০৭] বিদায় কালে সাহা মা কনের আঁচলে কড়ি, পান ও সুপারি বেঁধে দেয়। মোমেন চৌধুরীর তথ্যানুসারে, কোথাও কন্যা পিত্রালয় ত্যাগ করার আগে দুই মুষ্টি ধান পিত্রালয়ে রেখে ডান মুষ্টির ধান শাড়ির আঁচলে বেঁধে শ্বশুড়বাড়ি গমন করে।[১০৮] পূর্বকালে শাঁখারীদের বিয়েতে কনেপক্ষের আয়োরা গান গেয়ে কনেকে বিদায় জানাত-

'সোনা দিলাম রূপা দিলাম লো,
খেজমতে দাসীরে সঙ্গে দিলাম,
সোনা দিলাম রূপা দিলাম লো,
বেজনি মাসিরে সঙ্গে দিলাম।'[১০৯]

চলন বিয়া:

শ্বশুড়ালয় থেকে বর নববধূসহ নিজ গৃহে গমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। শাঁখারীদের কাছে এ পর্বটি 'চলন বিয়া' নামে পরিচিত। এ উপলক্ষে কনেকে পার্লার থেকে সজ্জিত করে আনা হয়। বরপক্ষ নবদম্পতিকে নিয়ে যাবার জন্য কনের বাড়িতে আসে। কনের পিতা তাদেরকে মিষ্টি ও পান দিয়ে আপ্যায়ন করে। পূর্বকালে নববধূকে ঘোড়াগাড়িতে শ্বশুড়বাড়ি নেয়া হত। পরবর্তীকালে রিক্সা আর এখন ট্যাক্সি গাড়ি সজ্জিত করে নেয়া হয়। সম্মুখে ব্যান্ডপার্টি ও বাদ্য বাদকেরা থাকে। বরপক্ষের আয়োরা বরকনের সাথে তাদের টোপর হাতে করে নেয়। কনের মামা হাতিহরা জ্বালিয়ে কনের সাথে তার শ্বশুড়ালয়ে যায়। পূর্বকালে চলন বিয়ার শোভাযাত্রা পুরো এলাকা কয়েকবার চক্কর দিত।

বধূবরণ:

নববধূসহ বর গৃহে ফিরলে বরের মা পুত্রবধূকে বরণ করতে এগিয়ে আসে। শাশুড়ি কর্তৃক পুত্রবধূ বরণ করে নেয়াকে ধোপা ও গোয়ালারা 'চোমাকে লেনা' বা 'পারোসকে লেনা' বলে থাকে। এ পর্বের পর ঘরে প্রবেশ করে গোয়ালা নবদম্পতি পূজার আসনে আর ধোপা দম্পতি 'মহাদেব বাবা'র ছবির সামনে প্রণাম করে। সোহাগানরা বরকনেকে বিছানার উপর বসিয়ে পরস্পরের হাতে দই, ক্ষীর ও পান খাওয়ায়। গোয়ালা শাশুড়ি নববধূকে ঘরে রক্ষিত চালপূর্ণ কৌটা, ভাতপূর্ণ হাড়ি ও জলপূর্ণ কলস দেখায়। অত:পর

Dhaka University Institutional Repository

নববধূ জলপূর্ণ কলস থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে নেয়। গোয়ালাদের বিশ্বাস, এর ফলে শাশুড়ির সংসার স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করে।

শাঁখারী পুত্র নববধূ নিয়ে স্ব গৃহে পৌছলে বাড়ির প্রবেশ পথে বরের হলুদ মাখানোর ধুতি বিছিয়ে রাখা হয়। বাড়ির প্রবেশ দ্বারে শ্বাশুড়ি ঘিয়ের প্রদীপের আলোয় পুত্রবধূর চেহারা দর্শণ করে। শাশুড়ি ও পুত্রবধূ একে অপরে দৃষ্টি বিনিময় করে। এরপর শাশুড়ি ধান-দূর্বা ছিটিয়ে নববধূকে বরণ করে ঘরে তুলে নেয়। সাহা শাশুড়িও বাড়ির প্রবেশ পথে নববধূকে বরণ ও আশীর্বাদ করে ঘরে নিয়ে যায়। ঘরে বিছানো মাদুরে বসিয়ে নববধূকে স্বর্ণালংকার উপঢৌকন দেয়।[১১০]

পূর্বকালে মুসলিম সমাজে বর বিয়ে করে নববধূ নিয়ে বাড়ি ফিরলে বাড়ির সদর দরজায় পটাকা ফুটানো হত। নববধূকে বর, নানদোসি বা বরের ভাবী কোলে করে বাড়ির ভেতর আনত। বরকে শীলপাটা আর নববধূকে জলচৌকির উপর দাঁড় করানো হয়। প্রচলিত বিশ্বাস মতে, এসময় বরকে শীলপাটায় দাঁড় করালে সে স্ত্রীর প্রবঞ্চনায় প্ররোচিত হবে না। সাংসার জীবনে তার অবস্থান পাথরের ন্যায় শক্ত ও দৃঢ় থাকবে।[১১১] শ্বাশুড়ি ও বর্ষীয় নারীরা কুলা দিয়ে বরকনেকে বরণ করে ঘরে নেয়। ঘরে প্রবেশকালে নববধূ অঞ্জলিভর্তি ঘরের ভেতর ছুড়ে ফেলে বলে- 'শ্বশুড় শাশুড়ির ঘর বড় হ।'[১১২] স্থানীয় মুসলমানদের কাছে এই লোকাচারটি 'হাইটা' নামে পরিচিত।

মোমেন চৌধুরী লিখেছেন-'ঢাকার অন্যত্র দেখা যায়, বরের বাড়ীর উঠানে ত্রয়োরা মিলে আম্রশাখাসহ জলপূর্ণ কলসী রেখে দেয়। সেখানে একটি জলচৌকিও থাকে। বর বিয়ে করে বধূ নিয়ে বাড়ী ফিরলে তার মামা বধূকে কোলে করে নামিয়ে আনেন। তারপর ধান-দূর্বা দিয়ে বরবধূকে বরণ করে মুখে চিনি দেয়া হয়। ... বউকে কোলে নিয়ে বর যখন ঘরে ঢুকতে যায় তখন ছোট ভাইয়েরা তাকে বাঁধা দেয়। তাদের দাবী, ভাই তাদের বিবাহ করিয়ে দেবেন। ভাই তাদের স্বীকার করলে তারা দরজা থেকে সরে দাঁড়ায়। বরবধূ ঘরে ঢুকে পাশাপাশি বসে। তাদের সেখানে মিষ্টি খাওয়ানো হয়। বধূও হাতে হলুদ, কড়ি ও চাল দিয়ে মা-খালারা বলন, বলো, মা-বাবার ঘর ভরুক। বধূ বলে- শ্বশুড়-শাশুড়ির ঘর ভরুক।'[১১৩]

Dhaka University Institutional Repository

বউ পূজাঃ

শাঁখারীদের মাঝে বধূবরণের পরবর্তী পর্বের নাম বউ পূজা। এ পর্বে বরের মা তার পুত্র ও পুত্রবধূকে একত্রে কোলে বসিয়ে আশীর্বাদ করে নববধূকে স্বর্ণালংকার উপহার দেয়। এরপর বরের আত্মীয় স্বজনরা সবাই একে একে নববধূর সাথে পরিচিত হয়ে তাকে উপহার প্রদান করে।

ভাত-কাপড় দেয়ার অঙ্গিকারঃ

বউ পূজা অনুষ্ঠান সম্পন্নের পর বরের মা একটি থালায় পঞ্চব্যাঞ্জনসহ ভাত, মিষ্টদ্রব্য ও একটি নতুন শাড়ি ছেলেকে দেয়। বর সেই থালা স্ত্রীর হাতে দিয়ে বলে- 'আমি তোমারে বরণ কইর‌্যা নিলাম। আর জীবনতরি আমি তোমারে ভাত-কাপড়ে ভাত দিয়া যাব।'[১১৪] নববধূ মাদুরে বসে শিশুদের সঙ্গে থালায় রক্ষিত খাবার খায়।

কালরাতঃ

হিন্দুদের বিয়েতে কালরাত পালনের রীতি আছে। কালরাতে নবদম্পতির সহবাস নিষিদ্ধ। ঋষি ও ধোপারা বিয়ের দিন রাত্রে, গোয়ালা ও শাঁখারীরা বিয়ের দিন এবং তার পরের দিন রাত্রে, সাহা'রা বিয়ের দ্বিতীয় দিনের রাত্রে কালরাত পালন করে থাকে। কালরাতে সাহা বর ও কনের মাঝে দেখা সাক্ষাৎ-এর নিয়ম নাই বিধায় তাদের আলাদা ঘরে রাখা হয়। অন্য সব বর্ণে বর-কনের সাথে বাসর ঘরে ভাবী, দাদী, নানী ও ছোট ভাইবোনেরা থাকে। বিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত ঢাকার মুসলমান সমাজেও কালরাত পালনের প্রথা প্রচলিত ছিল। পূর্বকালে অত্রঅঞ্চলের কোন কোন মুসলিম পরিবারে বিয়ের দিন রাত্রে কালরাতসহ অন্যান্য লোকাচার পালনের উদ্দেশ্যে বালিকাবধূকে শ্বশুড়ালয়ে আনা হত। কালেরাতে বালিকাবধূ বা নববধূ ননদ, জা, নানীশাশুড়ি, দাদী শাশুড়ি এদের সবার সাথে ঘুমাত। আর বরের মা বাসরঘরে ছেলের সঙ্গে থাকত। প্রচলিত বিশ্বাস মতে, বাসররাতে মায়েরা ছেলের পাশে না থাকলে অনিষ্টকারী শক্তির অপতৎপরতা বৃদ্ধি পায়।[১১৫] পৌরানিক কাহিনীতে আচ্ছানো স্থানীয় মুসলিম নারীরা বিশ্বাস করত বেহুলা সুন্দরী বিয়ের রাতে লক্ষীন্দরের সঙ্গে বাসরযাপন করেছিল বলে তাদেরকে লোহার সিন্দুকে রাখার পরও লক্ষীন্দরকে সুতানালী সাপে কেটেছিল।[১১৬]

Dhaka University Institutional Repository

ফুলশয্যাঃ

কালরাত অতিবাহিত হলে নবদম্পতির যৌন মিলনে কোন বাঁধা থাকে না। এরপর তাদের জীবনে আসে ফুলশয্যার রাত। এই রাতেই নবদম্পতির যৌনজীবনের সূচনা ঘটে। বর ও নববধূর একত্রে প্রথম রাত্রিযাপনকে শাঁখারীরা শুভরাত্রি, ধোপা ও গোয়ালারা সোহাগরাত বলে থাকে। গোয়লা ও শাঁখারীদের বিয়ের তৃতীয় দিনের রাত্রিতে ফুলশয্যা উদযাপিত হয়। গোয়ালা নবদম্পতি বাসর যাপন করে বরের পিতৃগৃহে। এ উপলক্ষে বধূর ভাবী ও দুলাভাইরা তার জন্য নতুন শাড়ি, ফুলের গহনা ও মিষ্টি নিয়ে আসে। অন্যদিকে, শুভরাত্রিতে শাঁখারী বধূকে সজ্জিত করে নতুন শাড়ি পরানো হয়। বরও পরিধান করে নববস্ত্র। নবদম্পতিকে পাশাপাশি বসানো হয়। নববধূ নিজ হাতে নারিকেল ভেঙ্গে এর পানি দিয়ে স্বামীর পা ধুইয়ে দেয়। এরপর বধূর বৌদি, দুলাভাই ও ছোট ভাইবোনেরা তাকে বাসরঘরে আটকে রেখে ঘরের বাইরে সদর দরজায় বরের পথরোধ করে তার নিকট থেকে টাকা দাবি করে। তাদের দাবি মিটানোর পর বর বাসরঘরে প্রবেশ করতে পারে। কেউ কেউ আবার বধূর কাছ থেকেও টাকা আদায় করে। বধূর টাকাও তার স্বামীকেই পরিশোধ করতে হয়। শুভরাত্রি অতিবাহিত হলে পরদিন সকালে এয়োরা নবদম্পতিকে একত্রে পিঁড়িতে বসিয়ে গোসল করায়। এসময় গোসলের পানির সাথে নদী বা পুকুরের সংগ্রহ করা পানি মেশানো হয়।

মুসলিম সমাজে বিয়ের পরদিন পালিত লোকাচারঃ

পূর্বকালে মুসলিম পরিবারে বিয়ের পরদিন সকালে বধূ লক্ষী বা সাংসারিক কিনা যাচাই/পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাকে বাসর ঘর ঝাড় দিতে বলা হত। পূর্বাহ্নেই শাশুড়ি বাসর ঘরে চাল ও হলুদ ছিটিয়ে রাখত।[১১৭] কেউ কেউ আবার বাসরঘরের বিভিন্ন স্থানে হলুদ লুকিয়ে রাখত।[১১৮] নববধূ বাসরঘর পরিস্কার করে ঝাড় দিয়ে চাল থেকে হলুদগুলি বেছে আলাদা করে রাখলে বা লুকানো হলুদগুলি খুঁজে বের করতে পারে তবেই সে সাংসারিক ও লক্ষি বলে প্রসংশা পেত। উকিল বাপ সকাল বেলায় পরোটা, মিষ্টি, বাকরখানি, পনির রুটি, মুরগি মোসাল্লাম ইত্যাদি নাস্তা পাঠাত। এই নাস্তাকে নেহারি বলা হয়। এছাড়া ননদোসিরাও নববধূর জন্য নাস্তা আনত। সবাই একত্রে বসে নাস্তা খেত। পিত্রালয় থেকে বাবা, চাচা, মামা, উকিল বাপসহ অন্যান্য আত্মীয় পুরুষরা ও কনের ছোট ভাইবোনরা কনেকে দেখতে আসত। একে স্থানীয় মুসলমান 'মাটি পারান' বা 'মাত্তি পারানা' বলে থাকে। এখন কনের আত্মীয় স্বজনরা বিয়ের দিন রাতেই বরের বাড়িতে মাটি পারাতে যায়। নববধূর পিত্রালয় থেকে আগত অতিথিরা চলে গেলে, তার

Dhaka University Institutional Repository

হাতে পান-মিষ্টি দিয়ে শ্বশুড়ালয়ের সবার সাথে পরিচয় করানো হত। এই পর্বটির নাম 'ডাক শেখানো'। বিয়ের পরদিন শ্বশুড়ালয়ে একসঙ্গে বসে থাকা স্বামীর সব আত্মীয় স্বজনদের সামনে নববধূ দু'হাতে পান ও মিষ্টি নিয়ে যেত। নববধূকে ননদ বা ননাস সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিত। নতুন বউয়ের সঙ্গে সকল আত্মীয়স্বজন পান-মিষ্টি হাতে বিনিময় করে একে অপরে সম্বোধা করত। উল্লেখ, কন্যাবিদায়ের সময় কনের কুলায় রক্ষিত পান ও একটিমাত্র মিষ্টি এই পর্বের জন্য পিত্রালয় থেকে সাথে দেয়ার নিয়ম। বর কনেকে কোলে করে তুলে নিয়ে এক কাঁদি ঝুলন্ত পাকা কলার নিচ দিয়ে নিয়ে যেত। এক হাঁড়ি জোয়ারভাটার পানিতে পাটখড়ির দু'টো টুকরা ভাসিয়ে দেওয়া হত। চারপাশের সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখত- কখন ভাসমান শোলা বা পাটখড়ি দু'টি পাশাপাশি মিশে যায়। সবাই শোলাদু'টিকে বর ও কনের প্রতীকরূপেই কল্পনা করে নিত। মনে করা হত, শোলা দু'টি একসাথে মিশে গেলে বা কাছাকাছি থাকলে স্বামী স্ত্রীর মাঝে ভালবাসার বন্ধন দৃঢ় হবে।[১১৯]

বাসী নালান:

পূর্বকালে অত্রঅঞ্চলের মুসলিম সমাজেও বিয়ের পরদিন বর-কনেকে আনুষ্ঠানিকভাবে গোসল করানোর রেওয়াজ ছিল। এই পর্বে বরের আত্মীয় স্বজনরাতো থাকতই, প্রতিবেশী প্রত্যেক বাড়ি থেকে একজন করে লোককে অংশগ্রহণের করতে আমন্ত্রণ জানান হত।[১২০] বাড়ির উঠানে শীলপাটার উপর কনে ও জলচৌকিতে বর দাড়াত। কনেকে বরের ভাবীরা গোসল করাত। আর বরকে বন্ধুবান্ধব ও দুলাভাইরা। গোসলের পূর্বে বর ও কনেকে একত্রে 'জোড়া তেলাই' দেয়া হত। সবাই তাদের শরীরে হলুদ মাখিয়ে দিত। সোন্দা-গিলা বাটা দিয়ে মাথার চুল ধুইয়ে গোসল করাত। শেষে ধান-দূর্বা মিশ্রিত পানি মাথার উপর ঢেলে গোসল সম্পন্ন করা হত। পুনরায় ত্রয়োরা বর ও কনেকে জোড়া তেলাই দিত। কোন কোন জায়গায় গোসলের সময় বর কনের মাথার উকুন মারত আর বলত- 'আর উকুন হইব না।'[১২১] এ পর্বের সমাপ্তি হলে সেই স্থানে গর্ত করে পুকুর ছাপাই খেলা হত। গর্তের দুপাশে বরকনে অর্থাৎ দুই প্রতিযোগীকে বসিয়ে দেওয়া হত। গর্তটি পানিতে ভর্তি করার পর প্রথমে বর ও পরে কনে ঐ গর্তের ভেতর কড়ি, সোনার আংটি বা অন্য কোন ছোট্ট বস্তু লুকিয়ে রাখে এবং প্রতিপক্ষকে তা খুঁজে বের করার আহবান জানান। বস্তুগুলো যে যত তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করে, সেই-ই জয়ী হত। কোন কোন স্থানে গর্তের কাদাপানি ভেরত পাঁচটি কড়ি, পাঁচটি কাঁচাহলুদ ও কনের হাতের সোনার আংটি লুকিয়ে রেখে বর ও কনেকে খুঁজতে বলা হত। সোনার আংটি প্রথম কনের খুজে পাওয়াকে সুলক্ষণযুক্ত মনে করা হত।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে, সোনার আংটি প্রথম বর খুজে বের করলে তার স্ত্রীর আধিপত্য ক্রিয়াশীল থাকার লক্ষণ। এমনটি হলে বরের মা ও বোনের মন খারাপ হয়ে যেত। পুকুর ছাপাই খেলার পরপরই বরের বাড়িতে রঙ ছিটানো খেলা বেশ জমে উঠত। অনুষ্ঠানস্থলে সবাই একে অপরের গায়ে রঙ ও কাদা মাখামাখি করত। অনেকক্ষেত্রে পুরো মহল্লা রঙ খেলায় মেতে উঠত।[১২২] রঙ ও কাদা মাখামাখি থেকে বরকনেও বাদ যেত না। রঙ খেলা শেষে তাদেরকে পুনরায় গোসল করানো হত। গোসলের পর বরের মা পুত্র ও পুত্রবধূর হাত-পায়ের নখ খুটত। বর বা ননদের স্বামীরা কনেকে কোলে করে ঘরে নিয়ে যেত। ঘরের প্রবেশ পথে বরের মা, চাচী, দাদী, নানীসহ বর্ষীয় নারীরা বরকনেকে কুলা দিয়ে বরণ করত। এসময় একটি প্রদীপ জ্বালানো হত যা তিনদিন পর্যন্ত জ্বলত। অর্থাৎ কনে ফিরোল্টা দিন শ্বশুড়ালয়ে ফিরে আসলে তা নেভানো হত। ঘরের প্রবেশ পথে এই প্রদীপের আগুনের তাপে বরণকারীরা বরকনের দু'কান সেকত। স্থান বিশেষে ঘরের প্রবেশ পথে মাটির প্রদীপ বা হাঁড়িভাঙ্গার কয়েকটি টুকরো মাটিতে বিছিয়ে রাখা হত। কোথাও কোথাও আবার প্রদীপে শ্বাশুড়ি নিজ শাড়ির আঁচল বিছিয়ে রাখত। বরকনে বা বর কনেকে কোলে নিয়ে এর উপর দিয়ে হেঁটে ঘরে প্রবেশ করত। বরকনের পায়ের চাপে ভাঙ্গা প্রদীপ বা হাঁড়ির খন্ড খন্ড টুকরোগুলি বরের মা বা দাদী-নানীরা গুণে শাড়ির আঁচলে বেঁধে নেচে নেচে বলত- 'কি মজা, কি মজা, এইবার নায়নাতকুর দিয়া ঘর ভইরা যাইব।'[১২৩]

বাসী গোসল:

বিয়ের পরদিন বাসী বিয়ের পূর্বে বরকনেকে একত্রে বসিয়ে গোসল করানো ঢাকার সাহা, শাঁখারী ও ঋষিদের রীতি। সম্প্রতি সাহা'দের মাঝে এ রীতির ব্যত্যয় দেখা যায়। সাহা'দের অনেকেই বিবাহকার্য সম্পন্নের পরপরই সেদিন ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বাসী বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে ফেলে/থাকে/রাখে। শাঁখারী ও ঋষিদের বিয়েতে বাসী গোসল কনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। বাসী গোসলের সময় থেকে দশামঙ্গল পর্যন্ত আচরিত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি বরপক্ষের আয়ো কর্তৃক পালন করা শাঁখারীদের নিয়ম। তবে কনেপক্ষের আয়োরা অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত থাকে। বরপক্ষের পাঁচজন আয়ো একটি থালায় কাঁচাহলুদ বাটা, তেল, সাবান, ধান, দূর্বা, ফুল, প্রদীপ, দুধ ও কলা নিয়ে কনের বাড়িতে আসে। ঐ দিন পূর্বাহ্নেই বরপক্ষ চারজন কিশোরের হাতে চারটি কলাগাছ কনের বাড়িতে পাঠায়। অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে বাড়ির উঠানে পিঁড়ির চারপাশে সেই কিশোরেরা কলাগাছ ধরে বসে থাকে। বরকনেকে হলুদ মাখানোর কাপড় পরিয়ে একত্রে পিঁড়িতে বসানো হয়। আয়োরা বর ও কনের গায়ে হলুদ মাখানোর পর মাথায় তেল মাখে।

Dhaka University Institutional Repository

সুগন্ধি সাবান দিয়ে তাদেরকে গোসল করায়। গোসল শেষে মাথায় ধান-দূর্বা ছিটিয়ে, কপালে প্রদীপের শিষ ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করা হয়।

বাসী বিয়েঃ

বাসী গোসলের পর শাঁখারী বরকনেকে ঘরে এনে বিয়ের কাপড় পরানো হয়। আয়ো তাদেরকে সজ্জিত করে মাথায় টোপর পরায়। বর ও কনে বিয়ের পিঁড়িতে বসলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত মন্ত্র পড়ে কনের সিঁথিতে সিঁদুর প্রদান করে। এরপর বর তার ডান হাত অর্ধমুষ্ঠি করে আর একজন আয়ো আস্ত কলাসহ একটি পাত্র বরের কুনুই-এর নিচে ধরে রাখে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত বরের অর্ধমুষ্ঠিতে মন্ত্র পড়ে আস্তে আস্তে দুধ ঢালেন। দুধ বরের হাত বেয়ে কুনুই-এর নিচে ধরে রাখা পাত্রে পতিত হয়। সম্পূর্ণ দুধ ও কলা আয়োরা কনেকে খাওয়ায়। এই পর্বে কনেকে মন্ত্রপড়া দুধ-কলা খাওয়ানো বাসী বিয়ের একটি আবশ্যিক আচার হিসেবে বিবেচিত। ব্রাহ্মণ পুরোহিতসহ পাঁচজন আয়ো ও বরকনে কলাগাছের চারপাশ চৌদ্দ পাক ঘোরে। সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, এরপর আয়োদ্বয়, শেষে কনে ও বর। পরস্পরে আঁচলে আঁচলে গিঁট দেয়া হয়। কনের কাছে যে আয়ো থাকে সে কনের হাত ধরে। বর ও কনে এক অপরকে তাদের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে ধরে রাখে। কলাগাছের চারপাশ প্রদক্ষিণকালে ব্রাহ্মণ পুরোহিত মন্ত্র পড়ে প্রতিটি কলাগাছের গোড়ায় ও পুকুর খেলার গর্তে পানি ঢালেন। এসময় বরকনের রসিকতা সম্পর্কীয় শিশু কিশোরেরা কলাগাছের পাতা ছিঁড়ে দুষ্টামিরচ্ছলে নতুন বৌদি ও দাদাবাবুর পিছনে আঘাত করে।

বাসী বিয়ের পর বর ও কনেকে ঘরে বিছানো মাদুরে বসানো হয়। পূর্বকালে এসময় কনে বরের মাথার চুল আঁচড়িয়ে দিত। স্বামীর চারপাশ ঘুরে তাকে হাতপাখায় বাতাস করত। সেই সাথে একটু পর পর নিজের গায়েও বাতাস দিত।[১২৪]

গঙ্গা পূজাঃ

বিয়ের একদিন পর গোয়ালা ও ধোপা দম্পতিকে নিয়ে তাদের অভিভাবক ও পরিজনেরা গঙ্গা পূজা করার উদ্দেশ্যে ঢাকেশ্বরী বা লোকনাথপুর মন্দিরে যায়। ঐদিন পূর্বাহ্নে বরের বাড়িতে পাঁচজন সোহাগান নবদম্পতিকে একত্রে হলুদ মেখে গোসল করায়। এসময় ধোপা সোহাগানরা জোকার দেয়। গোসলের শেষ পর্বে গোয়ালা সোহাগানরা ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পুকুর থেকে সংগৃহিত পানি নবদম্পতির মাথায় ঢালে।

Dhaka University Institutional Repository

আর ধোপা সোহাগানরা নবদম্পতির সম্মুখে পাঁচবার সরিষাদানা ঘুরিয়ে তা প্রদীপের আগুনে নিক্ষেপ করে তাদের টোকাটাকি জ্বালায়। বর ও নববধূ বিয়ের কাপড় পরিধান করে। তাদের মাথায় টোপর পরানো হয়। এ উপলক্ষে গোয়ালা বরের মা পুরি, লুচি, আটার হালুয়া, পায়েস ও গোলগোলা তৈরি করে। নববধূর মা'ও সেখানে নানান পদের খাবার নিয়ে আসে। গোয়ালারা গঙ্গাপূজা পূর্বে মন্দিরের ভেতর ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক শীতলাপূজা সম্পন্ন করে। শীতলাপূজার উপচার থাকে ডাবের পানি, দই, পায়েস ও পাঁচটি কুলিয়া[১২৫]। শীতলা পূজা শেষে গোয়ালারা গঙ্গাপূজার জন্য পুকুর পাড়ে যায়।

গোয়ালা ও ধোপা নববধূ নিজহাতে পুকুর পাড় বা সিড়ি পানি দিয়ে ধূয়ে পরিষ্কার করে সেখানে পাঁচটি আইপানের ছাপ দেয়। পাশে পূজার উপচার সাজিয়ে রাখা হয়। ধোপারা গঙ্গাপূজার উপচার হিসেবে রাখে পাঁচটি পান, দুইটি সুপারি, দুইটি মাটির চাকা, আইপানের পাত্র, আইপান-সিঁদুর চর্চিত একফানা কলা ও আইপান-সিঁদুর চর্চিত পাঁচটি মাটির হাড়ি। প্রত্যেকটি হাড়িতে একটি করে পুরি, কলা ও খানিকটা কাঁচাবুট থাকে। গোয়ালাদের নিয়মানুযায়ী, বরের বোন আইপান-সিঁদুর চর্চিত কলার ফানা তুলে নিয়ে বরের হাতে দিলে বর সেটি নববধূর কোঁচরে রাখে। তারপর নববধূ ও বর একসাথে দাড়িয়ে সূর্য্যকে নমস্কার করে। এসময় বরের ভাবী বিবাহ মন্ডপে ব্রাহ্মণ ঠাকুরের দেয়া বর ও কনের ওড়না-চাদরের গিঁট খুলে। এ কাজের জন্য ভাবীর দাবী অনুযায়ী বরকে টাকা পরিশোধ করতে হয়। ওড়নার গিঁট খোলার পর বর ও নববধূ বাবা-মা সহ উপস্থিত বয়োজেষ্ঠ্যদের প্রণাম করে। এখানে উল্লেখ্য, লাগান বাঁধার পর থেকে গঙ্গাপূজা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত গোয়ালা বর/কনের বয়োজেষ্ঠ্য কাউকে প্রণাম করা নিষেধ। অন্যদিকে, ধোপা বর তার নববিবাহিতা স্ত্রীর কোঁচরে কলার ফানা রাখলে নববধূ ডানহাতে কলার ফানা তার নিজ পেটের সাথে ধরে বাম হাতের অঞ্জলি ভরে পুকুরের পানি তুলে নিয়ে পূজার উপচারের উপর পাঁচবার ঘুরায়। এরপর ধূপধূনা উপচারের উপর পাঁচবার ঘুরিয়ে নববধূ ও তার স্বামী গঙ্গাকে প্রণাম করে। গঙ্গাপূজা শেষে বিয়ের টোপর, ধান, দূর্বা, জগ্গেগর পোড়া ছাই, অম্রপল্লব, প্রদীপের ভাঙ্গা টুকরা ইত্যাদি নদীতে বিসর্জন দেয়ার নিয়ম।

বৌভাত:

ইসলামে বিবাহ অনুষ্ঠানের পর বরপক্ষ কর্তৃক আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীকে পানাহার করানো সুন্নাত।[১২৬] মুসলমানদের কাছে এই অনুষ্ঠানটি ওয়ালিমা নামে পরিচিত। স্থানীয় মুসলমানরা এ অনুষ্ঠানকে

Dhaka University Institutional Repository

বৌভাত বলে থাকে। বৌভাত অনুষ্ঠানটি বিয়ের এক বা দুই দিন অন্তে অনুষ্ঠিত হয়। অতীতে এ অনুষ্ঠানে কনেপক্ষকে নিমন্ত্রণ করার রেওয়াজ ছিল না। বিশ শতকের আশি দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বৌভাত অনুষ্ঠানে কনেপক্ষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিশ শতকের শেষার্ধ বা একুশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে স্থানীয় হিন্দু সমাজেও মুসলমানদের ওয়ালিমার অনুরূপ বৌভাত অনুষ্ঠানের প্রচলন ঘটেছে। জানা যায়, পূর্বকালে অত্রঅঞ্চলের মুসলমানদের কারো কারো মাঝে বৌভাত অনুষ্ঠান করার রীতি ছিল না। বিয়ের দিন বরের পিতা নিজ গৃহে বরযাত্রীকে ভোজন করিয়ে কনের বাড়িতে আসত। পরবর্তীতে এ ঝামেলা এড়াতে কনের বাড়িতেই বরযাত্রীর ভোজনের ব্যবস্থা করার জন্য বরপক্ষ কনের পিতাকে 'চুলা খরচ' দেয়া শুরু করে। পাকিস্তান আমলেও এ প্রথার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়।[১২৭] বিশ শতকের ত্রিশ-চল্লিশ দশকের সময় বৌভাতে সাদা পোলাও, আলু সহযোগে গরুর মাংসের ঝাল তরকারি বা খাসির মাংসের পুরিজি পরিবেশন করা হত। কখনো কখনো বারতি পদ হিসেবে মাছ ভাজা থাকত। এর সাথে জাফরানি জর্দা ও শিরবিরিঞ্জ দেয়া হত।[১২৮] বর্তমানেও আছে নানা রকম আয়োজন; তার মধ্যে কাচ্চি বিরিয়ানি, সাদা পোলাও, মুরগির রোস্ট, টিকয়া বা সামি কাবাব, পনির, ভেজিটেবল কারি, গরু-মুরগি বা খাসির রেজালা, তন্দুর রুটি, শাহি টুকরা, ফিরনী, জর্দা, রুই বা চিংড়ি মাছ ভাজা, বোরহানি বা কোমল পানীয়, কফি বা ফলমূল।

আড়াইয়া নাইয়রঃ

মুসলমান ও ধোপাদের বিয়ের তিন দিনের দিন আর গোয়ালাদের বিয়ের চার দিনের দিন কনেপক্ষ বরের বাড়িতে বর-কনেকে নেওয়ার জন্য আসে। এই অনুষ্ঠানটির নাম 'আড়াই নাইয়র' বা 'আড়াইয়া নাইয়র'। মুসলিম সমাজে কনেপক্ষ আড়াইয়া নাইয়রে বরের বাড়িতে বুন্দিয়া মিষ্টি সহযোগে চার পাঁচ কেজি চালের জর্দা ও মিষ্টি নিয়ে যায়। পূর্বকালে এর সাথে ভিগারুটিও নেয়া হত।[১২৯] বিয়ের দিন কনের সাথে আগত দাদী, নানী, ভাবী, ছোট ভাই বা বোনকে বরপক্ষ নতুন বস্ত্র উপহার দেয়। গোয়লারা আড়াই নাইয়রে কনে ও জামাইকে আনতে গেলে পাঁচ ছয় কেজি মিষ্টি নিয়ে যায়। তাদের চা বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। এই নাইয়রে জামাইসহ মেয়ে পিত্রালয়ে প্রবেশের পরপরই নতুন জামাইকে দিয়ে মাড়োয়া খোলানো গোয়ালাদের রীতি । মাড়োয়া খোলার জন্য শাশুড়ি কর্তৃক নতুন বর পারিতোষিক পায়।[১৩০]

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠানের উদ্ধৃতি ওয়াকিল আহমদ ঢাকার মুসলমান সমাজে প্রচলিত 'আড়াইউল্লা' নামক একটি অনুষ্ঠানের কথা লিখেছেন। দ্বিরাগমনের আড়াই দিনের মাথায় বর কনেকে নিয়ে নিজের গৃহে ফিরে আসে। এ উপলক্ষে কনের বাড়িতে মাছ, দই ও মিষ্টদ্রব্য দিতে হয়। মাছ না দেওয়া পর্যন্ত অভিভাবক মেয়ের জামাইকে মাংস দিয়ে পলান্ন খাওয়াবেন।[১৩১]

পূর্বকালে মুসলমান সমাজে আড়াই নাইয়রের দিন বরসহ কন্যা পিতৃগৃহে আগমন করলে তাদের প্রথমে মাড়োয়ায় নেয়া হত। এখন ঘরের বাইরে বরকনেকে জলচৌকিতে দাড় করানো হয়।[১৩২] স্থান বিশেষে বরকে জলচৌকি ও কনেকে শীলপাটার উপর দাড় করানোর রীতি। এসময় কনের গায়ে হলুদের শাড়িতে পর পর তিনবার বরের দু'পা পেঁচানো হয়। প্রতিবারই বর তা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা চালায়। এরপর বর ও কনেকে কুলা দিয়ে বরণ করে ঘরে নেয়া হয়। সেখানেও নবদম্পতির ঘর ফুলে সজ্জিত করা হয়।

পরদিন ভোরবেলায় বর কাউকে না বলে বিছানার নীচে টাকা রেখে লুকিয়ে নিজ গৃহে চলে আসে। শ্বশুড়ালয় থেকে বরকে নাস্তার আমন্ত্রণ জানানো হলে সে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে সেখানে যায়। কনেপক্ষ সামর্থ্যের আলোকে নানান পদের খাবার তাদের সামনে পরিবেশন করে। ধনীরা নাস্তার পাশাপাশি মধ্যাহ্ন ভোজনেরও আয়োজন করে থাকে। তাছাড়া কিছুক্ষণ পর পর অতিথিদের রকমারি খাবার খেতে দেয়া হয়।[১৩৩]

ফিরোল্টা:

মুসলিম কনে বরসহ পিত্রালয়ে দুইদিন অবস্থানের পর বরের আত্মীয় স্বজনরা এসে তাকে শ্বশুড়ালয়ে নিয়ে যায়। পিতৃগৃহে কনের প্রথম নাইয়র থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্বশুড়ালয়ে ফিরে আসার অনুষ্ঠানটি 'ফিরোল্টা' বা 'ফেরোল্টা' (ফির বা ফের + উল্টা) নামে পরিচিত। স্থান বিশেষে এই অনুষ্ঠানটিকে 'ফিরানি' বা 'ফিরা নাইয়র'ও বলা হয়ে থাকে। এ উপলক্ষে কনেপক্ষকে অবশ্যই ভুরি-ভোজনের আয়োজন করতে হয়। অতিথিদের আপ্যায়নে পরিবেশিত খাবারের মধ্যে মোরগ পোলাও, মুরগির রেজালা, নানরুটি, খাসি রেজালা, জালি বা শামি কাবাব, মুরগি ফ্রাই বা রোস্ট, পুডিং, বোরহানি, পনির, পায়েস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বরপক্ষ সামর্থ্যের আলোকে কনের বাড়িতে আধা বা একমণ মিষ্টি নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আসে। পূর্বকালে জনপ্রতি এককেজি মিষ্টি ও এক থালা মালাই আনা হত। নানদোসিরা নববধূর জন্য বেলি ফুলের মালা আর মাখনা সওগাত আনত।[১৩৪] ফিরোল্টা অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষন হল করমচা গাছের ডাল দিয়ে সাজানো পানগাছ। পানগাছ সাজাতে একটি পাত্রের অর্ধেকাংশে মাটি দিয়ে এর উপর করমচা গাছের ডাল স্থাপন করে বাকী অর্ধেকাংশে পানি দিয়ে নদী বানানো হয়। কাপড়ের তৈরি দুটি বর-কনে পুতুল বসানো হয় গাছের ডালে। শলাকা ও সিগারেটের পান্নি কাগজের তৈরি চোঙ্গা (মই) পান গাছের নিচে রাখা হয়। পান, সিগারেট, চকলেট বা চুইনগাম করমচা গাছের কাটায় গেঁথে দেয়া হয়। এর সাথে কাগজের চিরকুটে লেখা ছড়ার শেষে পান, সিগারেট, চকলেট বা চুইনগামের মূল্য দেয়া থাকে- 'আসসালামুআলাইকুম, কুম কুমা কুম, কোনে কানে ডোলে ডালে, গুরদা গুম গুমা গুম। বাপের বেটা যে হইব, চোঙ্গা দিয়া উঠিব, কোটা দিয়া পারিব। একটা পান খাইলে ৫০০ টাকা দিতে হইব।'[১৩৫] বরের বাড়ি থেকে আগত অতিথিরা বিশেষ করে বরের বন্ধুবান্ধব ও দুলাভাইদের অবশ্যই পানগাছের পান ও সিগারেট খেতে উচ্চমূল্য দিতে হয়। উচ্চমূল্যের কারনে বরের বন্ধুগণ কনের বাড়ির আচারের বোয়াম, তৈজসপত্র বা অন্যকিছু দুষ্টামীর ছলে চুরি করে নিত। পূর্বকালে ধনীরা বরের বাড়ি থেকে আগত নারীদের সবাইকে নতুন শাড়ি পরিধান করিয়ে দিত। সাধারণতঃ বরকনের সাথে বরের ভাবী, নানী, দাদী, ছোট ভাই বা বোন যে নাইয়রে আসে তাকে কনের পিত্রালয় থেকে নতুন কাপড় উপঢৌকন দেয়ার নিয়ম।

আটাইয়া নাইয়রঃ

কনে আটদিন শ্বশুড়ালয়ে থাকার পর পুনরায় আটদিনের জন্য পিত্রলয়ে নাইয়রে যায়। এ নাইয়রটির নাম আটাইয়া নাইয়র। ফিরোল্টা পর পাঁচ দিনের দিন কনের দাদী, নানীসহ বর্ষীয় নারীরা 'খবরানা পিঠা' নিয়ে তার শ্বশুড়ালয়ে আসে। কনেকে আটাইয়া নাইয়রে পিতৃগৃহে নেয়া হবে এ খরব তারা শ্বশুড়িকে জানিয়ে যায়। খরবানা পিঠায় থাকে প্রায় আধা কেজি ওজনের একশ 'জামাই খেদাইনা পিঠা' (মালপোয়া) ও মালাই দেয়া পাটিসাপটা।[১৩৬] আটাইয়া নাইয়রে কনের ভাই বোনেরা তাকে নিতে আসে। তাদেরকে কোরমা পোলাও রান্না করে খায়ানো হয়।

নাওথিঃ

বিয়ের পর নয় দিনের দিন উৎযাপিত অনুষ্ঠানকে স্থানীয় গোয়ালারা নাওথি বলে। এই অনুষ্ঠানে কনের পিতাকে বরের পরিবারের লোকদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোর রীতি। লাগান বাঁধার পর তিন-চারদিন বর-

Dhaka University Institutional Repository

কনে ও তাদের পরিবারের লোকদের মাছ খাওয়া নিষেধ। বিয়েতে আমন্ত্রিত অতিথিদের ভাত-মাছ দিয়ে আপ্যায়ন করা হলেও নিষেধের কারণে বর ও তার পরিজনেরা এসময় কনের বাড়িতে নিরামিষ খায়। সেজন্য কনের পিতা নাওথি অনুষ্ঠানে বেয়াই বাড়ির সবাইকে নিমন্ত্রণ জানায়। গোয়ালাদের মধ্যে ধনী ব্যক্তিরা নাওথি অনুষ্ঠানে আত্মীয় স্বজনদের সাথে নিয়ে আসে। এ উপলক্ষে ইলিশ, রুই, চিংড়ি, গজালসহ নানান পদের মাছ, সবজি ভাজা, ডাল, পায়েস ইত্যাদি রান্না করা হয়। আরো থাকে হরেক পদের পিঠা, মিষ্টি ও দই। বরপক্ষ কনের বাড়িতে দশ-পনের কেজি মিষ্টি আনে। পিত্রালয় থেকে নববধূ ও বরকে নববস্ত্র প্রদান করা হয়।

দশামঙ্গল:

সাহা ও শাঁখারীদের বিয়ের সর্বশেষ অনুষ্ঠান হল দশামঙ্গল। বিয়ের দশম দিনে কনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে উভয়পক্ষের আত্মীয় স্বজনরা কনের বাড়িতে আসে। ঐদিন সকালে শুভ লগ্ন অনুযায়ী বরকনেকে পিঁড়িতে বসিয়ে হলুদ গোসল করানো হয়। এসময় বরকনে হলুদ মাখানোর কাপড় পরিধান করে। গোসল শেষে বরকনেকে ধান, দূর্বা, আগুনে মুছুরি, হাঁসের ডিম ও প্রদীপের শিষে আশীর্বাদ ও বরণ করা হয়। সাহারা বাড়ির উঠোনে চারটি কলাগাছ পুতে। রঙ বেরঙ-এর নিশান, অম্রপল্লব, ফুল ও মাটির প্রদীপ ছিদ্র করে দড়িতে মালা গেথে কলাগাছের চারপাশ সাজায়। মাঝখানে বিয়ের পিঁড়ি থাকে। সাহাদের নিয়মানুযায়ী, ব্রাহ্মণ ঠাকুর মন্ত্র পড়া শুরু করলে বরকনে কলাগাছের চারপাশ সাত পাক ঘোরে। প্রদক্ষিণ শেষে আয়োরা বরকনেকে পিঁড়িতে বসিয়ে গোসল করায়। শাঁখারীতে মাঝে উঠোনে চারজন কিশোর পিঁড়ির চারকোণায় কলাগাছ ধরে বসে থাকে। বরকনে বিয়ের কাপড় পরিধান করে পিঁড়িতে বসে। শাঁখারী কনেকে বাসী বিয়ের অনুরূপ নিয়মে দুধ-কলা খাওয়ানো হয়। পাঁচজন আয়ো আর বরকনে একে অপরের আঁচলে আঁচলে গিঁট দিয়ে কলাগাছের চারপাশ সাতপাক ঘোরে। তাদের সম্মুখে ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকেন। ঘোরার কালে তিনি মন্ত্র পাঠ করে প্রতিটি কলাগাছের গোড়ায় পানি ঢালেন। এ পর্ব সমাপ্ত হলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত মন্ত্র পড়ে বরের আলোয়ান ও কনের ওড়নার গিঁট (বিবাহ মন্ডপে দেয়া হয়েছিল) খোলেন এবং মায়ের দেয়া পুঁটলি ওড়নার বাঁধন থেকে খুলে আয়োদের হাতে দেন। এই পুঁটলি একবছর পর্যন্ত সযত্নে তুলে রাখার রীতি। বিয়ের প্রথম বছর শাঁখারী দম্পতির বিয়ের কাপড় পরিধান করা নিষেধ। উল্লেখ্য শাঁখারীদের নিয়মানুযায়ী, বিয়ের পর দশামঙ্গল পর্যন্ত কনেকে পিতার গৃহে অবস্থান করতে হয়। সেজন্য কনে শ্বশুড়ালয়ে গেলেও তাকে রাত্রিযাপন করতে

Dhaka University Institutional Repository

হয় পিতৃগৃহে। গাটবন্ধনের কারণে এসময় বরের কনেকে ছেড়ে অন্যত্র থাকার কোন সুযোগ নেই। বিয়ের দিন কনের মা মেয়েজামাই-এর জন্য একটি ঘরে বিছানা করে যা দশামঙ্গল পর্যন্ত সেখানেই থাকে। দশামঙ্গলের আনুষ্ঠানিকতার সমাপ্তির পর কনের মা নিজ হাতে সেই বিছানা তুলে। এরজন্য মেয়ের জামাই কর্তৃক তাকে টাকা প্রদান করার রীতি।[১৩৭]

বিবাহ উপকরণ নদীতে বির্সজন:

হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বিয়েতে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ, যেমন- রাখী বা কাংনা, ধান, দূর্বা, ফুল, পান, সুপারি, প্রদীপের ভাঙ্গা টুকরা, ফুল, পরিত্যাক্ত হলুদ ইত্যাদি নদীতে বির্সজন দেয়ার নিয়ম। স্থানীয়রা নদীতে বির্সজন দেয়াকে 'নদীতে ঠান্ডা করা' বলে থাকে। মুসলমানরা আড়াই নাইয়রের পরদিন, ধোপা ও গোয়ালারা গঙ্গা পূজা শেষে, সাহা ও শাঁখারীরা দশামঙ্গলের দিন এসমস্ত উপকরণ বির্সজন দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ:

১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সাকিয়া জামাল, বয়স: ৪৫, সেলাই প্রশিক্ষিকা, জগন্নাথ সাহা রোড।

২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- গুলশানারা, বয়স: ৪৩, সেলাই প্রশিক্ষিকা, নবাবগঞ্জ।

৩. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- গুলশানারা, প্রাগুপ্ত।

৪. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- নাজমা খানম, বয়স: ৬২, গৃহিণী, উর্দুরোড।

সাকিয়া জামাল, প্রাগুক্ত।

৫. ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন- হিরা বেগম, বয়স:৫০ , গৃহিণী, নবাবগঞ্জ।

ইয়াসমিন বেগম, বয়স: ৩২, রান্না প্রশিক্ষিকা, নবাবগঞ্জ।

সায়মা, বয়স: ২৮, শিক্ষিকা, নবাবগঞ্জ।

নাসিমা পারভীন, বয়স: ৩৭, চাকুরী, হাজারীবাগ।

গুলশানারা, সাকিয়া জামাল, প্রাগুক্ত।

৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- ফরিদা পারভীন, বয়স: ৫৬, বালুরঘাট।

৭. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- বিরেশ চন্দ্র সাহা, বয়স: ৬৬, সভাপতি: মহানগরী সার্বজনিন পূজা কমিটি, বালুরঘাট।

দীপু সাহা, বয়স: ৬৩, গৃহিণী, লক্ষিবাজার।

৮. সায়েম সোলায়মান সম্পাদিত, (২০০৮), *আমার সাত দশক-শিল্পপতি আনোয়ার হোসেনের আত্মজীবনী*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ধানমন্ডি, ঢাকা, পৃ:৩৯।

৯. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- তোরনী ঘোষ, বয়স: ৮০, গৃহিণী, জয়নাগ রোড।

১০. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- বিদ্যুত কুমার নাগ, বয়স: ৫১, মালিক: কল্পনা বোডিং ও হোটেল, শাঁখারী বাজার।

১১. জেমস ওয়াইজ, (১৯৯৯), *পূর্ববঙ্গের জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, তৃতীয় খন্ড, অনুবাদ- ফওজল করিম, মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, আইসিবিএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ: ২০১।

১২. ঐ, পৃ: ২০২।

১৩. ঐ, পৃ: ২০৫।

১৪. ঐ, পৃ: ৫০।

১৫. ঐ, প্রথম খন্ড পৃ:১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. ঐ, পৃ: ১০৮।

১৭. স্থানীয়রা চিরুনিকে কাঙ্গোই বা কাঙ্গাই বলে থাকে।

১৮. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- রতন মালা নাগ, বয়স: ৭৬, গৃহিণী, শাঁখারী বাজার।

১৯. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আরফান নেসা, বয়স: ৯০, গৃহিণী, আমলিগোলা।

২০. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- ঐ।

২১. আমেলাতুল খালেক, (২০১১), *আমার দেখা ঢাকা শহর: জীবন পাতার জলছবি*, জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ: ৯৪।

২২. মোমেন চোধুরী, (১৯৯৯), *বাংলাদেশের লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান জন্ম ও বিবাহ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ:১৭৩।

২৩. জেমস ওয়াইজ, তৃতীয় খন্ড, পৃ: ১০৮।

২৪. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, (২০০৮), *ঢাকার ইতিবৃত্ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি*, গতিধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ: ১৪৯।

২৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- কামালউদ্দিন মালিক, বয়স: ৫৭, শিল্পপতি, উর্দুরোড।

২৬. জেমস টেলর, (১৯৭৮), *কোম্পানী আমলে ঢাকা*, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ: ১৬২।

২৭. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আনার বেগম, বয়স: ৮৪, গৃহিণী, বংশাল।

২৮. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- রামানন্দদাস, বয়স: ৫৯, সবাপতি ও মাতব্বর: পশ্চিম ঋষিপাড়া পঞ্চায়েত ও মন্দির কমিটি।

২৯. ঐ

৩০. জেমস ওয়াইজ, তৃতীয় খন্ড, পৃ: ১৪১।

৩১. জেমস টেলর, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬২।

৩২. ঘোলা প্রসাদ হল গোয়ালা ও ধোপাদের নারায়ণ পূজার মূল প্রসাদ। গোয়ালারা কাঁচাদুধ, নারিকেল কুড়ানো, কলা ও গুড় মিশিয়ে ঘোলা প্রসাদ তৈরি করে। আর ধোপারা পানিতে ভেজানো সুজি নিংড়ে এরমধ্যে কলা, কুড়ানো নারিকেল, গুড়, দাড়চিনি, এলাচ ও কাঁচাদুধ মিশিয়ে ঘোলা প্রসাদ তৈরি করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. পাঞ্জেরি এক ধরণের খাবার যা গোয়ালারা নারায়ণ পূজার প্রসাদে রাখত। সুজি ঘিয়ে ভেজে এর সাথে চিনি মিশ্রিত করে পাঞ্জেরি তৈরি করা হয়।

৩৪. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আয়মন নেসা, বয়সঃ ১০০, গৃহিণী, আমলিগোলা।

৩৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সুমন্ত চন্দ্র দাস, বয়সঃ ৭৬, সভাপতি ও মাতব্বরঃ পূর্ব ঋসিপাড়া পঞ্চায়েত ও মন্দির কমিটি।

৩৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- তোরনী ঘোষ, প্রাগুক্ত।

৩৭. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- শ্রীমনি, বয়সঃ ৬৫, ধোবানী, উমেশ দত্ত রোড।

৩৮. দলগত সাক্ষাৎকার- সায়মা, গুলশানারা, প্রাগুক্ত।

৩৯. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আরফান নেসা, প্রাগুক্ত।

৪০. শাহীদা আক্তার, (১৯৯৭), *গায়ে হলুদ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ৬।

৪১. শীলা বসাক, (১৯৯৮), *বাংলা ব্রতপার্বণ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃঃ ৬।

৪২. শাহীদা আক্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।

৪৩. পল্লব সেন গুপ্ত, (১৯৮৪), *পূজা-পার্বণের উৎসকথা*, পুস্তক বিপণি কলকাতা, পৃঃ ১৫৪, ১৭৮।

৪৪. শাঁখারীদের বিয়ের কয়েক দিন আগে আয়োরা গুড়া চালের মন্ডের সাথে সলিতা দিয়ে আগুনে মুছুরি প্রদীপ তৈরি করে।

৪৫. ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন- মালতি ঘোষ, বয়সঃ ৬৩, গৃহিণী, কমল দহ রোড।

কল্পনা ঘোষ, বয়সঃ ৪২, গৃহিণী, কমল দহ রোড।

রনজিৎ ঘোষ, বয়সঃ ৬৫, ব্যবসায়ী, কমল দহ রোড।

সত্যজিত ঘোষ, বয়সঃ ৫২, ব্যবসায়ী, কমল দহ রোড।

স্বপন ঘোষ, বয়সঃ ৩৫, ব্যবসায়ী, কমল দহ রোড।

৪৬. ব্যক্তিগত ও দলগত সাক্ষাৎকার- শিবলাল চক্রবর্তী, বয়সঃ ৫৫, ধোপা, উমেশ দত্ত রোড।

নেপাল বাবু, বয়সঃ ৭০, ধোপা, উমেশ দত্ত রোড।

শ্রীমনি, প্রাগুক্ত।

৪৭. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৯-১৫০।

৪৮. মোমেন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৮৬।

৪৯. আমেতুল খালেক বেগম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

৫০. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আরফান নেসা, পূর্বোক্ত।

৫১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সেলিমা রহমান, বয়সঃ ৬৫, গৃহিণী, উর্দুরোড।

আশরাফউদ্দিন মালিক, বয়সঃ ৬০, ব্যবসায়ী, উর্দুরোড।

৫২. জেমস ওয়াইজ, পূর্বোক্ত, পৃঃ৫১।

৫৩. ঐ, পৃঃ ৬১।

৫৪. ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন- রেখা রানি ঘোষ, বয়সঃ ৬৩, কায়েৎটুলি।

রুমা ঘোষ, বয়সঃ ৪৩, গৃহিণী, কায়েৎটুলি।

সঞ্জয় ঘোষ, বয়সঃ৩৯, ব্যবসায়ী, জয়নাগ রোড।

শান্তা ঘোষ, বয়সঃ ২০, ছাত্রী, জয়নাগ রোড।

তোরনী ঘোষ, প্রমুখ।

৫৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- মিনতি বালা, বয়সঃ ৭৫, গৃহিণী, শাঁখারী বাজার।

৫৬. দলগত সাক্ষাৎকার- রুমা ঘোষ, রেখা রানি ঘোষ, প্রাগুক্ত।

৫৭. জমিদার পুষ্প সাহার পুকুরটি স্থানীয়দের কাছে পুষ্পশা পুকুর নামে পরিচিত।

৫৮. ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন- উর্মিলা দাস, বয়সঃ ৬৭, বৈষ্ণবী, পূর্ব ঋষিপাড়া।

শান্তি রানি, বয়সঃ ৬৩, গৃহিণী, পূর্ব ঋষিপাড়া।

শনিষ্ট, বয়সঃ ৫৭, গৃহিণী, পূর্ব ঋষিপাড়া।

মনি রানি, বয়সঃ ৫৫, গৃহিণী, পূর্ব ঋষিপাড়া।

সুমন্ত চন্দ্র দাস, প্রমুখ।

৫৯. দলগত সাক্ষাৎকার- সালেহা বেগম, বয়সঃ ৬০, আয়া, আমলিগোলা।

ফাতেমা আক্তার, বয়সঃ ৫০, গৃহিণী, আমলিগোলা।

আরফাননেসা, প্রাগুক্ত।

৬০. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সাকিয়া জামাল, পূর্বোক্ত।

৬১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আয়মন নেসা, সায়মা, পূর্বোক্ত।

৬২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- গোল নাহার, বয়সঃ৭৫, গৃহিণী, নিমতলী।

৬৩. দলগত সাক্ষাৎকার- মিতালি নাগ, বয়সঃ ৪০, গৃহিণী, শাঁখারী বাজার।

সুকলা নাগ, বয়সঃ ৪৫, গৃহিণী, শাঁখারী বাজার।

Dhaka University Institutional Repository

৬৪. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- বিরেশ চন্দ্র সাহা, পূর্বোক্ত।

৬৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- রুমা দাস, বয়সঃ ৫২, ধোবানী, ঢাকেশ্বরী।

৬৬. সায়েম সোলায়মান সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪।

৬৭. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- রুমা ঘোষ, পূর্বোক্ত।

৬৮. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- শ্রীমনি, পূর্বোক্ত।

৬৯. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আহাম্মদি আক্তার, বয়সঃ ৬৩, সেলাই প্রশিক্ষক, আমলিগোলা।

৭০. দাম্পত্য জীবন দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার অর্থে স্থানীয় মুসলমানরা জোড়া কায়েম শব্দটি ব্যবহার করে থাকে।

৭১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আয়মন নেসা, বয়সঃ ১০০, গৃহিণী, আমলিগোলা।

৭২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সুধারানী সুর, বয়সঃ ৯০, গৃহিণী, শাঁখারী বাজার।

৭৩. জেমস ওয়াইজ, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ১৬৫।

৭৪. ঐ।

৭৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আনন্দময় সুর, বয়সঃ ৫৭, শঙ্খবনিক, শাঁখারী বাজার।

৭৬. মোমেন চৌধুরী, পৃঃ ১৯৪।

৭৭. ঐ, পৃঃ ১৯৫।

৭৮. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সুফিয়া বেগম, বয়সঃ ৮০, গৃহিণী, লালবাগ।

সুরাইয়া, বয়সঃ ৬৫, গৃহিণী, সেক সাহেব বাজার।

৭৯. দলগত সাক্ষাৎকার- দিপক কুমার নাগ, বয়সঃ ৬০, মালিকঃ কল্পনা বোর্ডিং ও হোটেল, শাঁখারী বাজার।

বিদ্যুত কুমার নাগ, পূর্বোক্ত।

৮০. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- দেব নারায়ণ ঘোষ, বয়সঃ ৬০, ব্যবসায়ী, উমেশ দত্ত রোড।

৮১. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পৃঃ ১৫১।

৮২. নাজির হোসেন, (১৯৯৫), *কিংবদন্তির ঢাকা*, ৩য় সংস্করণ, থ্রি ষ্টার কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ, ঢাকা, পৃঃ ২৮৮।

৮৩. জেমস ওয়াইজ, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৯৬।

৮৪. মোমেন চৌধুরী, পৃঃ ১৯৯।

৮৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সোহাগবালা, বয়সঃ ৭০, ধোবানী, উমেশ দত্ত রোড।

Dhaka University Institutional Repository

৮৬. মোমেন চৌধুরী, পৃ: ১৯৭।

৮৭. দলগত সাক্ষাৎকার- নাজির হোসেন নাজির, বয়স: ৭০, মাজেদ সর্দারের ছেলে, নাজিরা বাজার।

আজিমবক্স, বয়স: ৬৫, মাওলাবক্স সর্দারের সর্দারের ছেলে, ফরাশগঞ্জ।

৮৮. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- শরফুদ্দিন, বয়স: ৬১, ব্যবসায়ী, কলতা বাজার।

মোহাম্মদ হারুন, বয়স: ৭৩, ব্যবসায়ী, রহমতগঞ্জ।

৮৯. সোনিয়া নিশাত আমিন সম্পাদিত, (২০১০), *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ: ৬৬।

৯০. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আফসানি বেগম, বয়স: ৯৫, গৃহিণী, রহমতগঞ্জ।

আয়মননেছা, পূর্বোক্ত।

৯১.ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সোনাবানু, বয়স:৭৪, গৃহিণী, মৌলভী বাজার।

আনসারী বেগম, বয়স: ৬৫, গৃহিণী, খাদে দেওয়ান শিং লেন।

৯২. আবদুল হাফিজ, (১৯৯৪), *লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ: ৩৬৮-৩৬৯।

৯৩. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫২।

৯৪. সায়েম সোলায়মান সম্পাদিত, পূবোক্ত, পৃ: ১০৯।

৯৫. দলগত সাক্ষাৎকার- সোলকা রানি, বয়স: ৪৫, গৃহিণী, পশ্চিম ঋষিপাড়া।

রিনা রানি, বয়স: ৩৩, গৃহিণী, পশ্চিম ঋষিপাড়া।

কল্পনা রানি, বয়স: ৩৫, গৃহিণী, পশ্চিম ঋষিপাড়া।

৯৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আনন্দময় সুর, পূর্বোক্ত।

৯৭. দলগত সাক্ষাৎকার- সাগরিকা সুর, বয়স: ৫১, গৃহিণী, শাঁখারী বাজার।

সানন্দা সুর ঝিলিক, বয়স: ২৬, ছাত্রী, শাঁখারী বাজার।

সুধারানী সুর, পূর্বোক্ত।

৯৮. জেমস ওয়াইজ, তৃতীয় খন্ড, পৃ: ১৮৮।

৯৯. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সামসুদ্দিন, বয়স: ৮২, ব্যবসায়ী, নাজিরা বাজার।

১০০. জেমস ওয়াইজ, প্রথম খন্ড, পৃ: ৯৮।

১০১. ঐ, তৃতীয় খন্ড, পৃ: ৯১।

Dhaka University Institutional Repository

১০২. ঐ, পৃ: ১৬২।

১০৩. ঐ, পৃ: ১০২।

১০৪. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আয়মননেছা, আরফাননেসা, সেলিমা রহমান, পূর্বোক্ত।

১০৫. মোমেন চৌধুরী, পৃ: ১৪৮, ২০০।

১০৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- রুমা দাস, পূর্বোক্ত।

১০৭. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- তোরনী ঘোষ, পূর্বোক্ত।

১০৮. মোমেন চৌধুরী, পৃ: ২০৪।

১০৯. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সুধারানী সুর, পূর্বোক্ত।

১১০. দলগত সাক্ষাৎকার- শিলা সাহা, বয়সঃ ৫৩, গৃহিণী, বালুরঘাট।

সম্পা সাহা, বয়সঃ ৩৭, গৃহিণী, বালুরঘাট।

তৃপ্তি সাহা, বয়সঃ৩৭, গৃহিণী, বালুরঘাট।

১১১. দলগত সাক্ষাৎকার- জরিনা বিবি, বয়সঃ ১০০, গৃহিণী, হাজারীবাগ।

সাকিয়া জামাল, পূর্বোক্ত।

১১২. দলগত সাক্ষাৎকার- বিবি আয়শা, বয়সঃ ৯০, গৃহিণী, রহমতগঞ্জ।

১১৩. মোমেন চৌধুরী, পৃ: ২০৪, ২০৫।

১১৪. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আনন্দময় সুর, পূর্বোক্ত।

১১৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আরফাননেসা, পূর্বোক্ত।

১১৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- তহুরা খানম, বয়সঃ ৬৬, গৃহিণী, সাতরোজা।

আনার বেগম, আহম্মেদি আক্তার, পূর্বোক্ত।

১১৭. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- ফাতেমা বেগম, বয়সঃ ৫৭, গৃহিণী, বেগমবাজার।

দোলারি, বয়সঃ ৮০, গৃহিণী, চুড়িহাট্টা।

১১৮. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আরফাননেসা, পূর্বোক্ত।

১১৯. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫৩।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আয়মননেছা, পূর্বোক্ত।

১২০. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আলতাফ হোসেন, বয়সঃ৫৮, ব্যবসায়ী, আমলিগোলা।

Dhaka University Institutional Repository

১২১. ফিরোজা ইয়াসমিন সম্পাদিত, (২০১০), *ঢাকাই উপভাষা প্রবাদ-প্রবচন কৌতুক ছড়া*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, নিমতলী, ঢাকা, পৃ:৮৬।

১২২. দলগত সাক্ষাৎকার- আরফান নেসা, সাকিয়া জামাল, পূর্বোক্ত।

১২৩. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আয়মন নেছা, পূর্বোক্ত।

১২৪. দলগত সাক্ষাৎকার- কৃষ্ণ সুর, বয়স: ৫৫, কারিগর, শাঁখারী বাজার।

সাগরিকা সুর, আনন্দময় সুর, পূর্বোক্ত।

১২৫. কুলিয়া হল খানিকটা কাঁচাবুট, একখিলি পান, একটি সুপারি, একটি সবরিকলা ও একটি গোলগোলা রক্ষিত আইপান-সিঁদুর চর্চিত মাটির হাঁড়ি।

১২৬. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,* (২০০২), সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, পৃ: ৪০৬।

১২৭. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আরফান নেসা, আয়মন নেছা পূর্বোক্ত।

১২৮. গাজী রুমানা রহমান ও সোনিয়া বেগম, (২০১০), '*ঢাকার সামাজিক উৎসবের খাবার,*' অন্তর্ভূক্ত: *ঢাকাই খাবার,* হাবিবাখাতুন ও হাফিজা খাতুন সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, নিমতলী, ঢাকা, পৃ: ১৫০।

১২৯. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- মোসতারি বেগম, বয়স:৬১, গৃহিণী, তাঁতীবাজার।

১৩০. দলগত সাক্ষাৎকার- মালতি ঘোষ, কল্পনা ঘোষ, পূর্বোক্ত।

১৩১. মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, *নরসিংদি গাজীপুরের লোকঐতিহ্য বিবাহ ও মেয়েলী ছড়া-গীত,* পৃ: ৯৮।

১৩২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- নুরুন্নাহার বিবি,

১৩৩. দলগত সাক্ষাৎকার- রাশিদা বেগম, বয়স: , গৃহিণী, ইমামগঞ্জ।

রাহেমা বেগম, বয়স: , গৃহিণী, বেচারাম ডেউরি।

১৩৪. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সেলিমা রহমান, বয়স: ৬৫, গৃহিণী, উর্দুরোড।

১৩৫. দলগত সাক্ষাৎকার- সাবেরা বেগম, বয়স: , গৃহিণী, বংশাল।

মাহেলা বেগম, বয়স: , গৃহিণী, খাজে দেওয়ান।

১৩৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- বিবি মরিয়ম, বয়স: , গৃহিণী, চকবাজার।

১৩৭. দলগত সাক্ষাৎকার- সুধারানী, সাগরিকা সুর, আনন্দময় সুর, পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মৃত্যু

মৃত্যু মানবজীবনে অবধারিত। সৃষ্টির আদিকাল থেকে মৃত্যুর সাথে মানুষের পরিচয় আর এ কারণেই মৃতের আচার ও কৃষ্টি সংস্কৃতি প্রাচীনতম উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম। মৃত্যু সম্পর্কিত মানুষের চিন্তাধারণা, দর্শন সংক্রান্ত ব্যাখ্যাসমূহ কালের পরিক্রমায় ধর্মীয় চিন্তার বিবর্তনই শুধু ঘটায়নি, কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন ধর্মের প্রসারেও ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, একটি বিশেষ অঞ্চলে একাধিক ধর্মের মধ্যে পার্থক্যসূচক বিষয়াদি মৃতের সংস্কার, সৎকার ও আনুষাঙ্গিক অনুষ্ঠানাদির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় ধর্মের সংস্কার। আর তাই মৃতের সৎকার সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান শুধু ধর্মীয় দর্শনের স্বরূপই তৈরি করে না, সংস্কৃতির ইতিহাস ও প্রক্রিয়াকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। আলোচ্য গবেষনায় ঢাকার মৃতের সৎকার সম্পর্কিত আচার অনুষ্ঠানকে এবং সংস্কৃতির আন্ত:যোগাযোগ ও ক্রম বিবর্তনের ধারাকে সামনে তুলে ধরা হয়েছে। যেহেতু বিষয়টি আপাত দৃষ্টিতে ধর্মীয় তাই ধর্মীয় ভিন্নতাকেই তথ্য সংগ্রহ ও সংকলনের মূল নিয়ামক হিসেবে অনুসরন করা হয়েছে।

ক. মুসলমান সম্প্রদায়ঃ

মুসলমানদের মাঝে মৃতের ধারণাসমূহ মধ্য এশিয়ার মুসলিম সম্প্রদায়ের মৃতের সৎকারের মৌলিক বিষয়াদি সমূহ অনুসরণ করলেও বাংলায় তা দেশীয় ধারায় ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। বাংলার প্রধান অঞ্চল ঢাকা এ সংস্কৃতির বলয়ের বাইরে যায়নি। মুসলিম সমাজে সামাজিকভাবে কিছু মৃত্যুলক্ষণকে বিশ্বাস করা হয়। লক্ষণগুলি নিম্নরূপঃ

১.বাড়িতে লাল পিঁপড়া এক লাইন বেঁধে গেলে শিঘ্রই পরিবারের কেউ মারা যাবে বলে মনে করা হয়। পক্ষান্তরে, কালো পিঁপড়া লাইন করে গেলে পরিবারের সদস্যদের কারো বিয়ে আসন্ন বলে ধরা হয়।

২.ভোরবেলায় ঘরের চালে বা ছাদে কাকের আসর (সমাগম) বসলে শীঘ্রই পরিজনের কারো মৃত্যু ঘটার আশংকা দেখা দেয়। অন্যদিকে, বিকেল বেলায় কাকের আসর বসলে অতিশীঘ্র পরিজনের কারো বিয়ের ইঙ্গিত বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.স্বপ্নযোগে মাটি খুড়লে, পোলাও খেলে ও নতুন ঘর নির্মাণ করা দেখলে পরিজনের কারো মৃত্যু ঘটার দু:সংবাদ দেয়। পাশাপাশি স্বপ্নে মাড়ির দাঁত পরতে দেখলে পরিবারের কোন মুরুব্বীর মারা যাওয়ার লক্ষণ বোঝায়।

অসুস্থ ব্যক্তিকে তার পরিজনেরা দোয়া কালাম পড়িয়ে পাক পবিত্র রাখার চেষ্টা করে। পুরোনো ঢাকার মুসলমানদের মাঝে মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে দিয়ে তাওবা পড়ানোর রীতি প্রচলিত আছে। তওবা পড়ানোর ফলে মুমূর্ষু ব্যক্তির অবস্থা দুইটি বিশেষ পরিণতির দিকে ধাবিত হয় বলে লোকজ বিশ্বাস রয়েছে। একটি আরোগ্য লাভ অপরটি মৃত্যুবরণ। আনুষ্ঠানিক তওবা সম্পন্নের ফলে মুমূর্ষ ব্যক্তির গুনাহ্ মাফ হয়ে যায় বলে বিশ্বাস প্রচলিত।[১] আর এ তওবা পড়ান মসজিদের মৌলভী, মাওলানা, কোরআনে হাফেজ অথবা পরহেজগার কোন ব্যক্তি। তওবা পড়ানোর আগে মুমূর্ষু মৃত্যুপথযাত্রীর ঘরদোর ও কাপড়চোপর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা, সেই সাথে তার গায়ে আতর ও অন্যান্য সুগন্ধি মাখা এমনকি ঘরময় গোলাপজলও ছিটানো হয়। বসার মত অবস্থা থাকলে মৌলভী সাহেবের মুখোমুখি বসিয়ে, নয়তো তাকে বিছানায় শুয়েই তওবা পড়ানো হয়ে থাকে। সেই সময় একটি রুমালের একপ্রান্ত মৌলভীসাহেব আর অন্যপ্রান্ত মৃত্যুপীড়িত ব্যক্তির ধরা থাকে। প্রথমে তিনবার ইস্তিগ্ফার, একবার সূরা ফাতিহা, তিনবার সূরা ইখলাস পড়ানো হয়। এরপর চার কলেমার পর দরূদ শরীফ পড়িয়ে মৌলভী সাহেব মোনাজাত করেন।[২] মৌলভী সাহেবের সাথে উপস্থিত সবাই মোনাজাত ধরে মুমূর্ষু ব্যক্তির মুক্তি ও মাগফেরাতের জন্য প্রার্থনা করে। মোনাজাত শেষে সবার মাঝে বিতরণ করা হয় জিলাপি অথবা অন্যকোন মিষ্টান্ন। আরোগ্য লাভ অথবা মৃত্যু পীড়াজনিত কষ্ট থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে অনেকেই ইয়াসিন সুরা পড়ে মুমূর্ষুর জন্য দোয়া করতে থাকে, সেই সাথে সায়াকুল, আহাদনামা, কলেমা দরূদতো আছেই। এছাড়াও আয়তাল কুরসী সুরা পড়ে মুমূর্ষু ব্যক্তির শরীরে ফুঁ দেয়া হয়।

মৃত্যুর প্রাক্কালে মুমূর্ষু ব্যক্তির মাঝে কিছু আলামত পরিলক্ষিত হয়। এই লক্ষণগুলি দেখে ধরে নেয়া হয় মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃতাসন্ন। উল্লেখযোগ্য লক্ষণগুলির মধ্যে মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রস্রাবে ফেনা ওঠা, পায়ের শিথিলতা, কানের লতি ঝুলে যাওয়া, নাকের পাত্তি (ডগা) বেঁকে যাওয়া, শরীরে 'মরণঠোসা' বা 'আগকা ঠোয়া' পরা, 'জনম পায়খানা'[৩] করা, শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়া। উপস্থিত পরিজনরা প্রত্যেকেই মৃতাসন্ন ব্যক্তির মুখে এক চামচ পানি দিয়ে থাকে। পুরোনো ঢাকার কোথাও কোথাও অনুপস্থিত পরিজনদের নামে মুমূর্ষুর

Dhaka University Institutional Repository

মুখে পানি দেয়ার কথা জানা যায়।[৪] মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর ব্যক্তিকে ডানদিকে ফিরিয়ে 'উত্তর শিরানা' অর্থাৎ উত্তরে মাথা আর দক্ষিণে পা দিয়ে শোয়ানো হয়।[৫] এতে তার মুখমন্ডলটি কিবলা বরাবর থাকে। মৃতাসন্ন ব্যক্তি যেন ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করতে পারে সেজন্য উপস্থিত ব্যক্তিরা তার পাশে বসে কলেমা পড়তে থাকে। 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্'র তালকীন করার কথা হাদিসে বর্ণিত আছে। রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন- 'তোমরা তোমাদের মৃত্যু সন্নিকট ব্যক্তিকে কলেমা স্মরণ করিয়ে দাও। মৃত্যুর সময় যার শেষ কথা হবে 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্' সে একদিন বেহেশতে প্রবেশ করবে।'[৬]

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে উপস্থিত পরিজনেরা লাশের সুরতহাল পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মৃতের দুই পা সোজা ও একত্র করে বৃদ্ধাঙ্গুলি নরম ফিতা বা কাপড় দিয়ে বাঁধা হয়। লাশের শরীর থেকে পরিধেয় অলংকার, তাবিজ এবং সেলাইন-পাইপ ইত্যাদি খুলে ফেলা হয়। মৃত ব্যক্তি নারী হলে তার নাকে নাকফুল থাকলে অনেকে তা গোসল দেয়ার কালে সুতা দিয়ে টেনে খুলে ফেলে। মৃতের চোখ খোলা থাকলে চোখের পাতা নামিয়ে দেয়া হয়। মুখ হা করা থাকলে দুই হাতে চাপ দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয়। অনেক সময় এতে কাজ না হলে একটি গামছা দিয়ে মাথা ও চিবুকের চারদিক বেঁধে রাখা হয় কিছুক্ষণ। নাক ও কানের ফুটোগুলোতে তুলা গুঁজে দেয়া হয়। মৃতের ফুসফুস তখন কাজ করে না বলে এসব ফুটো দিয়ে পেটে বাতাস ঢুকে পেট ফেঁপে ওঠে। অনেকেই পেটের উপর ভারী বস্তু রাখে যাতে করে পেট ফেঁপে না উঠে। একটি চাঁদর দিয়ে মৃতের আপাদমস্তক ঢেকে দেয়া হয়। সুগন্ধীধোয়া জীবানুনাশক বলে লাশের পাশে অনেকেই আগরবাতি জ্বালায়।

'চায়া মরা' (মৃত্যুবরণের পরেও চোখের পাতা খোলা থাকা) কিংবা 'হা হয়য়া মরা' কে পুরোনো ঢাকার আদিবাসীরা মৃতের পরিবারের জন্য অশুভ মনে করে। তারা বিশ্বাস করে যে, এইরূপ মৃত্যুতে মৃতের পরিজনদের তিনজনের মৃত্যুর আশংকা থাকে। সেইসাথে প্রথম বছর মৃতের পরিবারে 'ল্যাটপেটি ছাড়ে না' অর্থাৎ রোগ-ব্যাধিসহ নানাবিধ বিপদাপদ আসতে থাকে।[৭] রবিবার এবং বুধবার পরিজনের মৃত্যুও তাদের কাছে অমঙ্গলজনক। উল্লেখিত দিনগুলোতে বাড়ির মুরুব্বীর মৃত্যু ঘটলে, পরিজনেরা 'কানাভূত' বিষয়ে সতর্ক থাকে। তাদের প্রচলিত ধারনা ও বিশ্বাস মতে, মৃতের পরিবারের অন্য যে কোন তিনজনকে কানাভূত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে। আবার পুরোনো ঢাকার বিশেষ কিছু এলাকার প্রচলিত বিশ্বাস মতে, প্রত্যেক মাসে একটি বিশেষ বুধবার রয়েছে। এই বুধবারটি নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

ঐদিন কেউ মারা গেলে 'কানাভূত' সেই পরিবারের দুইজনকে নিজের কাছে টানার চেষ্টা করে।[৮] কানাভূতের কারণে দুই বা তিন জনের মৃত্যুর সম্ভাবনা ঠেকাতে দই ও মুরগি দান করার নিয়ম রয়েছে। এমনও প্রচলিত আছে যে, কানাভূত এর ছায়া থেকে আগেই নিরাপদ থাকার উদ্দেশ্যে একটি মুরগি মসজিদে দান করার পূর্বে মৃতের খাটিয়ার চারপাশ ঘুরিয়ে নেয়া হয়। আবার কেউ কেউ মৃতের দাফনের পর কবরস্থান থেকে প্রত্যাবর্তনকালে কবরের উপরে মুরগি ছেড়ে দিয়ে আসে। পাশাপাশি মশুরির ডাল কবরের উপর ছিটিয়ে দিয়ে তাদের নিয়ম পালন করে। অনেকেই দই-এর হাড়ি মিসকিনকে দান করে দেয়, আবার পুরোনো ঢাকার কোন কোন স্থানে দই-এর হাড়ি ভেঙ্গে ফেলার কথাও শোনা যায়। এই নিয়ম পালনের ক্ষেত্রেও বৈচিত্রতা লক্ষণীয়। গোসলের পর লাশের শিয়রের সামনে অথবা কবরস্থ মৃতের শিয়রের কাছে দই-এর হাড়ি ভাঙ্গা হয়। অনেকে আবার মৃতের খাটের বিছানাপত্র তুলে এর মধ্যে দই-এর হাড়ি ভাঙ্গে। আবার পুরোনো ঢাকার অন্যত্র দই-এর হাড়ি তিন রাস্তার মোড়ে ভেঙ্গে ফেলার রীতি রয়েছে। সেই সাথে একটি কালো রঙের মুরগি সেখানে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে আর পিছন ফিরে তাকানো রীতি বিরুদ্ধ।

আগে কারো মৃত্যু হলে পঞ্চায়েত সর্দার গুরিদের মারফত খবর পাঠাতেন মহল্লার সবাইকে।[৯] গুরিদ নিজ মহল্লা ছাড়াও অন্য মহল্লায় বসবাসকারী মৃতের আত্মীয়দের সেই মহল্লার গুরিদের মাধ্যমে মৃত্যুর সংবাদ পৌছে দিত। সেইসাথে মৃত ব্যক্তির জানাযা, দাফন ইত্যাদি বিষয়াদি সম্পর্কেও সবাইকে অবহিত করত।[১০] বিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে মৃত্যুর সংবাদ মসজিদের মাইকে প্রচারের প্রচলন শুরু হয়েছে। মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণের পর 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়া হয়ে থাকে। পুরোনো ঢাকার মুসলমানদের প্রথানুযায়ী, মৃতের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনরা সাথে করে নিমশুকা রুটি আর মিষ্টি নিয়ে আসে। এটি তাদের কাছে 'হাজেরি নাস্তা' নামে পরিচিত। মৃতের বাড়িতে সবাইকে একটু হলেও হাজেরি রুটি-মিষ্টি খাওয়ার নিয়ম রয়েছে। হাজেরি নাস্তা রাতের আগেই খেয়ে শেষ করার রীতি। অনেকে দিনের আলো থাকতেই ঘরে পরে থাকা রুটির গুড়া ঝাড়ু দিয়ে সাফ করে ফেলে।[১১] অতীতে অবশ্য হাজেরি রুটি-মিষ্টির প্রচলন ছিল না। তখন মৃতের আত্মীয়-স্বজনরা আনত চিরা, বাতাসা আর নিমপাতা। লাশ বিদায়ের পর বাড়ির সবাই গোসল করে প্রথমে দাঁত দিয়ে নিমপাতা ছিড়ত। এরপর চিরা-বাতাসা খেত।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

মৃতের বাড়ির ও পাড়াপড়শী মহিলারা দলবদ্ধভাবে কোরআন খতম দেয়। সেইসাথে নানাবিধ দোয়া-দরূদও পড়ে থাকে। আহাদনামা পড়া হয় লাশ বাড়িতে থাকাকালীন সময়ে। প্রচলিত বিশ্বাস, আহাদনামা পড়লে মৃত ব্যক্তির সমস্ত গুনাহ্ আল্লাহ্তালা মাফ করে দেন এবং মৃতের লাশ হাওয়ার বেগে দ্রুত কবরস্থানে পৌছে যায়।[১৩] মুসলমানদের মধ্যে লাশ বাড়ি থেকে না উঠানো পর্যন্ত চাল, ডাল আর ভাংতি পয়সা একসাথে মিশিয়ে ফকির-মিসকিনদের মাঝে বিতরণের রেওয়াজ রয়েছে। জানা যায় অতীতে ধনীদের মধ্যে কেউ কেউ চেহলামের দিন পর্যন্ত এই কর্মসূচী চালু রাখত।[১৪] লোকমতে, ভাংতি পয়সা মৃতের রাস্তা খরচ আর চাল-ডাল মৃত ব্যক্তির দুনিয়া থেকে রিজিক উঠে যাবার সাদকা।[১৫] যাদের সন্তান বাঁচে না অথবা ঘরে অসুস্থ্য সন্তান রয়েছে, তারা এই চাল-ডাল চেয়ে নিয়ে তাদের সেই অসুস্থ্য সন্তানদের রান্না করে খাওয়ায়। তাদের বিশ্বাস এতে তাদের সন্তানদের আয়ু বৃদ্ধি পায়। অনেকে আবার অসুস্থ্য সন্তানদের আয়ু বৃদ্ধির জন্য হাজেরি নাস্তার রুটি-মিষ্টিও চেয়ে নেয়।[১৬] পুরোনো ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় লাশ ঘরে থাকা অবস্থায় ডাল-ভাত রান্না করে রাখার প্রথা রয়েছে। সেইসাথে বিভিন্ন পাত্র ভর্তি পানি সংরক্ষণ করা হয়। লোকবিশ্বাস, এর ফলে মৃতের সংসার 'ভরা' (স্বয়ংসম্পূর্ণ) থাকে। মৃত ব্যক্তির অবর্তমানে তার সংসারে অভাব-অনটন আসে না।[১৭] আগে পুরোনো ঢাকার কোথাও কোথাও মাইয়্যেতের গোসল-জানাযা সম্পন্ন হবার পূর্বেই ঘরে রক্ষিত কলস, ড্রাম ও জগের পানি ফেলে দিয়ে পুনরায় পানি ভরার রীতি ছিল। এর পিছনে একটি লোকজ বিশ্বাস কাজ করে বলে ধারণা আছে। এ বিশ্বাস অনুযায়ী, জনৈক ব্যক্তি আলসেমি করে পানি পান না করেই ঘুমিয়ে পরলে তখন তার তৃষ্ণার্ত আত্মা পানি পান করতে সাময়িকভাবে দেহত্যাগ করে। বাড়িতে একটি ঢাকনাবিহীন পানির কলস দেখতে পেয়ে তৃষ্ণার্ত আত্মাটি সেই কলসের ভেতর প্রবেশ করে। বাড়ির কেউ একজন সেসময় কলসের মুখ খোলা দেখে একটি ঢাকনা দিয়ে সেটি বন্ধ করে দেয়। এতে করে আত্মাটি কলসের ভেতর আটকা পরে যায়। পরদিন সকালে বাড়ির সবাই সেই ব্যক্তিকে মৃত ভেবে যথারীতি তার গোসল-কাফন সম্পন্ন করে। তাকে খাটিয়াতে করে জানাযা পড়তে মসজিদে নিয়ে যায়। ঐসময় বাড়ির অন্য কেউ একজন পানি পান করার উদ্দেশ্যে ঢাকনা খুললে কলসের ভেতর আটকে থাকা আত্মাটি বের হয়ে আসে এবং পুনরায় দেহে প্রতিস্থাপিত হয়। ফলে সবাই বিস্ময়ে বিহবল হয়ে পরে। কিছুদিন পর সেই বাড়ির অন্য একজনকে জিনে ভর করলে. জিনে ধরা ব্যক্তির কাছে উক্ত বিস্ময়কর ঘটনাটি জানতে চাইলে সে ঘটনাটির পূর্ণ বর্ননা করে। সেদিন থেকে পরিবারের কারো মৃত্যু ঘটলে ঘরের জমাকৃত পাত্রের পানি ফেলে দিয়ে পুনরায় তা পানি ভরার এবং নিদ্রা যাওয়ার সময় পিপাসার্ত থাকলে অবশ্যই পানি পান করে ঘুমাতে যাওয়ার প্রথা প্রচলন হয়।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো ফরযে কিফায়া অর্থাৎ বাধ্যতামূলক।[১৯] পুরুষের গোসল পুরুষ ব্যক্তি আর মহিলার গোসল মহিলা ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদন করা হয়। একই লিঙ্গের কাউকে পাওয়া না গেলে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করানোর নিয়ম আছে। বাচ্চাদের গোসল যে কেউ দিতে পারে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের গোসল করাতে পারবে।[২০] স্থানীয়দের মধ্য থেকে যারা মাইয়্যেতের গোসল দেয়, তারা পুরোনো ঢাকার মুসলমানদের কাছে নালানয়ালা বা গোসলয়ালা এবং নালানয়ালি বা গোসলয়ালি নামে পরিচিত। এদের অধিকাংশই আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল। লাশ ধোয়ানোকে তারা বংশানুক্রমিক পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। মাইয়্যেতের গোসল সম্পন্নের পর মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে তাদেরকে কিছু টাকা-পয়সা, মাইয়্যেতের পরিধেয় বস্ত্র ও গোসলে ব্যবহৃত চাদর দেয়া হয়। অনেকে তাদেরকে ডেকে তিনদিন অথবা চল্লিশদিনের জিয়াফত খাওয়ায়। অতীতে ঢাকার মহিলারা কানের পাশে "মুরখী কান"ও ফুটো করত। কেননা তাদের ধারণা মতে, মুরখী-কানের ফুটো রোজ কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্‌র কাছে তার স্বাক্ষী দিবে। ফলে নেকি লাভের আশায় মাইয়্যেতের মুরখী কানের দুল অনেকেই নালানয়ালিকে দান করত।[২১] ইদানিং কিছু প্রশিক্ষিত নারী-পুরুষ সাওয়াবের নিয়তে এবং কোরআন-হাদিসের নির্দেশ অনুসারে মৃতের গোসল প্রদান করে থাকে।

আগে মাইয়্যেতের গোসলের পানি রান্না ঘরের চুলায় গরম করার রীতি ছিল না। মৃতের বাড়ির উঠোনে ইটের অস্থায়ী চুলা বানিয়ে নেয়া হত। সেই চুলায় মৃতের গোসলের পানি গরম করা হত পাটখড়ির আগুনে।[২২] মৃত ব্যক্তিকে কুলপাতা সিক্ত পানি দিয়ে তিনবার বা পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে আরো অধিক বার বেজোড় সংখ্যায় গোসল করানোর নির্দেশ হাদিসে দেয়া আছে।[২৩] পুরোনো ঢাকার মুসলমানরা মাইয়্যেতের গোসলের পানিতে সাতটি কুলপাতা ও সাতটি আনারপাতা মিশায়। মৃত ব্যক্তিকে বিছানা থেকে চাঁদরে তুলে ধরে গোসলের খাটিয়ায় শোয়ানো হয়। মৃত মহিলার লাশ তাদের মাহ্‌রাম পুরুষরা ধরে থাকে। ঘরের বাইরে মৃতকে গোসল দেয়ার সময় স্থানটিকে পর্দা দিয়ে আড়াল দেওয়া হয়। ঘরের ভেতর মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখা হয়। লাশের উপর শাড়ি/চাঁদর দিয়ে মৃতের সতর ঢেকে পরিধেয় বস্ত্র খুলে ফেলা হয়। মহিলাদের সতর হল বগল থেকে হাঁটু এবং পুরুষদের নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। গোসলদানকারী লাশ ধোয়ানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করে, যাতে মুর্দা কষ্ট না পায় এবং তার সতর অনাবৃত না হয়ে পরে। মৃত ব্যক্তির চোখ খোলা থাকলে চোখের

Dhaka University Institutional Repository

পাতা নামিয়ে এর উপর একটু গরম পানি ঢালা হয়, এতে করে চোখ বন্ধ থাকে।[২৪] মৃতের গোসল ডান দিক থেকে আরম্ভ করার নিয়ম।[২৫] সর্বাগ্রে ওজুর নিয়মের অঙ্গসমুহ ধৌত করা হয়। স্থানীয় গোসলকারী ওজু করানোর সময় একটি কাঠি দিয়ে মৃতের দাঁত খেলাল করে থাকে। কুলপাতা ও আনারপাতা মিশ্রিত কুসুম গরম পানি দিয়ে এক গোসল সম্পন্নের পর মাইয়্যেতকে বসিয়ে তিনটি সেজদা দেওয়ানো হয়।[২৬] এরপর সাবান দিয়ে মাথা ধৌত করে তিনবার। লাশের শরীরে সাবান মেখে আরো দুই-তিন গোসল দেয়া হয়। কাঠি দিয়ে মৃতের হাত পায়ের নখের ময়লা পরিষ্কার করা হয়ে থাকে। শেষে কর্পূর মিশ্রিত পানি দিয়ে পাক গোসলে গরম পানি ব্যবহার করা হয় না। মৃতের গোসল দেয়ার পূর্বে গোসলকারী নিজে ওজু করে নেয়। হায়েয নেফাস চলাকালীন সময়ে লাশ ধোয়ানো নিষিদ্ধ। যে সকল সুরা-কালাম গোসলকারীর মুখস্থ আছে সাধারণত সে সমস্ত সুরা-কালামই লাশ ধোয়ানোর সময় পাঠ করে থাকে। গোসল শেষে নরম কাপড় দিয়ে আস্তে আস্তে মুর্দার সমস্ত শরীর মুছে ফেলা হয়। এরপর মাইয়্যেতকে লাশ বহনকারী খাটিয়াতে তুলে নিয়ে কাফন পরিধান করানো হয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরানো ওয়াজিব। কাফন মৃত ব্যক্তির মাল বা সম্পদ থেকে কিনতে হয়[২৭] অথবা মৃতের জীবনে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যার উপর ছিল, তাকেই কাফন কিনতে হয়।[২৮] সাধারনত কাফন হিসেবে ব্যবহৃত হয় সাদা সুতি কাপড়। কাফনে মেয়েদের পাঁচটি আর পুরুষদের তিনটি কাপড় হওয়াই সুন্নাত।[২৯] মহিলাদের কাফনের পাঁচটি কাপড়ের মধ্যে সেলাইবিহীন কোর্তা, ইযার, চাদর, সীনাবন্দ ও ছেরবন্দ উল্লেখযোগ্য। গলা থেকে পা পর্যন্ত কোর্তায় কল্লী বা আস্তিন থাকে না। ইজার মাথা থেকে পা পর্যন্ত। চাদর এর থেকে এক হাত লম্বা। বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা সীনাবন্দের চওরা এমন হবে যেন লাশের পুরো শরীর পেঁচানো যায়। ছেরবন্দ বারো গিরা চওড়ার এক গজের একটি কাপড়। আড়াআড়ি দুই ভাজ করে মাথা ঢাকা হয়, তা বাঁধা বা পেঁচানো যাবে না। অপরপক্ষে, মহিলাদের কাফনের প্রথম তিনটির অনুরূপই পুরুষদের কাফন। গর্ভপাত অথবা মৃত ভূমিষ্ঠ শিশুকে পবিত্র কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করা হয়ে থাকে। মুর্দার কাফনের কাপড় প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি হলে তাকে দানশীল, নেক ও উৎকৃষ্ট আমলনামার অধিকারি বলে মনে করা হয়। পক্ষান্তরে কাফনের কাপড় কম হওয়া মন্দ আমলনামার লক্ষণ। তাছাড়া মৃত্যুর পর লাশের 'বান ছাড়লে' অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়েছে মনে হলে অথবা মাইয়্যেতের চেহারার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পেলে ধরে নেয়া হয় তার আমলনামা ভাল। সে নেককার ব্যক্তি।[৩০] গোসলকারী মৃত নারীর চুল দুইভাগ করে। এরপর মৃতের বক্ষ চুল দিয়ে ঢেকে দেয়। শরীরের যেসকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেমন- কপাল, নাক, হাতের তালু, হাঁটু ও পায়ের পাতা সেজদারত অবস্থায় মাটিতে স্পর্শ করে, সেই স্থানগুলিতে কর্পূর

Dhaka University Institutional Repository

লাগানো হয়। কাফনের কাপড়ে আতর মাখে। লাশের উপর গোলাপজল ছিটায়। চোখে সুরমা পরায়। মহিলাদের কপালে সুরমা দিয়ে আলিফ চিহ্ন অংকন করা হয়। কাফনের কাপড়ে সুরমা দিয়ে আহাদনামা লিখে দেয় অনেকেই। কেউ কেউ আবার আহাদনামা লেখা কাগজ মৃতের বুকে স্থাপন করে থাকে। এতে করে কবরের আযাব মাফ হয়ে যায় বলে বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। আগে যারা নুরনামা পড়তে পারত তাদের লাশের সাথে নুরনামার একটি পৃষ্ঠা ছিড়ে দিয়ে দেয়া হত।[৩১] পরিণত বয়সে পরে যাওয়া দাঁত যত্ন সহকারে তুলে রাখা হত। মৃত্যুর পর ঐ দাঁতগুলি কাফনের কাপড়ের সাথে দিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। যেন মৃতকে তার সকল দাঁত খুজে পেতে কোন রকম অসুবিধা না হয়, সেজন্যই এই ব্যবস্থা। কেউ কেউ অবশ্য এমনটি করে থাকে যাতে করে মৃত ব্যক্তি তার সমস্ত অংগ সহযোগে কবরে যেতে পারে।[৩২] মৃতের গোসল ও কাফন পরানো সম্পন্ন হলে তিনবার সূরা ইখলাস আর একবার সূরা ফাতিহা পড়ে মৃতের মাগফিরাতের জন্য প্রার্থনা করা হয়। অনেকেই আহাদনামা, সূরা ইয়াসিন, সূরা ইখলাস, সূরা রাহমান ও আয়তাল কুরসি পড়ে মৃতের বুকে ফুঁ দিয়ে দেয়। মৃতের যমজ ছেলে সন্তান থাকলে লাশ বাড়ি থেকে বের হবার আগেই যমজ দুই ভায়ের হাত একত্রে কিছুক্ষণ বেঁধে রাখার প্রথা পুরোনো ঢাকার কোথাও কোথাও দেখা যায়। এটা পালন করলে 'ফারা কাটে' অর্থাৎ সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।[৩৩] লাশ বিদায়ের প্রাক্কালে কেউ একজন উপস্থিত সবার কাছে মৃতের পক্ষে মাফ চায়। একই সাথে মৃতের পরিজনরাও খাটিয়ার সামনে দাড়িয়ে মৃত ব্যক্তির কাছে মাফ চেয়ে নেয়। সন্তানেরা মায়ের লাশের কাছে দুধের মাফ চেয়ে বলে- 'মা আমরা তোমার দুধ খাইছি। তুমি আমগো কষ্ট কইর‍্যা লালন-পালন করছ। তুমি মাফ কইর‍্যা দিও। আল্লাহ্ তুমিও আমার মায়রে মাফ কইর‍্যা দিও।'[৩৪] স্বামী মারা গেলে বাড়ির পুরুষ অভিভাবক (ছেলে, ভাসুর, দেবর, মেয়ের জামাই) নামমাত্র টাকা স্ত্রীর হাতে দিয়ে স্বামীর অপরিশোধকৃত কাবিনের টাকা মাফ করিয়ে নেয়। স্ত্রীও মৃত স্বামীর নিকট মাফ চেয়ে থাকে।

কলেমা লেখাযুক্ত কালো অথবা সবুজ চাদরে মৃতের খাটিয়া ঢেকে জানাযার উদ্দেশ্যে মসজিদে দিয়ে যাওয়া হয়। মৃত মহিলাদের শারীরিক গঠন যাতে স্পষ্ট না হয়ে উঠে সেজন্য তার খাটিয়ার উপর তিনটি লোহার শিক অথবা বেত দিয়ে স্থাপন করা হয় চাদর।

জানাযার নামাজ ফরযে কিফায়া।[৩৫] জানাযার নামাজে আত্মীয়-স্বজনসহ এলাকাবাসী সমবেত হয়ে আল্লাহ্ তা'আল্লার দরবারে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করে থাকে। নারীদেরকে জানাযায় শরীক হতে নিষেধ

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে তবে নিষেধ কঠোর করা হয়নি।[৩৬] পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মহিলাগন জানাযার নামাজ পড়লেও ঢাকায় মহিলাদের জানাযার নামাজ পড়ার প্রচলন নেই। নামাজে জানাযা সাধারণত মহল্লার মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার নামাজ পড়ার জন্য অনূন্য তিন কাতার করা সুন্নাত।[৩৭] পুরোনো ঢাকার মুসলমানদের মতে, জানাযায় অধিক সংখ্যক লোক সমবেত হওয়া মৃত ব্যক্তি নেককার হওয়ার লক্ষণ। মৃতকে কিব্‌লার দিকে সম্মুখে রেখে তার বক্ষ বরাবর ইমাম দাঁড়ান। সকলেই ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে জানাযার নামাজ পড়ে। জানাযার নামাজে রুকু ও সিজদা নেই এবং এতে কথা-বার্তাও বলা যায় না। দাঁড়ানো অবস্থায় চার তাকবীরে নামাজ আদায় করার নিয়ম। জন্মের পর যদি চিৎকার করে কোন শিশু কেঁদে থাকে, তবে তার নামাজে জানাযা পড়াতে হবে। কিন্তু যে শিশু চিৎকার করে কাঁদবে না, তার নামাযে জানাযা আদায় করা হবে না।[৩৮] জানাযা শেষে চার জন ব্যক্তি লাশের খাটিয়ার পায়া কাঁধে ভর করে নিয়ে কবরস্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে কাঁধ বদল হতে থাকে। জানাযার অনুগমনকারীরাও কিছু দূর পর পর খাটিয়ার পায়া কাঁধে তুলে নেয়। এই সময় সবাই উচ্চস্বরে কলেমা পাঠ করতে থাকে।

উনিশ শতকে ঢাকায় মুসলমান সর্বসাধারণের দাফনের জন্য সরকারি কবরস্থানের অভাব ছিল। ভূমি মালিকের উচ্চ ফী ধার্যের কারণে বেসরকারি কবরস্থানে পরিজনের লাশ দাফন করা ছিল মুসলমানদের অনেকের সাধ্যের বাইরে। তারা আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর পর যে কোন খালি জায়গায় এমনকি তাদের বাড়ির সীমানার মধ্যেও মৃতদেহ কবর দিত। ১৮৪২ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই আগা সাদেক ময়দানে ঢাকার সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্ট সরকারি কবরস্থানটি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেয়া হয়।[৩৯] তবে শহরের মুসলমান অধিবাসীরা পুরোনো রীতিতেই মৃতদেহ সমাধিস্থ করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে উনিশ শতকের ষাট দশকে ঢাকা প্রকাশে জনৈক ব্যক্তি লিখেছেন- 'ঢাকায় যেসকল ইতর মুসলমান বাস করে, তাহাদিগের শব সমাহিত করিবার কোন বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট নাই। লোক গমনাগনের পথের পার্শ্বে যে সকল স্থান ছাড়া পড়িয়া থাকে অনেকেই সেই সকল স্থানে, অনেকে নিজ নিজ বাড়িতে মৃত শরীর নিখাত করিয়া রাখে। জনাকীর্ণ তাঁতি বাজার ও বংশালের সন্নিহিত নূতন সড়কের পূর্ব্ব পার্শ্বে এত শব নিধান হইয়াছে যে ঢাকায় তির্লাদ্ধশূন্য রয় নাই। তথাপি আমরা দুবেলাই প্রায় তথায় কবর দিতে দেখিতেছি। এই সকল শব কেবল নামে সমাহিত হইয়া থাকে। কৃষকরা শস্যবীজ যেমন মৃত্তিকার নিম্নস্থ করিয়া রাখে, শব সমাহিতারাও সেইরূপ মৃত্তিকা দ্বারা শরীরটা আচ্ছাদিত করিয়া আইসে বলিলেই হয়। শব নিহিত

Dhaka University Institutional Repository

করিবার জন্য যেরূপ গভীর কূপ খনন ও মৃদনাচ্ছাদ আবশ্যক, তাহারা তাহার কিছুই করে না। এক বা অর্ধ হস্ত প্রমাণ একটা গর্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে শবটা নিক্ষেপ করিয়া কতকটা মাটি দিয়া ঢাকিয়া আইসে।.... যাহা হউক, এনরূপ শব নিখাত হওয়াতে ... কুকুর প্রভৃতি মাংসাদ পশু সকল নখাকর্ষণে অনায়াসেই তাহা বাহির করিয়া ফেলে। তাহা হইতে দুর্গন্ধময় বাষ্প উত্থিত হইয়া বায়ু দূষিত করে।'[৪০]

ঢাকার সিভিল সার্জন জেমস টেলরের গ্রন্থে উনিশ শতকে ঢাকার মুসলমান অধিবাসীদের দাফন সংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর বর্ণনা অনুসারে- 'মুসলমান আদিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই শহরের অভ্যন্তরে, তাদের বাসগৃহের সন্নিকটে বা সংলগ্ন স্থানে মৃতদেহ কবরস্থ করে থাকে। কবরগুলো কদাচিত সাড়ে চার ফুট অপেক্ষা অধিক গভীর হয়। ফরায়েজীগণ সমাধির স্থান স্মরণীয় বা চিহ্নিত করে রাখার জন্য, কখনও মাটির উঁচু মঞ্চ তৈরি করে না এবং মৃতকে কবরস্থ করার কিছুকালের মধ্যেই তারা সাধারণত এসব কবরের উপর বাড়িঘরও তুলে ফেলে। তখনকার কিছু সংখ্যক মুসলমানদের গোরস্থান শহরের পশ্চিম দিকের জঙ্গলে অবস্থিত। এ স্থানের কবরগুলো প্রায় ছয় ফুট গভীর করে খনন করা হয়। দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে যারা কফিন বা শবাধারের খরচপাতি বহন করতে অক্ষম, তারা বাঁশের তৈরি কাঠামো শবের উপর আড়াআড়িভাবে রেখে দিয়ে মাটি চাপা দেয়। কিন্তু এই সতর্কতা অবলম্বন করা সর্ত্বেও শৃগাল ইত্যাদি মাঝে মাঝে শবদেহ কবর খুঁড়ে বের করে ফেলে।[৪১] তিনি আরো জানিয়েছেন- 'মুসলমানদের কয়েকটি শ্রেণী যেমনঃ রিফুগর ও অন্যান্য কিছু সমাজের অন্তর্ভুক্ত মৃতব্যক্তি জন্য উক্ত সমাজের সদস্যরাই কবর খনন করে এাঁ তাদের এমন একটি কর্তব্য যা' পালাক্রমে তাদের সকলকে পালন করতে হয়। অত্যন্ত গরীব ধরনের লোকেরা কদাচিৎ ফাতেহা পাঠ করে এবং যারা কোন বন্ধুবান্ধব না রেখে মারা যায়' তাদের জন্য ফাতেহা পড়ানো হয় না। ফারায়েজীগণ বিবাহ ও শেষকৃত্য সম্পর্কিত অনুষ্ঠানাদি বর্জন করে থাকেন। সুতরাং, এসকল পর্ব উপলক্ষে তাদের ব্যয়ের পরিমাণ সামান্য। কেবল দানস্বরূপ কিছু অর্থই বিতরণ করা হয়।'[৪২]

জেমস ওয়াইজ লিখেছেন- 'লালবেগিদের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে মুসলিম অনুষ্ঠানের কোনো মিল নেই। সম্ভবত: এরা কোনো প্রাচীন সংস্কৃতির উল্টরাধিকারী। মুসলমানদেও করবস্তানে তাদেও কবর হয় না। তারা কবর দেয় কোনো জঙ্গলের মত জায়গায়। পাঁচ টুকরা কাপড় দিয়ে জড়ানো হয় মৃতদেহ। দুই বাহুর নিচে রুমালের মত ছোট কাপড় রাকা হয় আর মরদেহকে ব্লাউজের মত একটি কাপড় পরিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়া হয়। কবরের চার পাশে চারটি আগর কাঠ জ্বালানো হয়। এর পরের আচার মুসলমানদেও মতই। মরার বাড়িতে চার দিন চুলা জ্বলে না। প্রতিবেশীরা খাবার দিয়ে যায় চার দিন। পঞ্চম দিনে একটি থালায় কিছু শুপারি কিছু ফুল মৃতের আবাস গৃহের সামনে রাখা হয়।'[৪৩]

ঢাকার মুসলমান সর্বসাধারণের দাফনের জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন কবরস্থান আছে পাঁচটি।[৪৪] এই পাঁচটি কবরস্থান আজিমপুর, জুরাইন, উত্তরা, বনানী ও মিরপুরে অবস্থিত।[৪৫] পুরোনো ঢাকায় অবস্থিত আজিমপুর ও জুরাইন কবরস্থান ছাড়াও বিভিন্ন মহল্লাতে রয়েছে আরো বেশ কিছু পঞ্চায়েতি ও পারিবারিক কবরস্থান। উল্লেখযোগ্য কবরস্থানগুলি হল হোসেনী দালানে নায়েব নাজিম ও শিয়াদের কবরস্থান, বেগম বাজার গলির ভেতর নবাববাড়ির পারিবারিক কবরস্থান, আজিমপুর দায়রা শরীফ কবরস্থান, শেখ সাহেব বাজারে কাদের সর্দারের পারিবারিক কবরস্থান, গেন্ডারিয়া সাধনা ঔষুধালয় এর নিকট পঞ্চায়েতি কবরস্থান, নয়াবাজার বাসষ্ট্যান্ডের কাছে পঞ্চায়েতি কবরস্থান। বংশালে অবস্থিত দুইটি কবরস্থানের মধ্যে একটি হল পঞ্চায়েতি আর অপরটি সাতবাড়ি খ্যাত পারিবারিক কবরস্থান।[৪৬] পুরোনো ঢাকার আদিবাসী মুসলমানরা মৃতের দাফনকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন আজিমপুর কবরস্থানকে অধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তাদের মতে আজিমপুর কবরস্থান হল 'আবাদী কবরস্থান'।[৪৭] এখানে প্রতিনিয়ত দাফনকার্য সংগঠনের ফলে বহু লোকের সমাগম ঘটছে। তারা নিজেদের মৃত আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সমস্ত কবরবাসীর জন্য দোয়া করে থাকে। এছাড়া এই কবরস্থানে কবরবাসী হয়েছেন অনেক পীর-আউলিয়া। তাদের মাঝে কবরস্থ হওয়াকে তারা উত্তম মনে করে। আজিমপুর কবরস্থানে দাফনকার্য চলে সকাল দশটা-এগারোটা থেকে রাত্র এগারোটা পর্যন্ত। মৃতের আত্মীয়-স্বজনরা পূর্বেই কবরস্থানে গিয়ে সেখানকার দায়িত্বে নিয়োজিত মোহরারকে অবহিত করার পাশাপাশি পছন্দমত স্থান নির্বাচন করে আসে। নির্বাচিত স্থানটি গোর খোদকরা খনন করে রাখে। অবশ্য মুসলিম সর্বসাধারণের সুবিধার্থে কবরস্থানে বেশ কয়েকটি কবর খুড়ে রাখা হয়। আগে কবরস্থানের জায়গা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কাছ থেকে ধনীদের অনেকেই কিনে নিত। বিশ শতকের আশির দশকের শেষ ভাগ থেকে আজিমপুর কবরস্থানের জায়গা বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। মৃতের উত্তরাধিকারীরা চাইলে পূর্বপুরুষের কেনা কবরে দাফন করতে পারে। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বরাবর আবেদন করা হয়। কবর পুনর্খননের জন্য তাদের দিতে হয় তিন হাজার টাকা। তবে সর্বসাধারণের জন্য খননকৃত কবরের ফি রাখা হয় বিশ টাকা। মৃতের পরিবারের বাঁশ-হোগলা বাবদ

আরো চার-পাঁচ শত টাকা খরচ করতে হয়। কবরের রক্ষনাবেক্ষনের জন্য মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের কেউ কেউ গোরখোদককে প্রতিমাসে তিনশত টাকা প্রদান করেও থাকে। এছাড়াও মৃত ব্যক্তির কবরের কাছে নিয়মিত দোয়া-কালাম পড়ার জন্য অনেকেই কবরস্থানের মৌলভীকে কিছু টাকা-পয়সা প্রদান করে। মাস কয়েক পর পর চেলে ফেলা হয় পুরোনো অস্থায়ী কবরগুলো। পঞ্চায়েতি ও পারিবারিক কবরস্থানে এলাকাবাসীরাই মূলতঃ করব খননের কাজ করে থাকে অধিক নেকি লাভের উদ্দেশ্যে।

কবরে নামানোর পূর্বে মৃত ব্যক্তিকে কবরের কিবলার দিকে রাখা হয়। যারা কবরে লাশ নামায় তারাও কিবলামুখী থাকে। কবরের দৈর্ঘ্য মৃতের উচ্চতার সমান, গভীরতা তার অর্ধেক। প্রস্থ দুই হাত যাতে মৃতকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখা যায়। মাহরাম পুরুষরা মহিলাদের লাশের উপর চাদর দিয়ে বিশেষভাবে আড়াল করে কবরে নামায়। কবরের ভিতর লাশের কাফনে মাথা ও পায়ের বাঁধন খুলে ফেলা হয়। কবরে লাশের মুখ ডানদিকে ফিরিয়ে কিবলামুখী করে দেয়। কবরের দৈর্ঘ্যের চেয়ে সামান্য বড় বেজোড় সংখ্যক বাঁশ লম্বালম্বিভাবে গর্তের উপর স্থাপন করে। বাঁশ ভালোভাবে স্থাপন করতে গর্তের উভয় প্রান্তের মাটি কিছুটা কেটে ফেলা হয়। বাঁশের উপর হোগলা রেখে এর উপর মাটি দেয়া হয়। এই পদ্ধতিতে দেয়া কবরের অভ্যন্তরে শেয়াল, বেজি প্রবেশ করে লাশ খেয়ে ফেলার কারণে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে ঢাকার কবরস্থানগুলিতে 'বোগলি কবর' সর্বাধিক প্রচলিত হয়েছে। বোগলি কবরে গর্তের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে বাঁশ স্থাপন করা হয়ে থাকে। এরপর বাঁশের উপর হোগলা বিছিয়ে মাটি দিয়ে কবর ভরাট করা হয়। কবরে মাটি ফেলার সময় উপস্থিত সবাই এক মুষ্টি মাটিতে দোয়া-কালাম পড়ে ফুঁকে কবরে নিক্ষেপ করে। অতীতে কবরস্থানে গমনকারী মৃতের আত্মীয়-স্বজনরা খানিকটা মাটি নিয়ে মুষ্টি বানিয়ে এরমধ্যে দোয়া- কালাম পড়ে ফুঁ দিত। সেই মুষ্টি বানানো মাটিগুলি কবরে লাশের মাথা ও পায়ের কাছে রাখা হত।[৪৮] কবরে লাশের মাথার দিক থেকে মাটি দেয়া শুরু হয়। কবর জমিন থেকে উচু ও মাঝখানে ক্রমান্বয়ে উচু করা হয়ে থাকে। এতে করে পথচারী জমিন থেকে কবরের পার্থক্য বুঝতে পারে। দাফন শেষে মৌলভী সাহেবের সাথে উপস্থিত সবাই মৃতাত্মার মাগফেরাতের জন্য মোনাজাত করে।

মৃতের আত্মীয়-স্বজনরা কবরস্থান থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে কবরস্থানে অবস্থিত মোহরার অফিসে রেজিষ্টার খাতায় মৃতের নাম, পিতা-মাতার নাম, বয়স, ঠিকানা, জন্ম-মৃত্যুর তারিখসহ মৃত্যুর কারণ লিপিবদ্ধ করে। সেখান থেকে তাদেরকে একটি স্লিপ দেয়া হয়। সেটি স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনারকে দেখালে

Dhaka University Institutional Repository

সে তাদেরকে মৃত্যুর সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে। পঞ্চায়েত ও পারিবারিক কবরস্থানে দাফনকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সার্টিফিকেট তোলার ক্ষেত্রে অনেকসময় মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের একটু অসুবিধায় পরতে হয়।

অতীতে ঢাকা শহরের বেশির ভাগ বাড়িতেই ছিল মাটির ঘর। লাশ বাড়ি থেকে বের করার পর পরই ঘর-দোর মাটি দিয়ে লেপা হত। মৃতের ঘরের মেঝেতে স্থাপন করা হত একটি লোহার পেরেক। মনে করা হত অমঙ্গল দূর হবে এতে।[৪৯] অনেকক্ষেত্রে বাড়ি-ঘর ধৌত করা হয়। লাশ ধোয়ানোর স্থানটি চল্লিশদিন পর্যন্ত ধুয়ে-মুছে পরিস্কার রাখার নিয়ম। ঐ স্থানটিতে জুতো পায়ে যাওয়া নিষেধ। বাড়ির শিশুদের খালি পায়েও সে স্থানে যেতে দেওয়া হয় না। নাপাক ছায়া যাতে না পরে সেদিকে লক্ষ রাখা হয়। পূর্বে অনেকেই মুর্দার গোসলের স্থানটি দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখত। কেউ কেউ আবার সেই স্থানটি চিহ্নিত করে রাখত গাছের ডাল ফেলে। প্রতিদিন 'তিনোসন্ধ্যায়' অর্থাৎ মাগরিবের সময় ঐস্থানে সন্ধ্যাবাতি জ্বালানো হয়। এরসাথে আরো জ্বালায় আগরবাতি ও মোমবাতি। রীতি অনুযায়ী, প্রতিদিন একই ব্যক্তি আগরবাতি জ্বালিয়ে থাকে। পুরোনো ঢাকার মুসলমানদের ধারণা, মৃতের আত্মা নিজ গৃহে আসা-যাওয়া করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত। এরপর তাকে বন্দি করা হয়। মৃতাত্মা তার গোসলের স্থানটি যেন পাক-পবিত্র দেখতে পায়, সেজন্য এমনটি করা হয়। অনেকে মৌলভী দিয়ে সেই স্থানে বসিয়ে কোরআন খতম করায়। মৃতের কবরের আযাব কমানোর উদ্দেশ্যে কেউ কেউ আবার মৌলভীকে দিয়ে সাত হা-মীম পাঠ করিয়ে থাকে।[৫০]

লাশ বিদায় হলে মৃতের পরিবারের মহিলাদের সবাইকে গোসল করতে হয়। প্রচলিত বিশ্বাস, দাফনের পূর্বে গোসল করলে মৃতের আত্মা 'ঠান্ডা' থাকে।[৫১] সবার আগে গোসল করানো হয় বিধবাকে। তাকে গোসল করিয়ে দেয় অন্য বিধবারা। তার নাকফুলসহ সকল প্রকার পরিধেয় অলংকার খুলে ফেলা হয়। আগে গোসলের পর বিধবাকে রাইঢ়া কাপড় বা রাঢ়ি কাপড় (লালপেড়ে সাদা শাড়ী) পরানো হত। এই শাড়ী মৃতের পরিবারের পুরুষ অভিভাবক অথবা বিধবার বাপ-ভাই তার জন্য নিয়ে আসত। পুরোনো ঢাকার কোন কোন স্থানে অবশ্য তিন, চার, নয় বা দশদিনেও বিধবার রাইঢ়া কাপড় পরিধান করার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। চল্লিশদিন পর্যন্ত মৃতের জন্য পালিত অনুষ্ঠানগুলিতে আত্মীয়-স্বজন সবাই বিধবার জন্য একটি করে নতুন শাড়ি নিয়ে আসে। নাকফুল খুলে বিধবাকে গোসল করিয়ে আয়নাতে নিজের

Dhaka University Institutional Repository

চেহারা দেখানো হয়। অন্যরা তাকে বিধবাবেশে দেখার পূর্বে আয়নায় সে নিজেকে নিজে দেখে নেয়। ঢাকার কোন কোন জায়গায় এই নিয়মের ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়। মৃত্যুর পরদিন সকালে বিধবা ঘুম থেকে উঠে আয়নাতে নিজের চেহারা দেখে থাকে। গোসলের পর অপর বিধবারা সেদিন মৃতদারকে আলাদা একটি ঘরে বসিয়ে রাখে, যাতে তার ছায়া সধবাদের উপর না পরে। বিধবার ছায়া কোন সধবার উপর পরলে শীঘ্রই সে স্বামী হারাবে বলে মনে করা হয়। এছাড়া এসময় সধবাদেরকে বিধবার চেহারাও দেখতে নেই। সেই কারণে মৃতের সধবা আত্মীয়দের কেউ কেউ লাশ বিদায়ের পরপরই মৃতের বাড়ি ত্যাগ করে থাকে। জানা যায়, অতীতে পুরোনো ঢাকার কোন কোন জায়গায় মৃতদার স্বামীর মৃত্যুর দিন বিধবাবেশে ঘরে প্রবেশ করে দুই পা মেলে বসে থাকত। বাড়ির সধবা বউ-ঝিরা ঘরের বাইরে থেকে বিধবার পায়ের দিকে একবার করে তাকিয়ে নিজ ঘরে চলে যেত।[৫২] আগে মৃত্যুর দিন গোসলের পর বিধবাকে ঘরে নিয়ে তিতা খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে নিমপাতা চিবাতে দেয়া হত। কারো কারো নিয়মানুযায়ী, তিনদিন পর্যন্ত বিধবা কোন পুরুষের সামনে যায় না। এমনকি নিজের পুত্রদেরও দেখা দেয় না অনেকেই। তিনদিন পর বিধবা গোসল করে আত্মীয়-স্বজনদের দেয়া নতুন শাড়ী পরিধান করে। চল্লিশদিন পর্যন্ত সধবারা বিধবার সঙ্গ এড়িয়ে চলে।

আত্মীয়দের মধ্যে যারা মৃতের বাড়িতে মৃত্যুর দিন রাত্রিযাপন করে, তাদেরকে অবশ্যই তিনদিনের চেহলাম পর্যন্ত থাকতে হয়। আবার তৃতীয়দিন চেহলামরাতে যেসকল আত্মীয় রাত্রিযাপন করবে তারাও নয় অথবা দশদিনের আনুষ্ঠানিকতা পালন শেষে মৃতের গৃহ ত্যাগ করে। নয়তো চল্লিশার অনুষ্ঠান পালিত হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে মৃতের বাড়িতে অবস্থান করতে হয়।

মৃতের বাড়িতে তিন দিন পর্যন্ত চুলার আগুন জ্বালা নিষেধ। মৃতের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের একাধিক বাড়ি থেকে ভাত, মাছ, মাংস, ডাল, সবজি পাঠিয়ে দেয়া হয়। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই বিরিয়ানি, সাদা পোলাও, মাংস এবং অবস্থাসম্পন্ন পরিবার থেকে কাচ্চি বিরিয়ানি বা মোরগ পোলাও মরহুমের বাড়িতে পাঠানো হয়।[৫৩] পুরোনো ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পরিজনের মৃত্যুতে পরিবারের লোকসকল তিনদিন পর্যন্ত শোক পালন করে থাকে। আগে একুশদিন পর্যন্ত শোক পালন করত। পরবর্তীতে একুশদিনের পরিবর্তে তিনদিন পালন করার প্রথা চালু হয়।[৫৪] মৃতের শোকার্থে পরিজনেরা তিনদিন পর্যন্ত তেল, সাবানসহ সর্ব প্রকার প্রসাধন সামগ্রি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে। মাথার চুল চিরুনি করে না। প্রতিদিনের ব্যবহৃত

Dhaka University Institutional Repository

বস্ত্র খালি পানি দিয়ে ধোয়। অনেকে আবার তিন দিনের ব্যবহার করা ময়লা কাপড় জমিয়ে রেখে দেয়। তিনদিন পর সেগুলিকে সাবান পানিতে ধুয়ে ফেলা হয়। পরিবারের লোকেরা তৃতীয়দিনে শরীরে সাবান মেখে গোসল করে। আগে পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যুতে তিনদিন পর্যন্ত বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হত। এসময় কোন শিশুকে ঘরের চালে উঠতে দেয়া হত না, এ আশংকায় যে মৃতাত্মার সাথে ধাক্কা লেগে চাল থেকে পরে ব্যথা পেতে পারে।

মৃত্যুর পর তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিনে মৃতাত্মার মঙ্গলার্থে পালিত হয় 'তিন দেনকা ফুল' বা 'চাররোমা'। এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ জানানো হয় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশিদের। ফকির-মিসকিনও খাওয়ানো হয় সাধ্যমত। ঐদিন তিতা খাওয়ার রীতি। ভাতের সাথে করল্লাসহ তিন সবজির ভাজি[৫৫] অথবা করল্লা ভাজি রান্না করা হয় চিংড়ি মাছ সহযোগে। আরো থাকে আলু দিয়ে গরুর ঝাল তরকারি, শোল মাছ দিয়ে লাউ-এর তরকারি ও ডাল। এরসাথে অনেকেই আম/কলা/ কাঁঠালও খাইয়ে থাকে। যাদের শিশু সন্তান মারা যায় , তারা ফকির-মিসকিনদের দুধ-ভাত খাওয়ায়। গরীব শিশুদের মাঝে দুধ বিতরণ করে। এছাড়া সেই তৃতীয়দিনের দুপুর বেলা সবাইকে দুধের শরবত খাওয়ানো হয়। সকাল থেকেই মৃতের বাড়িতে মহিলারা কোরআন, কলেমা, দোয়া, দরূদ পড়ে খতম দেয়। মৌলভী কর্তৃক বাদ যোহর মিলাদের পর এই সকল খতম মৃতের নামে বখশে দেয়া হয়। মিলাদ শেষে অন্দর মহলে খবর পাঠানো হলে মহিলারা সেখান থেকেই মোনাজাতে শরীক হয়। রান্না করা খাবারের হাড়ি থেকে 'আগ ভাত-তরকারি' প্রথমে তোলা হয় কাকের জন্য। তিনবার বিসমিল্লাহ বলে হাড়ি থেকে খাবার বেড়ে নিয়ে বাড়ির ছাদ বা উঠোনে কাককে খেতে দেয়া হয়।[৫৬] এর পাশাপাশি কিছুটা খাবার নদীতে নিক্ষেপ করে অনেকেই।[৫৭] মৌলভী সাহেব খেয়ে গেলে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশি, বন্ধু-বান্ধব, ফকির-মিসকিন সবাই খায়। এই অনুষ্ঠানের রান্না করা আহার্য রাত পর্যন্ত রাখা নিষেধ। উদ্বৃত্ত খাবার গরীব আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। হাড়ি-পাতিল সন্ধ্যার আগেই ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে ফেলার রীতি। বিকেল বেলায় আধাবাটা চাল বা খুদের চাপড়ি তৈরি করে অনেকেই। মৃতের পরিবারের লোকদের এই চাপড়ি অল্প অল্প করে খাওয়ার নিয়ম। এতে করে মানষিক শক্তি বৃদ্ধি পায় বলে মনে করা হয়। সন্ধ্যার পর পরিজনেরা সবাই মাথায় তেল মেখে চুল আচড়ায়।[৫৮] বর্তমানে তিন দিনের কুলখানি বাদ আসর অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। মিলাদের পর আগত অতিথিদের মিষ্টি অথবা পোলাও-এর প্যাকেট দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মৃতাত্মার মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে নয় বা দশ দিনের দিন ঘরের তৈরি হালুয়া-রুটি বিতরণ করার রেওয়াজ পুরোনো ঢাকার আদিবাসী মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে। লোকমতে, জীবিতাবস্থায় মৃত ব্যক্তি যেহেতু হালুয়া-রুটি খেয়ে থাকে, সেজন্যই হালুয়া-রুটি বিলির নিয়ম। সেদিন মৃতের আত্মীয় মহিলারা রুটি বানানোর তক্তা ও বেলনা সাথে করে নিয়ে মৃতের বাড়িতে চলে আসে। দুপুরের খাবারের পরপরই রুটি বানানোর আয়োজন শুরু হয়। আর প্রতিবেশী মহিলারা বেলা রুটি নিয়ে নিজেদের চুলায় সেকে দেয়। রুটির সাথে সুজির হালুয়াও তৈরি করা হয়। দুই রুটির মাঝে হালুয়া ভরে সেটি পাঠানো হয় পাড়া-প্রতিবেশি, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের বাসায়। রুটি-হালুয়া বিতরণের কাজটি করে থাকে বাড়ির কিশোর ও যুবকরা। ইদানিং অনেকেই বেলা রুটির পরিবর্তে কেনা টাপুরুটি বিতরণ করে থাকে। হালুয়া-রুটি দিনের আলো থাকতেই বিতরণ ও খাওয়া শেষ করার নিয়ম। এমনকি সন্ধ্যার পূর্বেই হালুয়া-রুটি তৈরিতে ব্যবহৃত তৈজসপত্র ও রান্নাঘর ধুয়ে-মুছে পরিস্কার করা হয়।

মৃত্যুর উনিশ অথবা একুশ দিনের দিন মৃতের বাড়িতে পালিত হয় 'চোরাভাত' নামক লোকাচার। এই আচার পালনের ফলে ভূতপ্রেতের অনিষ্টকারী ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব বলে মনে করা হয়। লোকবিশ্বাস, বেজোড় রাত্রিগুলিতে মৃতাত্মার নিজ গৃহে আগমন ঘটে। পরিজনদের কার্যকলাপ সে পর্যবেক্ষণ করে থাকে। এই ভাত খেয়ে মৃতাত্মা শান্তি পায়। এর ফলে সে পরিজনদের উপর সন্তুষ্ট থাকে। এই আচার পালনের জন্য আগে থেকে একজন গরীব ব্যক্তিকে ঠিক করে রাখা হয়। সন্ধ্যার সময় রান্না করা ভাত-তরকারি একটি থালায় বেড়ে সদর দরজায় অথবা রান্না ঘরে বাতি বন্ধ করে রেখে সেই স্থান থেকে বাড়ির লোকজন সরে যায়। গরীব ব্যক্তিটি চুপ করে এসে খাবারের থালাটি নিয়ে যায় ঠিক মাগরিবের আযানের আগমুহূর্তে। পুরোনো ঢাকার কোথাও বিধবা কর্তৃক চোরাভাত খাওয়ার কথা জানা যায়। স্বামীর মৃত্যুর উনিশ অথবা বিশ দিনের দিন বিধবা যৌথ পরিবারের কারো রান্না ঘরে লুকিয়ে চোরাভাত খায়।[৫৯] ঢাকার কোন কোন স্থানে একুশ দিনের দিন তিনজন লোক খাওয়ানোর রীতি প্রচলন দেখা যায়।

মৃতের রুহের মুক্তি কামনার্থে পালিত হয় চল্লিশা বা চাল্লিশা। মৃত্যুর পর চল্লিশ দিনের মধ্যেই চল্লিশা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার রীতি। কোনক্রমেই চল্লিশ দিনের পর উৎযাপন করা বাঞ্ছণীয় নয়। অধিকাংশ

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রেই দুই-এক দিন পূর্বেই পালিত হতে দেখা যায়। চল্লিশা উৎযাপনের পর মৃতাত্মা ইহলোক ত্যাগ করে বলে লোকবিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। অনুষ্ঠানের কয়েক দিন আগে থেকেই বাড়ি-ঘর ঝেড়ে-মুছে পরিস্কার করা হয়। চল্লিশা অনুষ্ঠানেও কুরআন পাঠ, তসবিহ-তাহলীল, দোয়া-দরূদ পাঠ, মিলাদ অনুষ্ঠান ও খানা-দানার আয়োজন করা হয়। আগে চল্লিশাতে সাদা পোলাও, গরুর ঝাল-সালুন, খাসির পুরিজি আর সেরবেরেন রান্না করা হত।[৬০] এখন অবশ্য বিরিয়ানি রান্না করা হয়ে থাকে।

অতীতে ঢাকার আদিবাসী মুসলমানদের মধ্যে জীবিতাবস্থায় নিজের চল্লিশা উৎযাপন করার রীতি প্রচলিত ছিল। মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারিরা যদি চল্লিশা না করে অথবা তাদের সেই সামর্থ্য না থাকে, সেই ভয়ে অনেকে আগেভাগেই নিজের চল্লিশা অনুষ্ঠান করে রাখত।[৬১] অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের অনেকেই চল্লিশার পাশাপাশি তিন অথবা চার দিনের অনুষ্ঠানও সম্পন্ন করে ফেলত। নিজ চল্লিশা পালনকারী ব্যক্তির বেঁচে থাকতে অন্য কারো জিয়াফতের খাদ্য গ্রহণ নিষেধ। ভুলে কখনো খেয়ে ফেললে নিজের চল্লিশার 'গুণ' কমে যায় বলে মনে করা হয়। ফলে সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারিদের পুনরায় চল্লিশার অনুষ্ঠান করতে হত। পুরোনো ঢাকার মুসলমানদের আলেম এবং সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর অনেকেই জিয়াফতের আহার্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। তাদের মতে, জিয়াফতের খাদ্য খেলে মৃত্যুর পর কলিজা কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে।[৬২]

মৃতের পরিবারের লোকেরা এই সময় বার অথবা আঠার মাস পর্যন্ত নানারূপ বিধি-নিষেধ মেনে চলে। বর্জন করা হয় সর্বপ্রকার আনন্দ উৎসব। ছেলে মেয়েদের বিয়েশাদী দেয়া হয় না অমঙ্গলের ভয়ে। বাড়ি-ঘর নির্মাণ বা মেরামত করানো হয় না। পরিজনরা ঈদ-তেহারে পর্যন্ত নতুন বস্ত্র পরিধান করে না। এমনকি মৃতের বাড়িতে পিঠা, সেমাই, পোলাও, কোরমা রান্না হয় না। তবে আত্মীয়-স্বজনরা রান্না করে পাঠালে সেটা খেতে দোষ নেই। এই সময়ের মধ্যে তারা দূর সফরেও বের হয় না। প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্বেই ঘরে ফিরে আসে। রাতে নিজ গৃহ ব্যতিত অন্যত্র কোথাও অবস্থান করে না। মৃতের পুত্রবধুদেরও নিজ শ্বশুড়ালয়ে অবস্থান করতে হয়। পিত্রালয়ে খুব একটা যায় না। গেলেও সন্ধ্যার পূর্বেই শ্বশুড়ালয়ে ফিরে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

মৃত স্বজনদের কল্যাণার্থে অনেকেই আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত খাদ্য ও পানাহার পরিত্যাগ করে। লোকবিশ্বাস, দিনশেষে সান্ধ্যকালীন সময়ে অতি ছোট ধনিয়ার একখোসায় পানি মৃতাত্মাদের পান করতে দেয়া হয়। উক্ত সময়ে মৃতাত্মার পরিজনেরা খাদ্য ও পানাহার করলে অথবা ঘরের অত্রতত্র মাথার চুল পরে থাকলে সেদিন আর সেই পানিটুকু তাদের ভাগ্যে জুটে না। ফেরেস্তারা তখন সেই মৃত ব্যক্তিকে বলে- 'কেমুন পরিজন রাইখ্যা আইছচ, তাগো লিগা আইজকার দিনে তোর খাওন জুটল না।'[৬৩] মৃত ব্যক্তি সেই সময় ব্যথিত মনে তার পরিজনদের অভিশাপ দেয়। পুরোনো ঢাকার কোন কোন স্থানে শিশু সন্তানের মৃত্যুতে পিতা-মাতা আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করে না। ঢাকার আদিবাসী মুসলমানদের কেউ কেউ আবার খাদ্য-পানাহার পরিহার ছাড়াও উক্ত সময়ে কারো সাথে কোনরূপ কথা বলা থেকেও বিরত থাকে। অতীতে অনেকেই এইসময় ঘরে অথবা মসজিদে ধ্যানে বসত। মাগরিবের আযান দিলে তারা পানি পান করত। এতে করে একটি রোজা সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করা হত।[৭০] অনেকেই মৃতের মৃত্যুদিনের প্রতিসপ্তাহিক বারে একজন গরীব অথবা মসজিদের মৌলভীকে 'খোরাকজন মানুষ' হিসেবে একবেলা খাদ্য দান করে থাকে।

মির্জা নাথানের বাহারীস্তান-ই-গায়বী গ্রন্থ থেকে মোঘল ঢাকায় মৃত্যুবার্ষিকী উৎযাপনের খবর পাওয়া যায়।[৭১] ঢাকার স্থানীয় মুসলিমরা মৃত্যুবার্ষিকীকে বোরশি বা বচ্ছরি বলে থাকে। প্রথম বছর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয় বেশ আড়ম্বরপূর্ণভাবে। মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া নেয় ধনীদের অনেকেই। মৃতের পরিজন মহিলারা কয়েকদিন আগে থেকেই কুরআন ও দোয়াদরূদের খতম দেয়ার কাজ সম্পন্ন করে থাকে। অনুষ্ঠানস্থলে মিলাদের পর মৌলভী কর্তৃক সেগুলি বখশে দেয়া হয়। চল্লিশার অনুরূপ মৃত্যুবার্ষিকীর খাবার রান্না করা হয়ে থাকে। মৃতের আত্মার শান্তি কামনায় প্রতি বছরই মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। পরবর্তী মৃত্যুবার্ষিকীগুলোতে ঘনিষ্ট আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ ছাড়াও অনেক সময় শুধুমাত্র ফকির-মিসকিনদের ভাত-তরকারি রান্না করে খাইয়ে দেয়া হয়। কেউ কেউ আবার মাদ্রাসায় খাবার পাঠিয়ে দেয়।

খ. পুরোনো ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায়ঃ

ঢাকার হিন্দুরা মৃত্যু পথযাত্রীর মাথার কাছে বসে পর্যায়ক্রমে গীতা পাঠ করে থাকে। ঋষিরা গীতা পাঠ করার মত লোক না পেলে মৃতাসন্ন ব্যক্তির বুকের উপর গীতা রাখে।[৬৬] মুমূর্ষুর আত্মাকে স্বর্গমুখী করতে

Dhaka University Institutional Repository

বৈষ্ণব অথবা কীর্তনকারীদের ডেকে ঘরের মধ্যে কীর্তন করানো হয়। এসময় পরিজনরাও ঘরের ভেতর এক স্থানে সবাই বসে কীর্তন বা গীতা পাঠ শুনে। ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ আবহ তৈরি করতে আগরবাতি ও মোমবাতি জ্বালানো হয়। মৃত্যু পথযাত্রীর কানের কাছে বত্রিশ অক্ষরবিশিষ্ট ষোলটি হরিবলের নাম- 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হরে, হরে, হরে রামা, হরে রামা, রামা,রামা, হরে, হরে' নেয়া হয়।[৬৭] এছাড়া অনেকে তার কানের কাছে 'হরি বল, হরি বল' বলেও জপ করতে থাকে। পরিজনরা প্রত্যেকেই চামচ দিয়ে তার মুখে একটু করে গঙ্গাজল[৬৮] দেয়। গঙ্গাজলে মরন্ত ব্যক্তির শরীর শুদ্ধ হয়ে যায় ও সে পবিত্রাবস্থায় মৃত্যু বরণ করে বলে হিন্দুদের মধ্যে বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। যদিও এখন আর এরূপ নিয়ম পালিত হয় না কিন্তু পূর্বে বিষয়টি এরকম ছিল। মৃত্যু পথযাত্রীর মৃত্যু কষ্ট পরিজনরা বুঝতে পারলে তাকে বিছানা থেকে মাটিতে নামিয়ে উত্তরে মাথা দক্ষিণে পা[৬৯] দিয়ে শুইয়ে দিত। প্রচলিত বিশ্বাস, মাটিতে মৃত্যু বরণ করলে মৃত ব্যক্তি অধিক মাত্রায় পূর্ণতা লাভ করে।[৭০]

দেহত্যাগের পর মৃতের চোখের পাতা খোলা থাকলে বন্ধ করা হয়। মৃতের মাথা উত্তর দিকে আর পা দক্ষিণ দিক করে শোয়ায়। দুই চোখের উপর দুটি তুলসী পাতা রেখে একটি চাদর দিয়ে মৃতের আপাদমস্তক ঢাকে। আত্মীয়-স্বজনরা আসলে মুখ খুলে দেখানো হয়। বাড়িতে শব থাকাকালীন খাবার-দাবার বন্ধ থাকে। পূর্বের রান্না করা খাবার, এমনকি খাবারের পানিটুকুও ফেলে দেয়া হয়।

ঢাকার সাহা, শাঁখারী, গোয়ালা ও ঋষিরা তাদের পরম্পরা অনুযায়ী শবকে গোসল করায় শ্মশানে। ব্যতিক্রম ঢাকার উর্দুভাষী ধোপারা। রীতিমাফিক, তারা বাড়ি থেকে শবকে গোসল করিয়ে শ্মশানে নেয়। পুরুষের শবকে পুরুষরা আর মহিলা শবকে মহিলারা স্নান করায়। স্নান শেষে দুই খন্ড সাদা মার্কিন কাপড়ের একটি মৃত পুরুষের কোমরে পেঁচানো হয়, অন্যটি দিয়ে শরীরের উপরের অংশ ঢেকে ফেলে । মৃত বিধবাকে পরানো হয় সাদা ধুতি শাড়ি। মৃতের বড় ছেলেও এসময় নদীর ঘাট থেকে গোসল করে দুই খন্ড সাদা মার্কিন কাপড় পরিধান করে। স্নানের পর নাপিত তার মাথা মুন্ডন করে দেয়। এছাড়া মৃতের পরিজন, শ্মাশানবন্ধুরাও শ্মাশানে যাবার পূর্বেই সকলে স্নান সম্পন্ন করে । সাম্প্রতিককালে নব্য ইস্কন্ধধারীরা বাড়ি থেকেই শবদেহের স্নান সম্পন্ন করে থাকে। গোয়ালারা বাড়িতে ভেজা কাপড় দিয়ে শবদেহ মুছে দেয় এবং মৃত পুরুষকে ধোপাদের অনুরূপ দুই খন্ড কাপড় পরিধান করায়। অপরপক্ষে, মৃত বিধবাকে একখন্ড সাদা মার্কিন কাপড় শাড়ির মত করে পরানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকের মতে মৃত সধবা স্বর্গবাসী, তাই স্বামীর পূর্বে মৃত্যুবরণকে সৌভাগ্যজনক মনে করা হয়। হিন্দুদের মধ্যে মৃত সধবাকে নববধূর সাজে সজ্জিত করে শ্মশানে নেয়ার রীতি প্রচলিত আছে। হিন্দুরা মৃত সধবাকে পরায় লাল অথবা লালপেড়ে সাদা শাড়ি।[৭১] মৃত স্ত্রীর সিঁথিতে স্বামী সিঁদুর পরিয়ে দেয়। ঢাকার হিন্দুদের মধ্যে শবদেহকে চন্দন দিয়ে সাজানোর রেওয়াজ রয়েছে। মৃত সধবা ও বৃদ্ধদের কপাল থেকে গাল পর্যন্ত ছোট ছোট চন্দনের ফোঁটা দেয়া হয়। শবদেহের বিভিন্ন স্থান যেমন- কপাল, গলা, দুই বাহু, মেরুদন্ড, নাভি ও কোমরের দুই পাশে একটি করে চন্দনের ফোটা দেওয়া হয়। সাহারা মাটি বা পিতলের 'হরে কৃষ্ণ' সীলে চন্দনের ছাপ মৃতের কণ্ঠ, দুই বাহু, মেরুদন্ড ও নাভিতে অংকন করে।

ঢাকার হিন্দুরা সাধারণত বাঁশের তৈরি মই বা মাচাতে মরদেহ বহন করে শ্মশানে নেয়।[৭২] শব বহনকারী এই মইকে ঢাকার সাহারা সাংগ, শাঁখারীরা হাংগর, ঋষিরা চংগ এবং ধোপারা খাটোলা বলে থাকে। মই-এর মধ্যে পাটি বা হোগলা বিছিয়ে শবকে তার ব্যবহৃত বিছানাপত্র সহ মইতে শুইয়ে দেয়া হয়। ছয় হাত সাদা মার্কিন কাপড়ে ঢেকে ফেলা হয় মরদেহ। এরপর শবদেহকে পাটি বা হোগলায় পেঁচিয়ে দরি দিয়ে বাঁধা হয়। মৃতের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে সমস্ত শরীরে ফুলের পাপড়ি ও আবির ছিটিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া মই-এর উপর ফুলের তোরাতো থাকেই। মৃতের শিয়রে দিয়ে দেয়া হয় ছোট একটি তুলসী গাছ।[৭৩] ঢাকার ধোপারা অবশ্য তুলসী গাছের পরিবর্তে মৃতের গলায় আর চোখের উপর তুলসী পাতা রাখে। ঋষিদের মধ্যেও অনেকেই মরদেহের বুক, কান ও চোখে তুলসী পাতা স্থাপন করে। সবশেষে মরদেহ রামাবলী[৭৪] দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়। রামাবলীর উপর ফুলের মালা রাখা হয়। ঢাকার ঋষিরা শব আবৃত করার ক্ষেত্রে রামাবলী ব্যবহার করে না।[৭৫] তারা মৃত বাবা/মা অথবা স্বামীর পায়ে, অপরপক্ষে, মৃতদার স্ত্রীর মরদেহের সামনে করজোড়ে ভক্তি প্রদর্শন করে। ভক্তি শেষে সবাই মৃতের পায়ে আবির ছিটায়। এসময় ঋষি মেয়েরা জোকার দেয়, পুরুষরা সবাই বলে উঠে-

'হরি বল, বল হরি বল।
হরি হরি বল বায়, হরি বল।
রাম নাম সত্য হয়।'[৭৬]

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার সাহা, ধোপা, গোয়ালাদের প্রথানুসারে স্বামীর শব শ্মশানে নেয়ার পূর্বে স্ত্রী তার চুড়ি, নাকফুল, শাঁখাসহ অন্যান্য অলংকার খুলে ফেলে। শব বহনকারী মইতে স্বামীর পায়ের কাছে সেগুলি রেখে দেয়। এরপর মৃত স্বামীর বৃদ্ধ আঙ্গুল দিয়ে স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলা হয়।

শ্মশানে যাত্রাকালে মৃতের মেয়ের ঘরের সন্তানদের মধ্যে নূন্যতম একজন অথবা প্রত্যেকেই একটি করে ছাতা শবের শিয়রে দান করার নিয়ম। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী ধারণা করা হয়, মৃতের স্বর্গ যাত্রাকালে এই ছাতা তাকে রৌদ্রে ছায়া দেয় ও ঝড় বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে। কারো নাতি না থাকলে দুরসম্পর্কীয় কোন নাতিকে অথবা কাউকে নাতি বানিয়ে সেসময় এই নিয়ম পালন করা হয়ে থাকে। অপরপক্ষে, ছেলের ঘরের সন্তানরা মৃতের পায়ের সামনে দাঁ বা কুড়াল দেয়। বর্তমানে মরদাহের লাকড়ি শ্মশানে তৈরি পাওয়া যায়। পূর্বে কুড়াল দিয়ে গাছ কেটে শবদাহের লাকড়ির ব্যবস্থা করা হত। শ্মশানে মরদেহ নিয়ে যাবার পর পরই শ্মশানবন্ধুদের কয়েকজন মিলে কুড়াল নিয়ে চলে যেত গাছ কাটতে। দাহের জন্য লাকড়িগুলো আকৃতি একই রকম রাখার চেষ্টা করা হত। জানা যায়, মোটা লাকড়ির অপর্যাপ্ততার কারণে আগে অনেকেই নিজ মরদেহ দাহের উদ্দেশ্যে বাড়িতে গাছ লাগাত। সেই গাছটি বিশেষভাবে তার জন্যই নির্দিষ্ট করা থাকত।

শবদেহ শ্মশানে যাত্রাকালে পথের দুই পাশে খই আর পয়সা ছিটানো হয়। অনেকে মনে করে, মৃত ব্যক্তির কোথাও কোন প্রকার ঋণ থাকলে এতে করে তা পরিশোধ হয়ে যাবে। আবার কারো কারো মতে, এতে করে মৃত ব্যক্তির গরীব দুঃখীদের প্রতি দান সম্পন্ন হয়। পূর্বে শ্মশানের অবস্থান দূরবর্তী হবার কারণে শ্মশানবন্ধুদের খাওয়ার জন্য সাথে খই নেয়া হত। পথে পয়সা ছিটানোর পাশাপাশি খইও ছিটানো হত। কালক্রমে খই খাওয়ার প্রচলন উঠে গেলেও রাস্তায় খই ছিটানোর রীতি এখনো রয়ে গেছে। ধোপারা পথে শবদেহ বহন করার সময় সকলেই উচ্চসমস্বরে বলে- 'রাম নাম সাত্যে হায়।'[৭৭] বয়স্কদের শ্মশানে নেয়ার সময় পথে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে কীর্তন করা হয়। উনিশ শতকে জেমস ওয়াইজের বর্ণনা থেকে জানা যায়, হিন্দু সন্তদের শবানুগমন শোভাযাত্রা হত বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত আর হৈচৈপূর্ণ। মৃতের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটি খাটিয়ায় করে মৃতদেহ বহন করা হত। খাটিয়ার চার কোনায় চারটি লাল পতাকা টাঙ্গিয়ে খাটিয়াটি একটি সাদা কাপড়ে ঢেকে দেয়া হত। ঢাক-ঢোল নিয়ে গান গাইতে গাইতে রাস্তাা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হত।[৭৮]

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুদের রীতি অনুযায়ী, শবদেহ বহনের সময় একজন জ্ঞাতি অবশ্যই থাকতে হবে। জ্ঞাতি না ধরলে শব শ্মশানে যাবে না। জ্ঞাতিদের মধ্যে মৃতের ভাই, জেঠা, কাকা, তাদের ছেলে আর নাতিরা অন্যতম। এরা মৃতের শ্রাদ্ধ পর্যন্ত নিরামিষ খায়। এসময় নিজেদের নখ, চুল, দাড়ি কাটে না। ঘাটকামের দিন এই জ্ঞাতিজনেরা মৃতের ছেলেদের খরচে নাপিত দিয়ে ক্ষৌর কাজ সেরে স্নান করে। পূর্বে ধোপারা জ্ঞাতির মৃতুতে মাথা মুন্ডন করত। এছাড়া তাদের প্রথানুসারে চারজন ব্যক্তিকেই শব বহন করে শ্মশানে নিতে হত। বর্তমানে তাদের মধ্যে এই নিয়মের পরিবর্তন এসেছে। ইদানিংকালে শ্মশানবন্ধুরা পর্যায়ক্রমে মরদেহ বহন করে থাকে। যারা মৃতকে কাঁধে নিয়ে শ্মশানে য়ায়, মৃতের সৎকারের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগীতা করে, তাদেরকে ঢাকার সাহা ও শাঁখারীরা শ্মশানবাসী বলে থাকে। অপরপক্ষে, এরা ঢাকার গোয়ালা, ধোপাদের নিকট শ্মশানবান্ধু আর ঋষিদের কাছে হাইংগা হিসেবে পরিচিত। অতীতে শ্মশানবন্ধুদের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষরাই থাকত। হিন্দু শাস্ত্রে নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও কোন নারী বা শিশুকে শ্মশানে নেয়ার নিয়ম ছিল না। তাদেরকে শ্মশানে যাবার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করা হত। শ্মশানে বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় দশ-পনের বছর ধরে নারী ও শিশুরা শ্মশানে যাওয়া শুরু করেছে। বর্তমানে হিন্দুদের কোন কোন বর্ণের সৎকারের সময় শ্মশানে পুরুষদের চেয়ে নারীদের সংখ্যা বেশী লক্ষ করা যায়। হিন্দু ধর্মাবলম্বী সর্বসাধারণের জন্য ঢাকা শহরে মিরপুর, রায়েরবাজার, রাজারবাগ, কামরাঙ্গিরচর ও পোস্তগোলায় শ্মশান রয়েছে। পোস্তগোলা ও লালবাগ-কামরাঙ্গিরচর শ্মশান সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন।[৮৯] পোস্তগোলা শ্মশানে সুযোগ সুবিধা বেশী থাকায় ধনীদের অনেকেই সেখানে মৃতের সৎকার করতে আগ্রহী।

শব সৎকারের উদ্দেশ্যে বের হবার পর সমস্ত ঘর-দোর ধোয়া হয়। যে স্থানে শব রাখা ছিল, ধোয়ার পর সেই স্থান পবিত্র করতে গোবরছড়া ছিটানো হয়ে থাকে। আগে যে ঘরে লোক মারা যেত, সেই ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র ফেলে দেয়ার রীতি ছিল। এখন শুধু পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়। জেমস ওয়াইজ উল্লেখ করেছেন, কুমারদের মধ্যে মৃত্যুর পর সব ভেঙ্গে ফেলার রীতি।[৮০] শব বিদায়ের পর পরই মৃতের আত্মীয় মহিলারা বিধবাকে নিয়ে চলে যেত নদীর ঘাটে। এখন অবশ্য বাড়িতেই স্নান করে। শাঁখারীদের প্রথানুযায়ী, মৃতের পুত্রবধূ ও কন্যারা এসময় পরিধান করে লালপেড়ে সাদা শাড়ি। সাহাদের মধ্যে চতুর্থ দিন থেকে পুত্রবধূদের লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরিধানের রেওয়াজ আছে। এই শাড়ি পুত্রবধূদের পিত্রালয়

Dhaka University Institutional Repository

থেকে পাঠানো হয়। অন্য বিধবারা সদ্য বিধবাকে চুলার ছাই দিয়ে মাথা পরিস্কার করে স্নান করিয়ে দেয়।[৮১] স্নানের পর বিধবাকে সাদা ধুতি শাড়ি পরানো হয়। গোয়ালা রমণীরা স্বামীর মৃত্যুর পর সাদা ধুতি শাড়ি পরে না। তারা এসময় তাদের দৈনন্দিন পরিধেয় বস্ত্র থেকে লাল ব্যতিত যে কোন রঙের শাড়ি-কাপড় পরে। শাঁখারীদের মধ্যে বিধবা স্নানের পূর্বে হাতের শাঁখা বারি দিয়ে ভাঙ্গে, সিঁথির সিঁদুর মুছে, নাকফুলসহ পরিধেয় সকল অলংকার খুলে ফেলে। শ্মশানে মৃত স্বামীর ঘাটপিন্ড সম্পন্ন হলে ঋষি নারীরা স্নান করে সাদা ধুতি শাড়ি পরে। স্নানের পূর্বে বয়স্ক বিধবারা তাদের হাতের শাঁখা ভেঙ্গে ফেললেও, যুবতিদের শাঁখা খুলে ভাসিয়ে দেয়া হয় গঙ্গায়।

বিধবা পুত্রদের সাথে ঘরের ভেতর মৃতাশৌচ পালন করে। পরিজন ব্যতীত অন্য কারো সামনে পারতপক্ষে যায় না। প্রথম বছর বিধবা নিরামিষ খায়। অতীতে বিধবাদের বেশভূষা, খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদি কঠোর বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। বিধবাকে শুদ্ধাচারিণী হয়ে সাদা ধুতি শাড়ি পরিধান করতে হত। বিধবা অলংকারসহ সর্বপ্রকার সাজসজ্জা পরিহার করত। মাছ, মাংস ও অন্যান্য আরো নানারকম খাদ্য বর্জন করে পাথরের খাদায় শুধুমাত্র নিরামিষ আহার করত। ঢাকার গোয়ালাদের মাঝে অবশ্য বিধবা আজীবন সাদা ধুতি শাড়ি পরিধান করবে, মাছ-মাংস খাবে না, এমন কোন নিয়ম নেই।

মৃত ব্যক্তির সন্তুষ্টার্থে শব সৎকারের পূর্বে শ্মশানে প্রস্তুতিমূলক কিছু বিষয়াদি লক্ষ্য করা যায়। ঢাকার হিন্দুদের মধ্যে এসকল বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে বৈচিত্রতা রয়েছে। ধোপাদের প্রথানুযায়ী, শব শ্মশানে নেয়ার পর মৃতের পুত্রদ্বয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কাছ থেকে 'শবক' পাঠ করে। ধোপারা একে সংকেলাপও বলে থাকে। শবক শেষে মৃতের বড় ছেলে নদীর ঘাট থেকে একটি মাটির কলসে পানি ভরে নিয়ে এসে পাঁচ অঞ্জলী গঙ্গাজল[৮২] শবদেহের উপর ছিটিয়ে দেয়।

ঢাকার হিন্দুরা শ্মশানে নির্মিত বেদীর উপর মরদেহ রেখে স্নান করার। স্নানের সময় মরদেহের পরিধেয় বস্ত্র ও অলংকারাদি খুলে ফেলা হয়। পূর্বে সাহা, শাঁখারী ও ঋষিরা শবদেহকে অনাবৃত করে স্নান প্রদান করত। জন্ম ও মৃত্যুকালে মানুষের সাম্যাবস্থা তৈরির লক্ষেই এমনটি করা হয়। জন্মানোর সময় মানুষ যেরূপ অবস্থায় পৃথিবীতে আগমন করে, মৃত্যুকালেও তাকে সেইরূপে বিদাই জানানোর নিয়ম। এখন অবশ্য এই রীতির ব্যত্যয় ঘটে থাকে। সাহারা স্নানকালে নারী শবদেহ গলা থেকে পা আর পুরুষের

Dhaka University Institutional Repository

কোমর থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করে। শাঁখারীরা পুরুষ শবদেহ অনাবৃত রাখলেও নারীদের দেহের খানিকটা জায়গা ঢেকে ফেলে। ঋষিদের মধ্যেও অনেকেই এখন গোসলের সময় মৃতের শরীর অনাবৃত করে না। ঢাকার হিন্দুদের নিয়মানুযায়ী, মৃতকে স্নান করায় তার পুত্ররা। মৃতের পুত্র সন্তান না থাকলে জ্ঞাতিরা তাকে স্নান করাবে। বিবাহের মাধ্যমে গোত্রান্তরের ফলে অপুত্রক মৃত নারীর শব স্নান ও মুখাগ্নির অধিকার পায় তার স্বামীর জ্ঞাতি। জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মুখাগ্নি করে তাকে মৃতাশৌচ পালন করতে হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, হিন্দুদের কারো কারো প্রথানুযায়ী মৃতের সম্পত্তির অধিকারও পেয়ে যায় সে।[৮৩]

শব স্নানের পূর্বে মৃতের পুত্ররা পবিত্রতা লাভের উদ্দেশ্যে শ্মশানঘাটে স্নান সম্পন্ন করে। স্নানের পর গোয়ালা আর শাঁখারীরা পরিধান করে দুই খন্ড সাদা মার্কিন কাপড়, এক খন্ড কাপড় লুঙ্গির মত করে কোমরে বাঁধে আর অন্যটি গায়ে জরায়। গোয়ালারা এসময় নাপিতকে দিয়ে মাথা মুন্ডন করায়। ঋষিরা অবশ্য শ্মশানে আসার আগেই খেউরি (ক্ষৌর কর্ম) সম্পন্ন করে। তারা শ্মশানঘাটে স্নান করে নতুন ধুতি পরে। হিন্দুদের মধ্যে কেউ কেউ তখন ব্রাহ্মণের কর্তৃক তিলক ধারণ করে থাকে। তিলক ধারণকারীরা শ্মশান যাত্রাকালে তিলক-মাটি সাথে নিয়ে যায়। কোন কারণে তিলক-মাটি সংগ্রহ করতে না পারলে শ্মশানঘাট থেকে একটু মাটি নিয়ে তাতে নদীর পানি মিশিয়ে ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়ে তিলক-মাটি তৈরি করেন। ব্রাহ্মণ তার মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে পুত্রদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে (কপাল, নাক, বুক, দুই বাহু, মেরুদন্ড ও পিঠ) দশটি তিলক প্রদান করেন। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুত্ররা নতুন মাটির কলস নিয়ে নদীর ঘাটে যায় পানি আনতে। কলসে পানি ভরণকালে ঋষিরা নদীকে বলে- 'মা গঙ্গা পানি দাও। আমার বাবা/মায়রে ছান করামু।'[৮৪] ঋষিরা শবকে স্নান করায় সাত কলস পানি দিয়ে। শবদেহে প্রথমে সুগন্ধি সাবান মেখে এক কলস পানি মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢালা হয়। এরপর সরিষার তেল মেখে একই ভাবে আরো ছয় কলস পানি ঢালার নিয়ম। স্নানের পর শবদেহে মাখা হয় ঘি আর গোলাপজল। পক্ষান্তরে, ঢাকার সাহারা প্রথমে শবদেহের মাথা থেকে পা পর্যন্ত কলস দিয়ে পানি ঢালে। এরপর সাবান মেখে পুনরায় পানি ঢালার পর শবদেহে পর পর তিনবার ঘি মাখে। প্রতিবার ঘি মাখার পর পানি ঢালা হয়। স্নানের পর ভেজা কাপড় ফেলে আরেকটি নতুন ছয় হাত লম্বা সাদা মার্কিন কাপড় দিয়ে মরদেহ ঢেকে ফেলা হয়। শাঁখারী ও গোয়ালারা শব স্নানে সাবান ব্যবহার করে না। এক কলস পানি মৃতের মাথা থেকে পা, পা থেকে মাথা, আবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেলে মৃতের স্নান সম্পন্ন করে। শাঁখারীরা স্নানের পর

Dhaka University Institutional Repository

শবদেহে ঘি মাখে। গোয়ালারা স্নানের পর পরই এক খিলি পানের মধ্যে একটু সোনা-রূপা ভরে মৃতের মুখে গুঁজে দেয়।[৮৫] এরপর মৃতকে ভেজা জামা কাপড়সহই চিতায় তোলা হয়।

সনাতন হিন্দু ধর্ম অনুসারে মৃতের সৎকার করা হয় তিন ভাবে এক, পানিতে ভাসিয়ে দুই, সমাহিত করে তিন, দাহ করে। সাধারণতঃ সর্প দংশিতদের পানিতে ভাসানোর নিয়ম রয়েছে। জেমস ওয়াইজ তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, ঢাকার সাধারণ বাওলা[৮৬] ও বৈষ্ণব[৮৭] গোষ্ঠীজাত জগৎমোগিনীরা মরদেহ ভাসিয়ে দেয় নদীতে। বৈরাগীদের মাঝেও মরদেহ দাহ, সমাহিত ছাড়াও নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার প্রথা আছে। তবে আত্মীয় স্বজন ধনী থাকলে অথবা মৃতের বহু সংখ্যক শিষ্য থাকলে তার সমাধিস্থলে একটি আখড়া প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৮৮] জেমস টেলর লিখেছেন- 'গ্রাম ও শহর উভয় স্থানে যে সকল ব্যক্তি চিতার খরচ যোগাতে অক্ষম তারা মৃতদেহ নদীতে ফেলে দেয়।[৮৯]

প্রবাদ আছে- ' যারা কৃষ্ণ নামে জ্বলে, তাকে আর জ্বালাতে হয় না।'[৯০] যারা পার্থিব জীবনের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করেছে এরূপ সাধু-সন্ন্যাসী-সংসার ত্যাগী ব্যক্তিকে দাহ করার বিধি নাই, তাদেরকে সমাহিত করা হয়। এছাড়া বার বছরের নিচে শিশু-কিশোর আর মৃত্যুর পূর্বে কেহ সমাহিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাকেও সমাহিত করার নিয়ম রয়েছে। তবে দশ-বার বছরের শিশু স্বাস্থ্যবান হলে কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞাতিদের সিধান্ত অনুযায়ী তাকে দাহ করা হয়।[৯১] সাধু-সন্ন্যাসীদের উপবেশন অবস্থায় আর অন্যদের শুইয়ে সমাহিত করা হয়ে থাকে।

উনিশ শতকে জেমস ওয়াইজ যোগী সম্প্রদায়ের শেষকৃত্য অনুষ্ঠান সম্পর্কে বর্ণনা রেখে গেছেন। তার বর্ণনা অনুযায়ী, 'যোগীদের সমাহিত করতে খোলা জায়গায় প্রায় আট ফিট গভীরে গোল করে কবর খোঁড়া হয়। কবরের নিচের দিকে কুলুঙ্গির মত করা হয়, সেখানে রাখা হয় শবদেহ। সাতটি ঘটির জল দিয়ে মৃতদেহকে স্নান করিয়ে কাপড় দিয়ে প্যাচানো হয়। মুসলমানদের সাথে পার্থক্য করার জন্য আগুনের স্পর্শ লাগানো হয় ঠোঁটে। গলায় জরানো হয় তুলসীর মালা, আর ডান হাতে দিয়ে দেয়া হয় একটি জপ মালা। বাহু ভাঁজ করে রাখা হয় বুকের ওপরে। বুদ্ধের মূর্তির মত ভাঁজ করে রাখা হয় পা। বাঁ দিকের ঘাড়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয় একটি থলে, তাতে থাকে চারটি কড়ি। সমাধিতে মৃতদেহ নামাবার পর মুখ ঘুরিয়ে দেয়া হয় উত্তর-পূর্ব দিকে। এরপর মাটি দিয়ে ভরাট করা হয় সমাধি। তারপর বুকের ওপর রাখা হয়

Dhaka University Institutional Repository

একটি বড় মালা। পিন্ড হিসাবে রাখা হয় ভাত ভর্তি একটি বাটি। সমাধির ওপর লাগানো হয় একটি গাছ। সমাধির মধ্যে দেয়া হয়, পান-সুপারি, ছিলিমযুক্ত একটি হুঁকা, কিছুটা তামাক আর সামান্য কাঠ কয়লা। সবশেষে বিশ্ব-মাতার সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে কবরের ওপর ছড়িয়ে দেয়া হয় সাতটি কড়ি। একইভাবে কবর দেয়া হয় মেয়েদেরও।

এই যে চারটি কড়ি রাখা হয়, আর একটি বিশেষ দিকে শবদেহ রাখা হয়, এর একটি বিশেষ কারণ আছে। বৈতরণী নদী অতিক্রমের সময় তার আত্মা যাতে নৌকার ভাড়া দিতে পারে সেই জন্যে এই ব্যবস্থা। আর শবদেহ উত্তর-পূর্ব দিক করে শোয়ানোর কারণ হচ্ছে শিবের স্বর্গ–কৈলাশে অবস্থিত পৃথিবীর উত্তর-পূর্ব দিক।[৯২] যোগীদের যেমনভাবে সমাধিস্থ করা হয় এদের মোহন্তদেরও তেমনি। আবার, মৃত্যুর পর শিষ্যরা আখড়া প্রতিষ্ঠা করে সমাধির ওপর।'[৯৩]

জেমস ওয়াইজ আরো লিখেছেন- 'যোগী সাধুদের মত বসার ভঙ্গীতে স্পষ্টদায়ক গোষ্ঠীদেরও সমাহিত করা হয়। মাথা জড়ানো হয় হরি ছাপ আঁকা নামাবলী দিয়ে। কৌপিন দিয়ে জড়ানো হয় দেহ। হাত ভাঁঝ করে রাখা হয় বুকের উপর। গলায় দেয়া হয় মালা। সমাধিতে দেয়া হয় একটি নারকেল, একটি থলি, আর একটি ডান্ডি। মৃত ব্যক্তি যদি খুব মর্যাদাবান হন তাহলে তার সমাধিতে প্রতিদিন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান চলতে থাকে। কোনো দৈব দুর্বিপাকে পড়লেই তার আত্মার আবাহন করা হয়।[৯৪]

সন্তদের মরদেহ যোগীদের মত সমাধির ভেতর বসিয়ে রাখার নিয়ম নাই। তবে, একেবারে সাধারণ শ্রেণীর হলে তার দেহ দাহ করা হয়।[৯৫] সাধারণত চামাররা মৃতদেহ কবর দেয়। স্বামীকে যেখানে কবর দেয়া হয়েছে স্ত্রীকে কবর দেয় তার পাশে, যদি সে একই মন্ত্র জানে। তা না হলে স্ত্রীর মৃতদেহ দাহ করা হয়।[৯৬] এছাড়া গোঁসাইদের মরদেহ সমাহিত করা হয়।'[৯৭]

মৃত শিশুকে শ্মশানে নেয়ার সময় সুন্দর কাপড় পরিধান করানো হয়। ধোপারা অবশ্য সাদা মার্কিন কাপড় পরায়। ঋষিরা স্নান ও মুখাগ্নি সম্পন্ন হবার পরই মৃত শিশুকে সমাহিত করে থাকে। শ্মশানে বেদীর উপর মৃত শিশুর মুখাগ্নি করে শিশুর পিতা। সমাধির দৈর্ঘ্য মৃতের সাড়ে তিন হাত সমান, গভীরতা ডের-দুই হাত। সমাধিস্থ করার পূর্বে মৃতের পরিধেয় বস্ত্র খুলে ফেলা হয়। সমাধির ভেতর ছেলেদের উপুর আর

মেয়েদের চিৎ করে উত্তরে মাথা, দক্ষিণে পা দিয়ে শোয়ানো হয়। অনেকেই সমাধির ভেতর দিয়ে দেয় এক প্রস্থ কাপড়, সাথে ফুলের মালাও। এছাড়া তুলসী গাছের মাটি তো দেয়া হয়-ই। বৈষ্ণব অনুসারীরা সোয়া কেজি লবন, সোয়া কেজি চিনি, তুলসী গাছের মাটি একসাথে মিশিয়ে সবাই একমুঠো করে সমাধির ভেতর মরদেহের উপর ছিটিয়ে দেয়। সবশেষে সমাধি মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়। সমাধির উপর মৃতের শিয়রের কাছে রাখা হয় আম্রপল্লব, তুলসীর ডাল, জলপূর্ণ মাটির ঘট, দুটো মিষ্টি, দুধের প্যাকেট (যে শিশুর মুখে ভাত দেয়া হয়নি), পান- সিগারেট[৯৮]। সমাধির উপর ফুলের মালা রেখে গোলাপজল ছিটানো হয়। এরপর জ্বালানো হয় আগরবাতি-মোমবাতি। অনেকে সমাধির চারপাশ ইটের ঘেরাও দিয়ে রাখে। পূর্ণবয়স্কদেরও একই নিয়মে সমাহিত করা হয়। তবে আগুনে পুড়ানো মৃত ব্যক্তির অনুরূপ তাদের গোসল, মুখাগ্নিসহ প্রয়োজনীয় আচার সম্পন্ন হবার পর।

হিন্দুদের মধ্যে যে সমস্ত মেয়েদের সন্তান পেটে থাকা অবস্থায় মৃত্যু ঘটে, তাদেরকে দাহ করার পূর্বে পেট কেটে মৃত সন্তান বের করে আনা হয়।[৯৯] মৃত শিশুকে শ্মশানে স্নানের পর সমাধিস্থ করে থাকে।[১০০]

ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে দাহ প্রথাই সর্বাধিক প্রচলিত। এই প্রথায় মৃতদেহ দাহ করা হয় চিতার আগুনে। বৈদিক নিয়মানুযায়ী মৃতকে দেবলোক বা স্বর্গলোকে পাঠাতে হলে দেবতাদের পুরোহিত অগ্নিকে আহুতি দিতে হয়। অগ্নিদেবতাই সে অর্চনা বা আহুতি দেবলোকে নিয়ে যায়। প্রাণবায়ু বর্হিগত হয় মুখ দিয়ে তাই বৈদিক আমল থেকে অদ্যাবধি মুখাগ্নির প্রচলন চলে আসছে।

চিতায় পুরুষদের উপুর এবং নারীদের চিৎ করে শায়িত করার বিধি।[১০১] মাতৃগর্ভ থেকে পুত্র সন্তান উপুর আর কন্যা সন্তান চিৎ হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। এর আলোকেই এই রীতি পালিত হয়ে থাকে।[১০২] দাহ কার্যের জন্য ছয়-সাত মণ লাকড়ি লাগে। মুখমন্ডল ব্যতিরেকে চিতায় শবের উপর আরো মন খানেক লাকড়ি দেয়া হয়। সামর্থ্য অনুযায়ী চিতার চারপাশে দেয়া হয় কিছুটা চন্দন কাঠ আর ঘি। এছাড়া কেউ কেউ চিতাতে আম কাঠ বা আমের ডাল, বেল গাছের ডাল, পাটখড়ি, মধু, তিল ও যব দিয়ে থাকে। ঋষিদের অনেকেই মরদেহ পরিশুদ্ধ করতে 'আসমনের জল' ছিটায়। সেইসাথে মুখাগ্নিকারীও নিজ শরীরে আসমনের জল ছিটিয়ে নেয়। শ্মশানে মৃতের উদ্দেশ্যে পিন্ডদান করে থাকে সাহা, শাঁখারী ও ঋষিরা। এই আচারটি পালিত হয় মূলত: শবদেহ চিতায় তোলার পর পরই। ঢাকার শাঁখারীদের ভাষায় একে

Dhaka University Institutional Repository

চিতাপুরুব, ঋষিদের ভাষায় ঘাটপিন্ড এবং সাহারা বলে ভুজ্জি পিন্ডদান। পিতলের মালসার মধ্যে সাহা'রা চিনি গুড়া চাল, কলা, কাঁচাদুধ একসাথে মিশিয়ে কলার খোলে গোল করে তিনটি পিন্ড তৈরি করে তিনটি-ই দান করা হয় মৃতের উদ্দেশ্যে। শাঁখারীদের তৈরিকৃত পিন্ডতে চাল, কলা, ঘি, মধুর ব্যবহার দেখা যায়। শাঁখারীরা তিন বা পাঁচটি পিন্ডের মধ্যে একটি মৃতের উদ্দেশ্যে আর বাকিগুলো বিভিন্ন দেবতাদের নামে উৎসর্গ করে। পক্ষান্তরে, ঋষিরা ভিজানো আতপচাল, কলা, কাঁচাদুধ ও চিনির সহযোগে বানানো পাঁচটি পিন্ড মৃত ব্যক্তি সহ তার পূর্বপুরুষদের নামে দান করে থাকে। পিন্ড তৈরির সময় পিন্ডদানকারী মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রাহ্মণের সাথে মন্ত্র পাঠ করে। মন্ত্র পড়া শেষ হলে সে কলার খোলে রাখা পিন্ডটি নদীর ঘাটে নিয়ে যায়। মৃতের অন্য পুত্ররা এসময় তার সাথেই থাকে। পিন্ডটি নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত কোন প্রকার কথা বলা নিষেধ।

ধোপাদের রীতি অনুযায়ী, চিতায় রাখা মৃতের শিয়রের সামনে দাড়িয়ে বড়ছেলে একটি মাটির খরা বা কলাপাতায় ঘি, তেল, যব, মধু একত্রে মিশায়। এরপর হাত দিয়ে পাঁচবারে সমস্ত মিশ্রণটি মৃতের মুখে দেয়। তখন উপস্থিত সবাই ব্রাহ্মণের সাথে মন্ত্র পড়তে থাকে। ঢাকায় উচ্চবর্ণের হিন্দুস্তানী ব্রাহ্মণদের শবদাহ করার আগে মৃতদেহের হাতে যবের দানা গুঁজে দেয় কাঁথা ব্রাহ্মণ।[১০৩]

জ্যেষ্ঠপুত্র জলন্ত পাটকাঠির আগুন মৃতের ঠোটে ছুইয়ে মুখাগ্নি করে। ধোপা, গোয়ালা ও ঋষিরা তাদের প্রথা মাফিক মুখাগ্নির জন্য ডোমের কাছ থেকে আগুন কিনে নেয়। সেজন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ টাকা-কড়ির প্রদানের পাশাপাশি শ্রাদ্ধের দিন সর্বপ্রথম ডোমকে খাইয়ে মৃতের পরিবার ঋণমুক্ত হয়। মুখাগ্নির পর জলন্ত পাটকাঠি হাতে নিয়ে জ্যেষ্ঠপুত্র চিতার চারপাশ পাঁচ, সাত বা চৌদ্দবার প্রদক্ষিণ করে। প্রতিবার ঘুরে এসে মৃতের ঠোটে আগুন ছোঁয়ায়। এরপর শ্মশানবন্ধুরা সবাই মৃতের চিতায় আগুন, কেউ কেউ আবার লাকড়িও দেয়। অনেকের মতে, সৎ লোকের চিতার আগুন ভালোভাবেই জ্বলে। অপরপক্ষে, মন্দ লোকের চিতায় বহু ঘি ঢালার পরও আগুন ঠিকমত জ্বলে উঠে না।[১০৪] প্রচলিত ধারণায়, 'আজোইতা মরা' অর্থ্যাৎ অশুভ হাওয়া বাতাস লেগে মৃত্যু ঘটলে সেই শব দাহের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।[১০৫] চিতায় শবকে সঠিকভাবে প্রতিস্থাপন করার জন্য পূর্বে একটি নতুন বাঁশ হাতের কাছে রাখা হত।

চিতায় আগুন জ্বলতে থাকলে মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে শ্মশানে আগত সবাইকে পরোটা-মিষ্টি অথবা চা-বিস্কুট/ পাউরুটি/ নিমগুকা রুটি খাওয়ানো হয়। পূর্বকালে অবশ্য শ্মশানবন্ধুদের চিরা-গুড় খেতে দেয়া হত। ঋষিদের মধ্যে বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যুতে নাতনি জামাইরা নেকি লাভের উদ্দেশ্যে শ্মশানে আমোদ-ফূর্তির ব্যবস্থা করে থাকে। তাদের পক্ষ থেকে শ্মশানে আগতদের চা-পান-সিগারেট-মদ খেতে দেয়া হয়। এসময় কীর্তনকারীরা ঢোল-হারমোনিয়াম বাজিয়ে শ্মশানে কীর্তন করতে থাকে। মৃতের সন্তানরা অবশ্য চিতার আগুন জ্বলার সাথে সাথে মৃতের সৎগতির জন্য প্রার্থনা শুরু করে দেয়। মৃতের পা বরাবর জ্বলন্ত চিতা থেকে খানিকটা দূরে বসে করজোড়ে বলে- 'হে অগ্নি দেবতা, তাকে স্বর্গে নিয়া যায়ো। যা পাপ করছে মাফ কইর‍্যা দিও। তারে উদ্ধার কইরো।'[১০৬] একই সাথে 'হরে কৃষ্ণ', 'হরে রাম' জপও চলতে থাকে।

চিতায় শবদেহ ভূস্মীভূত হলে মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্র নদী থেকে কলস ভরে পানি এনে চিতা ঠান্ডা করে। এরপর মৃতের অন্যান্য ছেলে এবং শ্মশানবন্ধুরা সবাই চিতায় পানি ঢালে। এক্ষেত্রে ধোপাদের নিয়ম একটু ভিন্ন। ধোপাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র মাটির কলস থেকে পাঁচ অঞ্জলি পানি ভূস্মীভূত চিতার উপর ছিটায়। সেইসাথে করজোড়ে মৃত মা/বাবার জন্য দোয়া করে- 'হে ভাগবান, তু উসকা আতমাকো শান্তি কারে। উসকো স্বর্গবাসী কারে। জান্তে-অজান্তে যো গোনা কারিসে সাব মাফ কার দিয়ে।'[১০৭] এরপর শ্মশানবন্ধুরা সবাই ভগবানের নাম নিয়ে পানি ঢেলে চিতা ঠান্ডা করে। একই সাথে মৃত ব্যক্তির মুক্তির জন্য চিতার সম্মুখে দাড়িয়ে প্রার্থনা করা হয়।

মৃতের নাভিস্থল ও মাথার খুলি ভূস্মসাৎ হয় না। হিন্দুরা সেগুলি বিসর্জন দেয় গঙ্গাতে। শাস্ত্রে আছে, মৃত ব্যক্তির অস্থি যতদিন পর্যন্ত গঙ্গায় থাকে, তত সহস্র বৎসর পর্যন্ত সেই মৃত ব্যক্তি স্বর্গবাস করে।[১০৮] পৌরানিক কাহিনী থেকে জানা যায় যে, অযোধ্যার রাজা সগরের ষাট হাজার পুত্র ও প্রজাগণ পাতালে কপিল মুনির অভিশাপে ভস্মে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে সগর বংশের উত্তর পুরুষ ভগীরথ গঙ্গাকে সন্তুষ্ট করে পাতালে নিয়ে যান। সেখানে ভগীরথ গঙ্গার জলস্পর্শে ভগীরথের পূর্বপুরুষদের দেহভস্ম ধুয়ে মুছে যায় এবং তার মুক্তি লাভ করে দিব্যধামে গমন করেন। সেই থেকে সনাতনীরা দাহকৃত মৃতদেহের ভস্মীভূত অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে থাকেন। হিন্দুরা বিশ্বাস করে, এতে মৃতের সদগতি লাভ হবে।[১০৯] ভস্মীভূত চিতার ছাই থেকে বের করে আনা নাভিস্থল ইটের সাথে দরি দিয়ে বেঁধে গঙ্গায় ডুবিয়ে দেয়া

Dhaka University Institutional Repository

হয়। ডুবানোর সময় পুত্র সন্তানও ডুব দিয়ে থাকে। অনেকেই মাথা খুলি একটি কাপড়ে পেঁচিয়ে বাসায় নিয়ে আসে। টবের এক পাশের মাটিতে মাথার খুলি আর অন্য পাশে তুলসী গাছ লাগানো হয়। মৃতের ছেলেরা মাস খানেক অথবা বছর খানেক এর কাছে এসে আরাধনা করে। এক বছরের মানত করলে সেবছর শুধু নিরামিষ খেয়ে থাকতে হবে। মৃতের কন্যারাও আরাধনা করতে পারে, তবে এটা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। মানত সম্পন্ন হবার পর আনুষ্ঠানিক আরাধনারও সমাপ্তি ঘটে। মৃতের পরিজনরা গয়া, কাশি ও বৃন্দাবনে তীর্থ যাত্রাকালে অস্থিটি গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়ে আসে।

চিতার ভস্মীভূত ছাই একত্রে তুলে জ্যেষ্ঠপুত্র অথবা শ্মশানের ডোম নদীতে নিক্ষেপ করে। কেউ কেউ চিতার ছাই মাটির ঘটিতে ভরে বাসায় নিয়ে যায় সময় ও সুযোগমত গঙ্গা নদীর জলে বিসর্জন দেয়ার জন্য। চিতার স্থানটি নদীর পানি দিয়ে ধুয়ে সেখানে আগরবাতি-মোমবাতি জ্বালানো হয়। চিতার শিক সাজানো হয় ফুলের মালা দিয়ে। নাতিদের দান করা ছাতাগুলো চিতার শিকে দরি দিয়ে বেঁধে দেয় ঋষিরা। তারা সেখানে পান, সিগারেট ও দুটো মিষ্টিও রাখে।[১১০] হিন্দুরা শবের সাথে শ্মশানে আনা তুলসী গাছ চিতার সামনে রেখে আসে। এছাড়া হিন্দুদের কেউ এক গ্লাস কেউবা এক কলস পানিও চিতার কাছে মৃতের শিয়রের সামনে রাখে। ঢাকার হিন্দুরা বিশ্বাস করে, মৃতের আত্মা পিপাসার্ত হলে সেখান থেকে পান করে তৃষ্ণা মিটাতে পারবে। সাহা ও ঋষিরা মৃতের শিয়রের কাছে শ্রাদ্ধাবধি প্রত্যেহ রাত্রে জলপূর্ণ একটি গ্লাস রেখে দেয়। অন্ধকার রাত্রে তৃষ্ণার্ত মৃতাত্মা যাতে গ্লাসটি দেখতে পায় সেজন্য গ্লাসের পাশে একটি মোমবাতিও জ্বালিয়ে রাখা হয়। ঋষিদের প্রথা মাফিক, জ্যেষ্ঠপুত্র শ্মশান থেকে বের হবার সময় পিছনে রাখা জলপূর্ণ মাটির কলসে বাম হাত দিয়ে দাঁ-এর আঘাতে ফুটো করে। অন্যদিকে শাঁখারীরা মাথা নিচু করে দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে পিছনে রাখা জলপূর্ণ কলসে আঘাত করে থাকে। শ্মশান থেকে বের হবার সময় পিছন ফিরে তাকানো নিষেধ। পথিমধ্যে ডোমের দেনা-পাওনা মিটিয়ে ফেলা হয়। আগুন দিয়ে মৃতকে পার করানোর জন্য ডোমকে মৃতের পরিজন টাকা প্রদান করে। শ্মশানবন্ধুরাও সবাই যার যার সামর্থ্যের আলোকে দাক্ষিণ্য দিয়ে থাকে। ঋষিরা অবশ্য টাকা-পয়সা ছাড়াও 'পারের কড়ি' হিসেবে ডোমকে দেয় পাঁচটি কড়ি। সাহা'রা ভস্মীভূত চিতার পাশে মৃতের শিয়রের দিকে পাঁচটি কড়ির উপর স্থাপন করে একটি জলপূর্ণ মাটির কলস। জল পবিত্র করতে কলসের ভেতর তুলসী গাছ রাখা হয়। উদ্দেশ্য পবিত্র জল পান করে মৃতাত্মার তৃপ্তি লাভ। শ্মশান থেকে প্রস্থানকালে ডোম মৃতের পুত্রদের শ্মশান ত্যাগের মন্ত্র পাঠ করায়। মন্ত্র পাঠের পর পরই ডোম দক্ষিণ্য গ্রহণ করে পুত্রদের বিদায় জানায়।

Dhaka University Institutional Repository

মৃতের সৎকার শেষে শ্মশান থেকে সবাই চলে যায় নদীর ঘাটে। শ্মশানবন্ধুরা স্নান সেরে ভেজা কাপড়ে বাড়ি ফিরে। ঋষিরা ঘরে প্রবেশকালে একটু আদা মুখে দিয়ে, সমস্ত শরীরে তুলসী পাতার জল ছিটায়। এরপর লোহাতে কামড় দিয়ে নেয়। অপরপক্ষে, সাহারা বাড়ি ফিরে ঘরে ঢোকার পূর্বেই ভেজা কাপড় পাল্টে ফেলে। ঘরের প্রবেশদ্বারে আগুন জ্বালানো হলে, এর তাপে হাত-পা-কান সেকে নেয়। প্রথমে নোড়া, তারপর লোহাতে কামড় দিয়ে, সবশেষে একটু তিতা অর্থাৎ শুকনো পাট পাতা মুখে দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার নিয়ম। শাঁখারীরা ঘরে ঢোকার সময় লোহার দাঁ/বঠির একপ্রান্তে মোমবাতি বা অন্য কোন উপায়ে আগুন জ্বালায় এবং আরেক প্রান্তে সামান্য পরিমান লবন রাখে। আগুনের তাপে হাত-পা সেকে একটু লবন মুখে দিয়ে শাঁখারীরা ঘরে প্রবেশ করে। প্রচলিত বিশ্বাসের আলোকে, এতে করে সকল প্রকার অপশক্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

মৃতের পুত্ররাও সৎকার সম্পন্ন করে নদীর ঘাটে গিয়ে স্নান করে। সাহা, শাঁখারী ও ঋষি পুত্ররা স্নান শেষে পরিধেয় বস্ত্র ফেলে দিয়ে সেলাইবিহীন দুই খন্ড সাদা মার্কিন বস্ত্র পরিধান করে থাকে। সাহা'রা বাড়ি ফিরে পরিধেয় ভেজা বস্ত্র পাল্টে সাধারণ বস্ত্র পরিধান করে। চতুর্থ দিন থেকে ঘাটকাম পর্যন্ত তারা পরিধান করে দুই খন্ড সাদা বস্ত্র। বাড়ি ফেরার পূর্বে সাহা'রা ঘটি ভরে নদীর জল নেয়। অশুচ সময়ে এই জল পান করার নিয়ম। বর্তমানে নদী দুষণ এই নিয়ম পালনে ব্যত্যয় ঘটাচ্ছে। শাঁখারীরা ভাগিনা ও সর্বকনিষ্ঠ জ্ঞাতিকে সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। ভাগিনা ও সর্বকনিষ্ঠ জ্ঞাতি মৃতের বাড়িতে জল পান না করা পর্যন্ত মৃতের সকল পুত্রদের খাদ্য ও পানাহার করা নিষেধ।[১১১] মৃতের ছেলেরা তাদেরকে নিজ হাতে জল পান করায়। গোয়ালারা একটি নতুন মাটির কলসে নদী বা পুকুরের জল ভরে নিয়ে ফেরার পথে আদা ও গুড় কিনে। ঘরে ঢোকার আগে বাড়ির উঠোনে বসে কলসের জলে গুড়, আদা ও গোলমরিচের গুড়া মিশিয়ে তৈরি করা হয় শরবত। মৃতের পরিজনরা শরবত পান করার পূর্বে একটু মাটিতে ফেলে নিয়ম পালন করে থাকে।[১১২] ধোপারা সৎকারের পর বাড়ি ফিরে আগুনের তাপে ভেজা কাপড়সহ হাত-কান সেকে নেয়। এসময় মৃতের পরিজন, শ্মশানবন্ধু ও আত্মীয়স্বজন কর্তৃক আরগাসান নামক একটি ক্রিয়াকর্ম সংগঠিত হয়। এতে মৃতের উদ্দেশ্যে চিরা-গুড় ভোগ দেয়ার নিয়ম। একটি নতুন মাটির হাঁড়িতে সবাই একমুঠো চিরা আর খানিকটা গুড় দিয়ে বলে- 'ভাগবান উসকা আত্মাকো শান্তি কারে।'[১১৩] এর পূর্বে সবাই দাঁত দিয়ে নিমপাতা ছিঁড়ে। মহিলারাও এই আচার পালনে বিরত থাকে না। পুরো হাড়ি ভরে গেলে

Dhaka University Institutional Repository

সেটি নিয়ে বড়ছেলে নদীর ঘাটে চলে যায়। তার সাথে অন্য ভায়েরাসহ আরো দুই-চার জন লোক তো থাকেই। বড়ছেলে নদীতে হাড়িটি ভাসিয়ে দিয়ে বলে- 'মেরা বাপ/মাকা শান্তি কিলে মায়নে এইঠো দিয়া।'[১১৪] এরপর হাত দিয়ে নদীতে ভেসে থাকা হাড়ির দিকে তিনবার পানিতে ঢেউ তোলা হয়। শেষে নদীকে নমস্কার করে ফিরে আসে। এসময় কেউ পিছন ফিরে তাকায় না।

ঋষিরা শ্মশানঘাট থেকে ফিরে এসে বাড়ির ভিতর একটি জায়গায় ইটের ঘের দিয়ে তাতে মাটি ফেলে 'চিতা' তৈরি করে। এতে ছিটানো হয় সরিষার বীজ। চিতার চারকোনায় চারটি খুঁটি গেড়ে এর মাঝখানে দরি দিয়ে বেঁধে একটি মাটির টোপা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। মৃতের ছেলেরা ও তাদের স্ত্রীরা প্রতিদিন সকালে নদীর ঘাট অথবা ঢাকেশ্বরী মন্দিরে স্নান সেরে সেখান থেকে ঘটি ভরে জল নিয়ে আসে। ঘরে ঢোকার আগেই ঘটির জল ছিটিয়ে দেয়া হয় চিতার চারপাশে। টোপার মধ্যেও কিছুটা জল ঢালা হয়। দুই-তিন দিনে সরিষার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বাড়তে থাকে। ধারণা করা হয়, এই চিতা অশুচকালে বিপদাপদে ত্রাতা হিসেবে কাজ করে। এসময় মৃতের পরিজনদের কেউ অসুস্থ্য হলে চিতার মাটি তার কপালে ছুঁইয়ে দেয়া হয়। সংসারে সুখ-শান্তি বজায় থাকতে চিতার সামনে ভক্তি সহকারে প্রণাম করে মৃতের পরিজনরা।

দাহের দিন মৃতের বাড়িতে চুলা জ্বালানো নিষিদ্ধ। এসময় আত্মীয়স্বজনেরা ফলমূল সহ নানা রকম খাবার মৃতের বাড়িতে পাঠিয়ে থাকে। মৃত্যুর পরের দিন থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত ভাত-ডাল-নিরামিষ ইত্যাদি রান্না হলেও মৃতাশৌচ পালনকারী এই খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। হিন্দুদের মধ্যে মৃতাশৌচকালে বিশেষ কিছু নিয়ম পালনের রীতি আছে। মৃতাশৌচকাল হল মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ অন্তবর্তী সময়কাল। একে ঢাকার সাহা'রা 'আবশ্যিক', ঋষিরা 'আভাস', গোয়ালারা 'আভভিস', শাঁখারীরা 'ওভিস' এবং ধোপারা 'আরগাসান' বলে থাকে। এটা জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্য অবশ্য পালনীয় তবে মৃতের স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ আর কন্যাদেরও পালন করতে দেখা যায়। মৃতের বিবাহিত কন্যাদের গোত্রান্তরের কারণে (বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অন্য জাতে চলে যাওয়ায়) নিয়ম পালন করতে হয় 'তেরাত্র' (তিনরাত)। ঢাকার হিন্দুরা শ্রাদ্ধশান্তি পর্যন্ত মৃতের ঘর জনশূণ্য রাখে না। সর্বক্ষণ সেই ঘরে পরিবারের কোন না কোন সদস্য অবস্থান করে। মৃতের ছেলেরা মূলতঃ মৃতাশৌচকালটি এই ঘরেই পালন করে থাকে। এই সময় পালনকারী সব রকম বাহূল্য পরিত্যাগ করে চলে। এক কাপড়ে ও নগ্ন পায়ে থাকে। তাদের মাথার চুল আঁচড়ানো ও দাঁত মাজা নিষেধ। তারা তেল সাবানসহ সকল প্রকার প্রসাধন সামগ্রি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে। পায়খানা

Dhaka University Institutional Repository

করে এসে প্রতিবার স্নান সেরে ঘরে ঢোকার নিয়ম। স্নানের পর ভিজা কাপড় গায়ে শুকাতে হয়।[১১৫] চৌকি বা বিছানার পরিবর্তে বালিশ ছাড়া মাটিতে ঘুমায়। শীতকালে মাটিতে খের বিছানো হয়। ধনীরা অবশ্য সতরঞ্জি বিছায়। যারা বালিশ ছাড়া ঘুমাতে পারে না, তারা খেরের বালিশ ব্যবহার করতে পারে। মৃতের ছেলেরা এসময় চুল, দাড়ি, নখ কাটে না। যেখানে বসবে কুশাসন বিছিয়ে নেবে। এসময় ভয় পাওয়ার একটি সম্ভাবনা থাকে তাই ভয় এড়াতে গলায় লোহার চাবি ঝুলিয়ে রাখার রীতি। কাপড়ের ফিতায় লোহার চাবি দেয়া মালাটিকে ঢাকার হিন্দুদের কাছে 'দরা' নামে পরিচিত। ঢাকার ধোপা ও গোয়ালাদের মধ্যে অবশ্য কুশাসন ব্যবহার এবং দরা পরার নিয়ম নেই।

এসময় কেউ কেউ একবার, অধিকাংশই দুইবার তবে গোয়ালারা তিন বার খেয়ে থাকে। কলাপাতায় খাওয়ার নিয়ম। কলাপাতা না পেলে কাঁসার থালায় খাবে। অতীতে পাথরের খাদায় খাদ্য গ্রহণের কথাও জানা যায়। প্রথানুযায়ী, প্রতিদিন কাককে খাইয়ে মৃতাশৌচকারীরা খাদ্য গ্রহণ করে। কোন কারণে কাক না খেলে সেবেলা তারা খেতে পারবে না। গোয়ালারা প্রতিবেলার খাবার কাক-কুকুর-বিড়ালদের দিয়ে তারপর খায়। প্রচলিত বিশ্বাস, মৃতের আত্মা পশু-পাখির বেশে এই সকল খাবার খেয়ে যায়। মৃতাশৌচকারী-পুত্র যারা পিতা/মাতার জীবিতাবস্থায় তাদের সাথে দুরব্যবহার করেছে, সেই পুত্রদের খাবার রাগ করে পশু-পাখি খায় না। অনেকে ভয় পেয়ে এই সময় কাকের কাছে মাফ চায়। মৃতাশৌচকারীদের খাওয়ার সময় কোন প্রকার বাঁধা পরলে অর্থাৎ কেউ কথা বললে বা তাদের ডাকার উদ্দেশ্যে কেউ ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলে তারা আর খেতে পারবে না। সেবেলা তাদেরকে না খেয়েই থাকতে হবে। যারা একবেলা খায়, সেদিন তারা না খেয়ে থাকবে। খাবারে ময়লা বা চুল পাওয়া গেলে পরিবেশনকারীকে কুচক্রি মনে করা হয়।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মৃতের পুত্ররা নদী বা পুকুরে স্নান করতে চলে যায়। স্নান শেষে শাঁখারী, ঋষি ও ধোপারা ঘটি ভরে নদী বা পুকুরের জল নিয়ে ফিরে। বাড়ি ফিরে মৃতের ঘরের চৌকাঠের উপর শাঁখারী পুত্ররা একটি ঘট বাঁধে। প্রতিদিন সকালে স্নান করে ঘরে প্রবেশকালে তারা ঘটের ভেতর নদীর জল ঢালে। পরদিন সকালে আবার স্নান যাত্রাকালে ঘটে রাখা জল অন্য একটি পাত্রে ঢেলে নিয়ে নদী বা পুকুরে ফেলা হয়। অপরপক্ষে, সাহা'রা ঘরের দুই পাশের চৌকাঠে দুটি মাটির ঘট বাঁধে। ডান দিকের ঘটে ঢালা হয় কাঁচা দুধ এবং বাম দিকের ঘটে নদীর জল। ঋষিদের মধ্যে ঘরের সামনে ও পিছনে

Dhaka University Institutional Repository

মোট চারটি ঘট বাঁধার রীতি। ঋষি পুত্ররা স্নান করে বাড়িতে ফিরে এসে প্রথমে চিতায় জল ছিটায়। এরপর ধুপবাতি জ্বালিয়ে কয়েক বার চিতার উপর ঘুরায়। শেষে ঘরের সামনে ও পিছনে সবকটি ঘটের ভেতর পানি ঢেলে ঘরে প্রবেশ করে। পুত্ররা ঘরে ঢুকে তাদের জন্য কাঁটা ফলমূল থেকে সবরকম একটু করে কলার খোলে কাকের জন্য তুলে নেয়। সেটি নিয়ে চলে আসে বাড়ির ছাদে বা উঠানে। গলায় গামছা পরে করজোড়ে অনুনয়-বিনয়ের সাথে কাককে ডাকে- 'আসো, আসো কাকাতুয়া। আসো বাবা/মা। আমরা তোমাকে আরাধনা করে ডাকব। তুমি দয়া করে এসো কিন্তু।'[১২৪] তবে বর্তমান সময়ে কাক ডেকে খাওয়ানোর রীতিতে ব্যত্যয় দেখা যায়।

ধোপারা তাদের প্রথানুযায়ী, পরদিন সকালে স্নান শেষে ফেরার পথে দোকান থেকে হালুয়া, পুরি ও দুধ কিনে নিয়ে আসে। বাড়ির উঠানে একটি স্থানে ইটের ঘেরাও দিয়ে এর মধ্যে বালি ফেলা হয়। মৃতের পরিজনরা সবাই এখানে পুরি, হালুয়া ও কাঁচা দুধ দান করে থাকে। এছাড়া মৃত ব্যক্তির ঘরের সামনে পাটখড়ির একটি ছোট্ট ঘর তৈরি করা হয়। ঘরের মাঝে একটি টোপা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। খাদ্য গ্রহণকালে সকল প্রকার আহার্য থেকে একটু করে টোপায় রাখার নিয়ম। এই খাবার পশু-পাখি খেলে ধরে নেয়া হয় মৃতের আত্মা পশু-পাখির বেশে খেয়ে গেছে।[১১৭] সেদিন মৃতের পুত্র আর তাদের স্ত্রীরা চিরা-গুড় খেয়ে থাকে। তৃতীয় দিনে ধোপারা মৃত ব্যক্তি যে ঘরে বা স্থানে দেহ ত্যাগ করেছে সেখানে একটি চুলা তৈরি করে। মৃতের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ সেই চুলায় পাটখড়ির আগুনে পোলাও চাল ও দুধ সহযোগে ক্ষীর রান্না করে। নাওবার অর্থাৎ শ্রাদ্ধের আগের দিন পর্যন্ত নতুন হাঁড়িতে ক্ষীর রান্না করে মৃতের উদ্দেশ্যে ভোগ দেয়ার নিয়ম। রান্নার পর একটু ক্ষীর শিরণি হিসেবে তুলে রাখা হয়। মৃতের পুত্র ও তাদের স্ত্রীরা নয় দিন পর্যন্ত দিনের বেলায় ফলমূল খাবে। রাতের বেলায় সামান্য একটু ক্ষীর শিরণি হিসেবে খায়। রান্না করা ক্ষীর ঠান্ডা হওয়ার পর মৃতের উদ্দেশ্যে নতুন হাঁড়িতে পরিজনের সবাই একটু করে ঢেলে রাখে। হাঁড়িতে ক্ষীর ঢালার সময় বাঁম হাতের তালু ডান হাতের কুনুই-এর নিচে রেখে প্রার্থণা করে- 'ভাগবান উসকা আতমাকো শান্তি কারে।' প্রতিদিন মৃতের জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষীরপূর্ণ হাঁড়িটি কলাপাতায় ঢেকে নদীর ঘাটে নিয়ে যায়। সঙ্গে নেয় হারিকেন বা টর্চ লাইট আর একটি দাঁ। ভায়েরা সহ আরো দুই-চার জন লোক তার সাথে যায়। নিজ হাতে হাঁড়িটি নদীতে ভাসিয়ে সেদিকে তিনবার পানিতে ঢেউ ঠেলে দেয়। চলে আসার সময় পিছন ফিরে তাকানো নিষেধ।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার সাহা ও শাঁখারীদের মধ্যে চতুর্থ দিনে মৃতের উদ্দেশ্যে পিন্ডদানের নিয়ম আছে। স্নানের পর নদীর ঘাটে পিন্ডদান করা হয়। সাহা'রা সেদিন শ্মশানবন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে ভিজা চিরা, আদা ও টক দই খাওয়ায়। অনেকে অবশ্য এরসাথে মুড়ি, খৈ আর উখরাও খাইয়ে থাকে। সাহা, শাঁখারী ও ঋষিদের প্রথানুযায়ী, মৃতাশৌচ পালনকারী চাইলে চতুর্থ দিন থেকে শ্রাদ্ধ দিন পর্যন্ত দিনে একবার সম্ভার ছাড়া একজ্বালা ভাত[১১৮] রান্না করে খেতে পারে। সেজন্য তাকে অবশ্যই নদীর ঘাটে 'হাঁড়ি-পুড়ানো' নিয়ম পালন করতে হয়। এ নিয়মে মৃতের পুত্ররা স্নানের পর নদীর ঘাটে একজ্বালা ভাত রান্না করে সেটি ভাসিয়ে দেয় নদীতে। যে ঘরে মৃতাশৌচকাল পালন করা হয়, সেখানে ইটের চুলা বানিয়ে পুত্র অথবা পুত্রবধূ পাটখড়ির আগুনে নিজেদের জন্য একজ্বালা ভাত রান্না করে। আমাবশ্যা, একাদশি, পূর্ণিমা, বৃহস্পতি ও রবিবার আগুনের তৈরি আহার্য বর্জনীয়। উক্ত দিবসগুলোতে তারা শুধু ফলমূল খেয়ে থাকে। ঋষিদের কেউ কেউ সাত বা নয় দিনে হাঁড়ি পুড়ায়। এছাড়া যারা এগার দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, তারা অনেকেই দশ দিন পর্যন্ত ফলমূল খেয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে তাদের হাঁড়ি পুড়াবার প্রয়োজন পরে না।

ঢাকার হিন্দুদের মধ্যে মৃতের বিবাহিত কন্যারা তেরাত্র অতিবাহিত হলে চতুর্থ দিনে চতুর্থা পালন করে। সেদিন তারা নিজেদের নখ কাটে। স্নানের পর নতুন কাপড় পরে। পরিধেয় বস্ত্র ফেলে দেয়। মৃত মা/বাবার উদ্দেশ্যে তাদের পক্ষ থেকে ঠাকুর কর্তৃক পিন্ডদানের নিয়ম রয়েছে। পিন্ডদানের পর কন্যারা ব্রাহ্মণ সেবা করে। ব্রাহ্মণ সেবায় সামর্থ্যের আলোকে পাঁচ-সাত জন বা আরো অধিক ব্রাহ্মণকে ভোজের নিমন্ত্রণ করা হয়। ভোজের পর তাদেরকে দাক্ষিণ্য দিয়ে বিদায় জানানো হয়। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল কন্যারা ব্রাহ্মণ সেবার পর সেদিন শ্রাদ্ধানুষ্ঠানও করে থাকে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজন ও শ্মশানবন্ধুদের নিমন্ত্রণ জানায়। লুচি, ডালনা,[১২৭] সবজি তরকারি, মালপোয়া, মিষ্টি, দই ইত্যাদি দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়। আর ব্রাহ্মণ সেবার পর ধোপা কন্যারা সেদিন মাছ খেয়ে থাকে।

শিশু সন্তানের মৃত্যুতে পিতা-মাতা মৃতাশৌচ পালন করে তিনদিন। এসময় তারা ক্ষৌরকর্ম করে না। ভাত-ডাল[১১৯] ও একজ্বালা ভাত খায়। অনেকে গরম ভাতের সাথে ঘি ও কাঁচা লংকা দিয়ে নেয়। চতুর্থ দিনে শিশুর পিতা-মাতা ক্ষৌরকার্য সম্পন্নের পর স্নান করে। সেদিন সকাল বেলা শিশুর পিতা পূজায় বসে ভুজ্জি দান করে থাকে। ভুজ্জিতে দানস্বরূপ উৎসর্গ করা হয় সোয়া কেজি তিল ও ধান, এক ফানা কলা,

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ বা সাত রকমের ফল। এছাড়া মৃত শিশুর উদ্দেশ্যে ভোগ দেয়া হয় একটু দই, চিরা ও মুড়ি। পূজা শেষে একটি শিশুকে ডেকে এনে ভোগের খাদ্যটুকু খাইয়ে দেয়া হয়।

এগার দিনে গোয়ালারা মৃতের ঘরের দরজার সামনে একগ্লাস পানি ও আটা অথবা চাল রাখে। গ্লাসের পানি কম মনে হলে, আটা অথবা চালের মধ্যে পশু-পাখির পায়ের ছাপ দেখলে মনে করা হয় মৃতের আত্মা পানি পান করে গেছে।[১২০]

শ্রাদ্ধের আগের দিন ঘাটকাম অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার ধোপারা একে 'নাওবার' বলে থাকে। সেদিন ঘর-দোর ধোয়া হয়। অনেকে আবার চুন-কামও করে থাকে। পূর্বে গোবর দিয়ে ঘর-দোর লেপা হত। এখন অবশ্য কেউ কেউ বাড়ির বিভিন্ন স্থানে গোবরছড়া ছিটায়। শাঁখারীরা মন্দিরের জল ছিটিয়ে দেয়। সাহা'রা গঙ্গাজল ছিটিয়ে বাড়ি-ঘর পবিত্র করে। শাঁখারী ছেলেরা সেদিন নদীর ঘাটে যাবার সময় কারো সাথে কোনরূপ কথা বলে না। ঢাকার হিন্দুদের মধ্যে জ্ঞাতিরাও ক্ষৌরকর্ম সম্পন্নের পর স্নান করে। অতীতে ধোপাদের জ্ঞাতিরা ঘাটকামের দিন মাথা মুন্ডন করত। এখন এই রীতির ব্যত্যয় দেখা যায়। নাপিত নদীর ঘাটে পুত্রদের নখ, দাড়ি কেটে মাথা মুন্ডন করে দেয়। ঋষি ও গোয়ালা পরিবারে মা-বাবা যেকোন একজন জীবিত থাকলে পুত্র সন্তানরা টিকি ধারণ করে।

ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায় পিন্ড দান করে স্নানের আগে অথবা পরে। ঘাটকামের দিন নদীর ঘাটে গোয়ালারা পিন্ডদানের সাথে ভুজ্জিদানও করে থাকে। স্নানের পর সাথে আনা ভুজ্জির সামগ্রি নদীর ঘাটে সাজানো হয়। ভুজ্জি সামগ্রিতে থাকে চাল, ডাল, তেল, লবন, ঘি, চিরা, গুড়, দই, মিষ্টি, খই, পাঁচ রকম ফল, পাঁচ রকম সবজি, কাঁসার থালি, গ্লাস, লোটা, কলস, লেপ, তোষক, মশারী, ছাতা, জুতা, গামছা ইত্যাদি। ভুজ্জিতে মৃত নারীর জন্য শাড়ি আর পুরুষের জন্য ধুতি-গেঞ্জি রাখা অবশ্য কর্তব্য। গোয়ালাদের তৈরিকৃত সাতটি পিন্ডতে চালের গুড়া, কলা ও কাঁচা দুধের ব্যবহার দেখা যায়। ভুজ্জি দানের পর ভুজ্জির সমস্ত উপকরণ ঘাটের ব্রাহ্মণ নিয়ে যায়। নদীর ঘাটে ধোপারা মৃত বাবা/মা এবং পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পাঁচ বা সাতটি পিন্ড বানায়। এরপর ধূপ জ্বালিয়ে সেটি পিন্ডের উপর তিন বা পাঁচবার ঘুরিয়ে প্রণাম করে বলে- 'ভাগবান উসকা আত্মাকো শান্তি দো।' পিন্ড নদীতে ভাসিয়ে হাতে পাঁচবার ঢেউ তোলে ঠেলে দেয়। ঢাকার অনেকেই পিন্ডদানের পর স্নান করে। স্নানের পর পরিধেয় বস্ত্র ফেলে দিয়ে পরিধান করে

Dhaka University Institutional Repository

নতুন বস্ত্র। পরিত্যক্ত বস্ত্র নাপিত নিয়ে যায়। মৃতের পরিবারের লোকেরাও সেদিন নিজেদের নখ কাটে। স্নানের পর একটি নতুন বস্ত্র পরিধান করে। মৃতের আত্মীয়-স্বজনরা কখনো কখনো পরিবারের সবাইকে অথবা শুধুমাত্র মৃতের স্ত্রীকে পরিধেয় উপহার দেয়। শাঁখারীদের রীতিতে, আত্মীয়দের পাশাপাশি মৃতের পুত্ররাও পরিজন, জ্ঞাতি,[১২১] ভাগিনা-ভাগিনী, ভগ্নি-ভগ্নিপতি সবাইকে নতুন পরিধেয় উপহার দেয়।[১২২] নতুন বস্ত্র পরিধান করে সবাই মৃতের বাড়িতে সাক্ষাৎ করতে আসে। ধোপাদের প্রথানুযায়ী, ঘাটকাম সম্পন্ন হলে মৃতের পুত্ররা ঘরে ফিরে আদা, কাঁচাবুট আর মুড়ি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। সেদিন তারা আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি এবং শ্মশানবাসীদের নিমন্ত্রণ জানান। মৃত ব্যক্তি যে স্থানে দেহত্যাগ করেছে, সেই স্থানে চুলা বানানো হয়। পুত্রবধূ পাটখড়ির আগুনে অতিথিদের জন্য ভাত, মাছ, ডালনা ও সবজি রান্না করে। এছাড়া জ্ঞাতিদের পক্ষ থেকে মিষ্টি অথবা দই অতিথি আপ্যায়নে যোগ হয়। মাটিতে কলাপাতা বিছিয়ে অতিথিদের খেতে দেয়ার নিয়ম। মৃতের পুত্ররা নিজ হাতে অতিথি সেবা করে থাকে। সমস্ত পদের একটু করে খাবার একটি মাটির হাঁড়িতে করে মৃতের উদ্দেশ্যে নদীতে ভোগ দেয়া হয়। পুত্ররা ভোগ দিয়ে ফেরার পর পরিবারের সকলে একত্রে বসে আহার করে। মৃতের পরিবারের লোকেরা এসময় মাছ খাওয়া থেকে বিরত থাকে।

মৃত্যুর পর জীবাত্মা ভুবর্লোকের প্রথম স্তর প্রেতলোকে গমন করে বলে মনে করা হয়। প্রেতলোকে বসবাসকালীন সময়ে জীবাত্মাকে 'প্রেতাত্মা' বা 'ভূত' বলে অভিহিত করা হয়। এসময় আত্মা তার প্রিয়জনদের ছেড়ে যেতে চায় না। জীবাত্মার উর্ধ্বগতির জন্য তার অধিকারিগণ শ্রাদ্ধ করে থাকে।[১২৩] অশৌচান্তে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে পিতৃপুরুষের পিন্ডদান করে শুদ্ধ হওয়ার বিধি। ঢাকার সাহা, শাঁখারী, ঋষি ও গোয়ালাদের মাঝে একমাস আর ধোপাদের মধ্যে মৃত্যুর পনের দিন পর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করার নিয়ম। বর্তমানে তারা এগার, তের, পনের কেউ কেউ আবার একমাস পর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে থাকে। গুরুড় পুরাণের বিধান অনুযায়ী, এগার দিনে শ্রাদ্ধ না করলে মৃতের আত্মা মুক্তি পায় না।[১২৪] শ্রাদ্ধ অর্থে শ্রদ্ধাভক্তি সাথে মৃত বাবা/মার মুক্তি কামনায় কিছু দান করা। মৃত বাবা/মা জীবিতাবস্থায় যেসব সামগ্রি ব্যবহার করত, শ্রাদ্ধের সময় দানস্বরূপ এই সকল বস্তু উৎসর্গ করা হয়। এছাড়াও সামর্থ্য অনুযায়ী পাঁচ, সাত বা পনের কেজি করে তিল, চাল, ডাল, ধান, তরি-তরকারি, ফলমূল, মিষ্টি, দই, চিনি, দুধ ইত্যাদি অনেক কিছুই থাকে। ধনীরা অনেকেই খাট-পালঙ্ক, গাছ, ভূমি, গরু অথবা এর মূল্য দান করে থাকে। হিন্দু শাস্ত্রসমূহে গোদানের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।[১২৫] গোদানে ব্রাহ্মণ পুরোহিত মৃতের আত্মাকে

Dhaka University Institutional Repository

গো-পুচ্ছ ধরিয়ে বৈতরণী পার করায়।[১২৬] ঋষিমতে, শ্রাদ্ধের প্রধান কাজ হল তিলদান-এর রীতি। শ্রাদ্ধের দিন প্রত্যুষে মন্দির বা অন্য কোথাও তিলদান অনুষ্ঠিত হয়। পুত্ররা স্নানের পর গামছা পরিধান করে পাঁচ, সাত অথবা তের কেজি তিলদান করে থাকে। সাথে ফলমূল, শাকসবজিও দান করা হয়। তিলদান সম্পন্নের পর পুত্ররা ঘরে ফিরে শ্রাদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে। ঢাকার হিন্দুদের মধ্যে শ্রাদ্ধের দিন সকালে মৃতের পরিবারের লোকদের স্নান সেরে নতুন কাপড় পরিধানের রেওয়াজ আছে। মৃতের পুত্ররাও নতুন গেঞ্জি, ধুতি ও উত্তরীয় পরিধান করে শ্রাদ্ধক্রিয়ায় বসে। তাদের পাশে স্ত্রীরাও থাকে। ব্রাহ্মণ ঠাকুর তাদের গলায় কাঠের মালা, কোমরে লাল কায়তুন পরিয়ে দেয়। তিলক মাটি দিয়ে পুত্রদের কপাল, কণ্ঠ ও বাহুদ্বয়ে তিলক চিহ্ন আঁকে। চারদিকে খোলা, উপরে ছাদ এমন স্থানে অনুষ্ঠিত হয় শ্রাদ্ধক্রিয়া। অনেকক্ষেত্রে বাড়ির চত্বরে ত্রিপল বা সামিয়ানা টাঙ্গানো হয়। যেখানে শ্রাদ্ধক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তার চারপাশে ভুজ্জির সামগ্রি সাজিয়ে রাখা হয়। একসময় সামগ্রিসমুহ কলাপাতা বা কলার খোলে রাখা হত। এখন থালায় সাজিয়ে রাখা হয়। শ্রাদ্ধক্রিয়ার শুরুতে ব্রাহ্মণকে দিয়ে আসমনের জল তৈরি করা ঋষিদের প্রথা। ব্রাহ্মণ একটি মাটির হাড়িতে জল, ফুল, তুলসী পাতা ও যবের উপর মন্ত্র পড়ে আসমনের জল তৈরি করে, যা পরের দিনের অনুষ্ঠেয় আচারের জন্য তুলে রাখা হয়। শ্রাদ্ধক্রিয়ার নানাবিধ দান কার্যের শেষে মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রেতের মুক্তি কামনায় পিন্ডদান সম্পন্ন করে থাকে। শ্রাদ্ধাদি কার্যের দানাদি সকল প্রকার কর্মের মন্ত্রের শেষে বলা হয়ে থাকে 'ব্রাহ্মণায়হং দদানি।' ব্রাহ্মণ হল দান কার্যের দান গ্রহণকারী প্রেতপুরুষের প্রতিনিধি। শ্রাদ্ধের দান মূলতঃ সবই প্রতীকী ব্রাহ্মণকে দান। ঢাকার ধোপাদের মাঝে 'জোড়া শ্রাদ্ধে'র প্রথা আছে। সেকারণে তাদের অনেকেই জোড়াশ্রাদ্ধ করে থাকে। জোড়াশ্রাদ্ধে 'জোড়াপিন্ড'র সাথে দানের প্রতিটি সামগ্রি একজোড়া অর্থাৎ দুটো করে দেয়ার নিয়ম।[১২৭] জোড়াশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হলে পরবর্তী বছরে শ্রাদ্ধ করার প্রয়োজন পরে না। এতে করে প্রেতপুরুষসহ মৃতের পরিজন মুক্তি পেয়ে যায়। মৃতের পরিবারকে কালাশৌচও পালন করতে হয় না।

শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষে ব্রাহ্মণ সেবার নিয়ম। ঢাকার হিন্দুমতে, পুত্র কর্তৃক ব্রাহ্মণ সেবায় মৃতের আত্মা পুণ্য লাভ করে। সামর্থ্যের আলোকে পুত্ররা পাঁচ-দশ বা আরো অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়। ব্রাহ্মণ ভোজনের পর মৃতের পুত্ররা তাদের 'ভোজনদক্ষিণা' দিয়ে বিদায় জানায়। সাহাদের রীতিতে, ব্রাহ্মণ ভোজে পরিবেশিত খাদ্যের অবশিষ্টাংশ মৃতের পুত্ররা প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। ব্রাহ্মণসেবার পর পুত্ররা জ্ঞাতিদের ভোজনের ব্যবস্থা করে। তাদের সাথে শ্মশানবন্ধুদেরও নিমন্ত্রণ জানানো হয়। পূর্বকালে

Dhaka University Institutional Repository

শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত অতিথিদের চিরা, মুড়ি বা খই এর সাথে দই আর মিষ্টি খাওয়ানো হত। এখন খাওয়ানো হয় লুচি বা পুরি, ডালনা, মালপোয়া, ঘন ডাল, মিষ্টান্ন, মিষ্টি ও দই। ঋষিদের রীতিতে, মৃতের পরিজন আর জ্ঞাতিরা এসময় দুই-চারটি কাঁচাবুট ও আদা চিবিয়ে এবং শরীরে পানি ছিটিয়ে নিজেদের শুদ্ধি করে নেয়। শাঁখারী ও ঋষিদের নিয়মানুযায়ী, শ্রাদ্ধের খাবার মৃতের পরিজনরা বিশেষ করে পুত্র ও পুত্রবধূরা গ্রহণ করে না। এছাড়া ঢাকার হিন্দুদের অনেকেই শ্রাদ্ধের খাবারকে প্রেতাত্মার খাবার বলে খায় না। বৈষ্ণব পদালম্বীরা চল্লিশদিন পর্যন্ত মৃতের বাড়ির জল স্পর্শ করে না। সেজন্য এখন ঢাকার হিন্দুদের অনেকেই এগার, তের বা পনের দিনে শ্রাদ্ধক্রিয়া করলেও শ্রাদ্ধভোজ অনুষ্ঠান চল্লিশ দিন পরে করে থাকে। শাঁখারী পুত্র ও পুত্রবধূরা শ্রাদ্ধের দিন দুপুর বেলায় চিরা, মুড়ি, দুধ, দই এবং রাতের বেলায় একজ্বালা ভাত গ্রহণ করে। অন্যদিকে, ঋষিরাও শ্রাদ্ধদিনে একজ্বালা ভাত আহার করে থাকে।

শ্রাদ্ধের দিন শাঁখারী, ঋষি ও গোয়ালারা মৃত ব্যক্তির পছন্দের সব খাবার রান্না করে তার উদ্দেশ্যে ভোগ দেয়। ঋষিরা একে 'হাকরার ভাত', শাঁখারীরা 'মৎস্যমুখী' আর গোয়ালারা 'মাছছুয়া' বলে থাকে। মৃতের পরিজনদের এই খাবার রান্না করার নিয়ম নাই। সাধারণতঃ আত্মীয় কেউ একজন মৃতের বাড়িতে এই খাবার রান্না করে থাকে। রান্নার সময় রন্ধনকারীর কোনরূপ কথা বলা নিষেধ। একটি মাটির বড় সানকিতে ভাত, মাছ ভাজা, মাছের তরকারি, সবজি ভাজা, ডাল, মিষ্টান্ন, মালপোয়া, পুরি, মিষ্টিসহ হরেক প্রকার খাবার দেয়া হয়। মৃত ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় কোন নেশাজাতীয় দ্রব্যে আসক্ত থাকলে, সেই নেশাজাতীয় দ্রব্যও শাঁখারীরা সানকিতে দিয়ে থাকে। যাত্রাকালে শাঁখারীরা সানকির মুখ হলুদ কাপড়ে বেঁধে এর উপর প্রদীপ জ্বালায়। আর ঋষিরা সানকির ভেতর মোমবাতি-আগরবাতি জ্বালিয়ে নেয়। মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্র 'নহে সন্ধ্যা, নহে দিনে' অর্থাৎ গোধুলিলগ্নে নদী বা পুকুরে অর্ধেক জলে, অর্ধেক টানে সানকিটি ভাসিয়ে দিয়ে বলে-' এইটা দিয়া গেলাম। আমার সাধ্যে যাই কুলাইছে, তাই তোমারে দিছি। যদি কোন ভুলচুক কইর‍্যা থাকি মাফ কইর‍্যা দিও। তুমি আমাগো আর্শিবাদ করবা যাতে আমরা বালবাচ্চা লিয়া সুখে শান্তিতে থাকবার পারি।'[১২৮] সাহা'রা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে রান্না করা সমস্ত খাদ্য অল্প করে একটি কলার খোলে তুলে রাখে। সন্ধ্যার সময় জ্যেষ্ঠপুত্র মৃতের উদ্দেশ্যে সেটি নদীতে ভাসিয়ে উৎসর্গ করে আসে। গোয়ালারা সন্ধ্যারাতে ভাত-মাছ রান্না করে পরিবারের সবার থালায় বেড়ে দেয়। পরিজনরা সবাই তাদের থালা থেকে কিছুটা ভাত-মাছ তুলে একটি নতুন মাটির হাঁড়িতে রাখে। ভাত-মাছপূর্ণ হাঁড়িটি জ্যেষ্ঠপুত্র তিন রাস্তার মোড়ে অথবা পুকুরপাড়ে রেখে আসে। তার সঙ্গী হয়ে ভাইয়েরা সহ আরো দুই-চারজন আত্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষরাও যায়। হাঁড়িটি মাটির সরা দিয়ে ঢেকে এর উপর প্রদীপ জ্বালিয়ে নেয়। ভোগ দিয়ে পুত্ররা বাসায় ফিরলে পরিবারের সবাই একত্রে বসে নিজ নিজ থালার খাদ্য গ্রহণ করে। মৎস্যমুখী আচার পালিত হয়ে গেলে শাঁখারীরা শ্রাদ্ধের পর প্রথম শনিবার অথবা বৃহস্পতিবার থেকে মাছ খাওয়া শুরু করে।[১২৯] হিন্দুদের অনেকেই শ্রাদ্ধদিনের রাত্রে মৃতের বাড়িতে কীর্তনের আয়োজন করে।

শ্রাদ্ধের পরদিন ঋষিরা 'দধিমঙ্গল' অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। দধিমঙ্গল সাধারণত: ঢাকেশ্বরী মন্দিরেই অনুষ্ঠিত হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে মৃতের বাড়িতে অথবা আশেপাশের মন্দিরেও এর উৎযাপন দেখা যায়। অনুষ্ঠানস্থলে নারায়ণের আসন পেতে জলপূর্ণ ঘট স্থাপন করা হয়। ঘটের পাশে পূজার উপাচার হিসেবে থাকে নক্কল, বাতাসা, তালমিছরি ও কিচমিচ। এছাড়া সেখানে রাধা-কৃষ্ণের একটি ছবিও রাখা হয়। মৃতের ছেলেরা আসনের চারপাশে উপবেশন করে। আর তখন দলের লোক কর্তৃক কীর্তন পরিবেশিত হয়। কীর্তন শেষে মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্র আসমনের জলের হাঁড়ি মাথায় তুলে আসনের চারপাশ সাতবার প্রদক্ষিণ করে। মৃতের অপর পুত্র ও নাতিরা জ্যেষ্ঠপুত্রের সাথে প্রদক্ষিণে সামিল হয়। প্রদক্ষিণ শেষে আসমনের জলের হাঁড়ি মাথার উপর দিয়ে পিছনে ফেলে দেয়া হয়। আসমনের জলের ভাঙ্গা হাড়ি ও কাদামাটির উপর পুত্র-নাতিরা গড়াগড়ি দেয়। এসময় মৃতের পুত্রবধূরা জপ করতে থাকে। ভাঙ্গা হাঁড়ির টুকরো সহ সকল উপাচার মাটি থেকে নিজ পরিধেয় বস্ত্রে তুলে জ্যেষ্ঠপুত্র নদী বা পুকুরে নিক্ষেপ করে। এরপর মৃতের পুত্ররা সবাই নদী বা পুকুরে স্নান করে।

শ্রাদ্ধের একদিন পর মৎস্যমুখী আচার পালন করে সাহা ও শাঁখারীরা। সেদিন মৃত ব্যক্তির পছন্দের কয়েক রকম মাছ রান্না করা হয়। এ মাছ মৃতের পুত্রবধূ ব্যতীত যে কেউ রান্না করতে পারে। সাহা'রা ঘনিষ্ট কয়েক জন আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ জানায়। রান্না শেষে প্রথমেই মৃতের উদ্দেশ্যে হাঁড়ি থেকে সব রকম খাদ্য একটি কলার খোলে রাখা হয়। সেটি নদীর ঘাটে মৃতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত হয়। রাতের বেলায় মৃতের পরিবারের লোকেরা আত্মীয়স্বজনের সাথে একত্রে বসে ভাত-মাছ খেয়ে মৎস্যমুখীতা অর্জন করে। ঋষিরা শ্মশানবন্ধুদের নিমন্ত্রণ দিয়ে ভাতমাছ খাওয়ানোর পাশাপাশি নিজেরাও তাদের হাতে মৎস্যমুখীতা অর্জন করে। শ্মশানবন্ধুরা খেতে বসলে মৃতের পুত্ররা তাদের কাছে মাছ চেয়ে নিয়ে খায়। পুত্রদের মধ্যে যারা বছরব্যাপি মানত করে, তারা প্রথম বছর আহার্য হিসেবে মৎস গ্রহণ করে না। তাছাড়া অপরের হাতে রান্না করা খাদ্য, এমনকি কারো সাথে একত্রে বসেও খেতে পারে না। তার নিজের রান্না নিজেকেই করে

Dhaka University Institutional Repository

খেতে হয় অথবা স্ত্রী রান্না করে দেয়। মৎস্যমুখী হওয়ার পর শ্মশানবন্ধুরা সরিষার তেল পুত্রদের মাথায় মেখে দিয়ে 'হাইংগা শুদ্ধ' করে।[১৩০]

উনিশ শতকে ঢাকার সিভিল সার্জন জেমস টেলর লিখেছিলেন- 'শ্রাদ্ধ ইত্যাদি পালনের পক্ষে পরিবার যদি খুব গরীব হয়, তাহলে তারা অগ্রদানী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কয়েকরকম চাল, কিছু তৈলবীজ ও কড়ি বিতরণ করে থাকে।'[১৩১]

ঢাকার হিন্দুদের অনেকের মতে, পুত্র কর্তৃক বৈষ্ণব সেবা সম্পন্নের মধ্য দিয়ে মৃত ব্যক্তি প্রেতত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে। মৃত পিতা/মাতার মুক্তি কামনায় পুত্ররা তাই মৃত্যুর একমাস অথবা চল্লিশদিন পর বৈষ্ণবদের নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ জানায়। বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কারো হাতের রান্না করা খাবার বৈষ্ণবরা খায় না বিধায় অনুষ্ঠানের রান্না তারা নিজেরাই করে থাকে। অনুষ্ঠানের দিন পূর্বাহ্নে মৃতের বাড়িতে বৈষ্ণবদের আগমন ঘটে। দুই-এক জন বৈষ্ণব রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত থাকে, বাকীরা সবাই কীর্তন পরিবেশন করে। নানাপদের নিরামিষ জাতীয় আহার্য তৈরি করা হয়, যার মধ্যে খিচুরি কিংবা আতপ চালের ভাত, ডাল, ভাজি, ভর্তা, সবজি ভাজা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রান্নার পর সবরকম খাদ্য একটু করে হাঁড়ি থেকে ছোট ছোট বাটিতে তোলা হয়। মৃতের ঘরের মেঝেতে পাতা আসনে গৌর নিতাই ঠাকুরের ছবির সামনে খাবারের বাটিগুলি ভোগে রাখে। এরপর কিছুক্ষণের জন্য সবাই সেই ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়। এসময় ঘরের দরজা জানালাও বন্ধ থাকে। ভোগে উৎসর্গকৃত খাদ্য প্রসাদ হিসেবে হাঁড়ির খাবারের সাথে মিশিয়ে ফেলা হয়। বৈষ্ণব ভোজনের পর আরো কিছুক্ষণ কীর্তন পরিবেশিত হয়। পিতা/মাতার মৃত্যুর পর একমাস পর্যন্ত ঋষি নারী ও পুরুষ অপবিত্র থাকে।[১৩২] বৈষ্ণব সেবা পালনের ফলে তারা শুদ্ধি অর্জন করে। ঋষিদের প্রথানুযায়ী, কীর্তন শেষে বৈষ্ণবরা জ্যেষ্ঠপুত্রের হাতের তালুতে খানিকটা খিচুরি দেয়। সেটি মুখে দিয়ে সে তার পরিবারের পক্ষ থেকে শুদ্ধিতা অর্জন করে।

পিতা/মাতার মৃত্যু দিবসের তিথি থেকে পরবর্তী বৎসরের সেই তিথি পর্যন্ত (এক বৎসর) দেহ অশুচ থাকে।[১৩৩] স্মৃতিশাস্ত্রে এই সময়কে কালাশৌচ বলে অভিহিত করা হলেও ঢাকার হিন্দুদের কাছে এই সময়কালটি কাল অশুচ বা কালাশুচ নামে পরিচিত। এই সময়কালে দেবকার্য্য বা পিতৃকার্য্যে অধিকার থাকে না।[১৩৪] ঢাকার হিন্দু মতে, প্রথম বছর মৃতের আত্মা তার পরিবারের উপর ভর করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

আত্মাকে সন্তুষ্ট রাখতে তার পরিবারের লোকেরা নানা বিধি-নিষেধ মেনে চলে। এসময় তারা পূজার্চনা, বিবাহ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন সহ সর্বপ্রকার মাঙ্গলিক কর্ম পালন করা থেকে বিরত থাকে। আগে ঢাকার হিন্দুরা এসময় মন্দিরেও প্রবেশ করত না। আট-দশ বছর থেকে তারা মন্দিরে প্রবেশ করলেও মন্দিরের কোন জিনিষ স্পর্শ করে না। মৃতের পরিজনরা সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ি ফিরে আসে। রাতে নিজ গৃহ ব্যতীত অন্য কোথাও অবস্থান করে না। শাঁখারী পুত্ররা প্রথম বছর একাদশীতে ভাতের পরিবর্তে নিরামিষ ও ডাল সহযোগে রুটি খায়। ঋষিরা প্রত্যেহ মৃত পিতা/মাতার ছবির সামনে আগরবাতি, মোমবাতি জ্বালিয়ে মন্ত্র পড়ে- 'পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাই পরমতেহ, প্রিয়ন্তে প্রতিমা, পিতাই প্রীতির পরিমাপনে, পিতাই স্বর্গ দেবতা।'[১৩৫] সাহা'রা প্রত্যেহ সন্ধ্যায় মৃতের সৎগতির জন্য পরিবারের সকলে একত্রে বসে কীর্তন করে থাকে। এছাড়া মৃতের পরিজনেরা নিমন্ত্রণ ব্যতিরেকে অন্য বাড়িতে এবং অন্য বাড়ি থেকে প্রেরিত খাবার খেতে পারে না। সেই কারণে শ্রাদ্ধের পর মৃতের পরিবারকে আত্মীয় কর্তৃক নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোর রেওয়াজ সাহাদের মধ্যে রয়েছে।

মৃত্যুর একবছর পর অনুষ্ঠিত হয় বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। ঢাকার হিন্দুদের কাছে এটি 'বচ্ছরকি', 'বছরান্তি, বা 'বোরশি' নামে পরিচিত। বাৎসরিক শ্রাদ্ধ সম্পন্নের ফলে মৃতের আত্মা প্রেতত্ব থেকে নিস্কৃতি পেয়ে দেবলোক প্রাপ্ত হয়। তখন মৃতের পরিজনদের কোন অশৌচ থাকে না। তারা সর্বকার্য্যে অধিকার লাভ করে। বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মৃতের পুত্ররা জ্ঞাতি, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ জানায়। অনুষ্ঠানের দুই-এক দিন পূর্বে ঘর-দোর পরিস্কার করা হয়। অনেকে ঘরে চুনকামও করে থাকে। সাহা'রা বাড়ি-ঘরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে। পিতা/মাতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে হিন্দুদের কোন কোন বর্ণের মধ্যে পুত্রদের মাথা মুন্ডনের রীতি প্রচলিত আছে। মৃত পিতা/মাতার মঙ্গলার্থে পুত্ররা সেদিনও পিন্ডদান করে থাকে। এর সাথে ভুজ্জিসামগ্রি দানস্বরূপ উৎসর্গ করা হয়। ঋষিরা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পরিধানের জন্য ব্রাহ্মণকে একটি নতুন ধুতি দান করে থাকে। মৃতের পুত্ররা সামর্থ্যের আলোকে প্রতিবছরই বাৎচ্ছরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পালনের চেষ্টা করে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঘনিষ্ট কয়েক জনকে নিয়ে শ্রাদ্ধভোজ অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ঋষিদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দুঃস্থরা প্রথম বছর সাড়ম্বরে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করে সবার সামনে ঘোষণা দেয়- 'আমরা পারলাম না। একবারে উঠায়া নিলাম।'[১৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু মতে, মৃতের আত্মা চূড়ান্ত মুক্তি লাভ করে গয়া, কাশী ও বৃন্দাবনে শেষ পিন্ডদানের মধ্য দিয়ে। এরজন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত নেই। মৃত ব্যক্তির উদ্ধারকল্পে তার পরিজনেরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে গিয়ে পিন্ডদান করে থাকে। গয়া ও কাশীতে গিয়ে শেষ পিন্ডদানে অসমর্থ্য ধোপারা প্রতিবছর নিজ গৃহে পিন্ড তৈরি করে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে আসে। মৃতের উদ্দেশ্যে শেষ পিন্ডদান সম্পন্ন করতে 'গয়াগঙ্গা' নামক একটি আচার পালন করে থাকে ঋষিরা। অতীতে নদীর পাড়ে এটি পালিত হত। ইদানিং মৃতের বাড়িতে উৎযাপিত হতে দেখা যায়। গর্ত খুড়ে অথবা মাটি দিয়ে 'গয়াগঙ্গা নদী' তৈরি করা হয়। নদীতে ফুটন্ত ঠান্ডা পানি, গঙ্গাজল, কাঁচা হলুদ, ধান, তুলসী পাতা, দূর্বা, সিঁদুর ও কচুরিপানা দেয়া হয়। জীব হিসেবে একটি জ্যান্ত মাছ নদীতে ছাড়া হয়ে থাকে। গয়াগঙ্গা নদীতে যেকোন মাছই ছাড়া যেতে পারে। তবে ঋষিরা শোল কিংবা টাকি মাছকে অধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অনুষ্ঠানের দিন মৃতের পুত্ররা স্নান সেরে নতুন বস্ত্র পরিধান করে। জ্যেষ্ঠপুত্র কর্তৃক শেষ পিন্ডদান সম্পন্নের পর মৃতের পুত্ররা বড় থেকে ছোট ক্রমানুসারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়। জ্যেষ্ঠপুত্রের হাতে জলপূর্ণ মাটির হাঁড়ি থাকে। পুত্ররা সবাই প্রতীকী গয়াগঙ্গা নদীর চারপাশ সাতবার প্রদক্ষিণ করে। এসময় ব্রাহ্মণ ঠাকুর মন্ত্র পড়তে থাকে। প্রদক্ষিণ শেষে ব্রাহ্মণ কুশের তৈরি গরুর লেজ ধরিয়ে মৃতের পুত্রদের গয়াগঙ্গা নদী টপকে পার করায়। মৃতের পুত্ররা কিছু অর্থ ব্রাহ্মণকে দান করে গরুর মূল্য বাবদ। এই অনুষ্ঠান শেষে গয়াগঙ্গায় ব্যবহৃত উপাচারসমূহ জ্যেষ্ঠপুত্র নিজ পরিধেয় বস্ত্রে তুলে নদীতে নিক্ষেপ করে। ঋষিদের অনেকেই শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষে গয়াগঙ্গার আচারটি সম্পন্ন করে থাকে। শ্রাদ্ধের দিন এ আচার করতে না পারলে তিনমাস অথবা এক বছরের মধ্যে এটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশঃ

১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আফসানি বেগম, বয়সঃ ৯৫, গৃহিণী, রহমতগঞ্জ।

শফিউল্লা, বয়সঃ ৬০, দারোয়ান, আমলিগোলা।

২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- কামালউদ্দিন মালিক, বয়সঃ ৫৭, শিল্পপতি, উর্দুরোড।

৩. মুমূর্ষু ব্যক্তিদের কেউ কেউ মৃত্যুর দুই-এক দিন পূর্বে জনম পায়খানা করে থাকে।

৪. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আহাম্মদি আক্তার, বয়সঃ ৬৫, সেলাই প্রশিক্ষিকা, বুদ্দুপাড়া আমলিগোলা।

৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- নুরুননাহার বিবি, বয়সঃ ৭০, মিসেস কাদের সর্দার, ইসলামপুর।

৬. ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী, (১৯৯৬), জামে আত-তিরমিযী, মুহাম্মদ মূসা অনূদিত ও সম্পাদিত, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা, হাঃ ৯১৮, ৯১৯, পৃঃ ২০৯, ২১০।

শায়খ ওয়ালীউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, (২০০৮), মেশকাত শরীফ, মাওলানা ফজলুর রহমান অনূদিত, মাওলানা মুহাম্মদ ওবায়েদ ইবনে সালেহ সম্পাদিত, মীনা বুক হাউজ, সূত্রাপুর ঢাকা, হাঃ ১৫২৮, পৃঃ২৩৫।

৭. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- বশিরন বেগম, বয়সঃ ৬০, আয়া, আমলিগোলা।

৮. ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন- সুফিয়া বেগম, বয়সঃ ৮০, গৃহিণী, লালবাগ।

হিরা বেগম, বয়সঃ ৫০, গৃহিণী, নবাবগঞ্জ।

নাগিনা, বয়সঃ ৬৫, গৃহিণী, আমলিগোলা, প্রমুখ।

৯. মুনতাসীর মামুন, (২০০৯), ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী, দ্বিতীয় খন্ড, অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃঃ১১৮।

১০. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- জুম্মন মিয়া, বয়সঃ ৭৫, ক্বাসীদা গায়ক, মিডফোর্ট।

১১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আরফান নেসা, বয়সঃ ৮৪, গৃহিণী, আমলিগোলা।

১২. ব্যক্তিগত সাক্ষৎকার- আয়মন নেছা, বয়সঃ ১০০, গৃহিণী, আমলিগোলা।

১৩. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আহাম্মদি আক্তার, প্রাগুপ্ত।

১৪. সায়েম সোলায়মান সম্পাদিত, (২০০৮), আমার সাত দশক-শিল্পপতি আনোয়ার হোসেনের আত্মজীবনী, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ধানমন্ডি, ঢাকা, পৃঃ৭১।

১৫. ব্যক্তিগত ও দলগত সাক্ষাৎকার- রাজিয়া বেগম, বয়সঃ ৬৫, গৃহিণী, নবাবগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

মিনা, বয়সঃ ৬০, গৃহিণী, নবাবগঞ্জ।

নুরুন্নাহার বিবি, সুফিয়া বেগম, হিরা বেগম প্রমুখ।

১৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সাকিয়া জামাল, বয়সঃ ৪৫, সেলাই প্রশিক্ষিকা, জগন্নাথ সাহা রোড।

১৭. ব্যক্তিগত ও দলগত সাক্ষাৎকার- আক্তারি বেগম, বয়সঃ ৬৭, গৃহিণী, সেকসাহেব বাজার।

সেতারা, বয়সঃ৬৭, গৃহিণী, লালবাগ।

গুলশানারা, বয়সঃ৪৫, সেলাই প্রশিক্ষিকা, নবাবগঞ্জ।

নাগিনা, নুরুন্নাহার বিবি, প্রমুখ।

১৮. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সেলিমা রহমান, বয়সঃ ৬৫, গৃহিণী, চুরিহাট্টা।

আহাম্মদি আক্তার, প্রাগুপ্ত।

১৯. মুহাম্মদ নাসীল শাহরুখ সংকলিত, (২০১০), ফিকহুত তাহারাঃ পবিত্রতা অর্জনের বিধান, উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রম, পৃঃ ১৯।

২০. বাদরিয়া বিনতে হাফিজ, 'মুমূর্ষুর প্রতি কর্তব্য ও মৃতের গোসল,' অন্তর্ভূক্তঃ জায়া জননী, ২য় বর্ষ, ৩১ জুলাই ২০০৬, রিয়াদুল মুসলিমাত কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৪৬।

২১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আহাম্মদি আক্তার, প্রাগুপ্ত।

২২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সালেহা, বয়সঃ ৬০, আয়া, আমলিগোলা।

নুরুন্নাহার, বয়সঃ ৫৮, গৃহিণী, হাজারীবাগ।

২৩. ইমাম বুখারী, (২০০০), সহীহ আল বুখারী, মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব সম্পাদিত, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, হাঃ ১১৭২, পৃঃ৫১৪।

মেশকাত শরীফ, প্রাগুক্ত, হাঃ ১৫৪৬, পৃঃ ২৪০।

জামে আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাঃ ৯২৯, পৃঃ ২১৫।

২৪. দলগত সাক্ষাৎকার- নেকলেস বেগম, বয়সঃ ৬৩, নালানয়ালি, নবাবগঞ্জ।

মনোরা, বয়সঃ ৬০, নালানয়ালি, নবাবগঞ্জ।

আমিনা, বয়সঃ ৫৮, নালানয়ালি, নবাবগঞ্জ।

২৫. মেশকাত শরীফ, প্রাগুক্ত, হাঃ১৫৪৬, পৃঃ২৪০।

সহীহ আল বুখারী. প্রাগুক্ত, হাঃ১১৭৪, পৃঃ৫১৫।

২৬. দলগত সাক্ষাৎকার- নেকলেস বেগম, মনোরা, আমিনা, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

২৭. মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, (২০১০), আহকামুল জানায়িয বা জানাযার নিয়ম-কানুন, হুসাইন বিন সোহ্‌রাব ও শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান অনূদিত, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, নর্থ সাউথ রোড, ঢাকা, পৃ:৬৮।

২৮.দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, (২০০২), সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, পৃ:২৮৭।

২৯. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ:৫১৭।

৩০. ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন- নাগিনা, মিনা, সুফিয়া বেগম, হিরা বেগম, প্রাগুক্ত।

৩১. দলগত সাক্ষাৎকার- নেকলেস বেগম, মনোরা, আমিনা, প্রাগুক্ত।

৩২. দলগত সাক্ষাৎকার- সুফিয়া বেগম, মিনা, নাগিনা, হিরা বেগম, প্রাগুক্ত।

৩৩. সুফিয়া বেগম, প্রাগুক্ত।

৩৪. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- বশিরন বেগম, প্রাগুক্ত।

৩৫. মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী, (২০০০), আসান ফেকাহ, আব্বাস আলী খান অনূদিত ও সম্পাদিত, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ: ৩১৯।

৩৬. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হা: ১১৯৬, পৃ:৫২৩।

৩৭. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পৃ: ২৮৮, প্রাগুক্ত।

৩৮. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হা: ১২৬৮, পৃ:৫৫১।

জামে আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হা:৯৭১, পৃ:২৩৯।

৩৯. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, (২০০১), ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ঢাকা, ধানমন্ডি, পৃ: ১৭৭।

৪০. মুনতাসীর মামুন, (২০০১), উনিশ শতকের ঢাকা, অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ: ৪৬।

৪১. জেমস টেলর, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫০।

৪২. ঐ , পৃ: ১৯৩-১৯৪।

৪৩. জেমস ওয়াইজ, তৃতীয় খন্ড, পৃ: ১৬২।

৪৪. দৈনিক প্রথম আলো, ৮ নভেম্বর ২০০৯।

৪৫. www.dhakacity.org/graveyard

৪৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আনার বেগম, বয়স: ৮৪, গৃহিণী, বংশাল।

Dhaka University Institutional Repository

নাজির হোসেন নাজির, বয়সঃ ৭০, মাজেদ সর্দারের ছেলে, নাজিরা বাজার।

আজিমবক্স, বয়সঃ ৬৫, মাওলা বক্স সর্দারের ছেলে, ফরাসগঞ্জ।

৪৭. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- হাজি আলতাফ হোসেন, বয়সঃ ৫৩, ৬১ নং ওয়ার্ড কমিশনার, আমলিগোলা।

৪৮. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- হোসেন আক্তার, বয়সঃ ৫৭, শিল্পপতি, আমলিগোলা।

৪৯. ফোকাশ গ্রুপ ডিসকাশন- সুফিয়া বেগম, হিরা বেগম, নাগিনা, মিনা, রাজিয়া বেগম, প্রাগুপ্ত।

৫০. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আরফান নেছা, প্রাগুক্ত।

৫১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- রাজিয়া বেগম, প্রাগুক্ত।

৫২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সাহানি, বয়সঃ ৬৫, গৃহিণী, খাজে দেওয়ান।

সেলিমা রহমান, প্রাগুক্ত।

৫৩. রফিকুল ইসলাম রফিক, (২০১০), 'ঢাকার ধর্মীয় উৎসবের খাবার,' অন্তর্ভূক্তঃ ঢাকাই খাবার, হাবিবা খাতুন ও হাফিজা খাতুন সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, নিমতলী, ঢাকা, পৃঃ ১৭০।

৫৪. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- রোকসানা, বয়সঃ৫৪, গৃহিণী, নাজিমউদ্দিন রোড।

আনোরা বেগম, বয়সঃ ৬০, ঘটক, নবাবগঞ্জ।

৫৫. তিন সবজি সহযোগে রান্না করা তরকারিকে পুরোনো ঢাকার মুসলমান অধিবাসীরা মুর্দার খাবার বলে থাকে। সেইকারণে অন্যকোন দিনে তিন সবজির রান্নাতরকারি পরিহার করে।

৫৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- রাশিদা বেগম, বয়সঃ ৬৪, গৃহিণী, ইমামগঞ্জ।

নুরুন্নার বিবি, নাগিনা, প্রাগুক্ত।

৫৭. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- রূপবানু, বয়সঃ ৭২, গৃহিণী, বংশাল।

জেসমিন, বয়সঃ ৭৫, বাবুর্চি, আমলিগোলা।

৫৮. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- গুলশানারা, প্রাগুক্ত।

৫৯. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- বিবি মরিয়ম, বয়সঃ ৫৭, গৃহিণী, চকবাজার।

৬০. সায়েম সোলায়মান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ৭২।

৬১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- হাজি লাট মিয়া, বয়সঃ ৭৬, ব্যবসায়ি, চুড়িহাট্টা।

নুরুন্নাহার বিবি, আনোরা, আজিমবক্স, প্রাগুক্ত।

৬২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- মোহাম্মাদ হোসেন, বয়সঃ ৮৩, শিল্পপতি, আমলিগোলা।

হাবিবুর রহমান, বয়সঃ ৮১, ব্যবসায়ি, উর্দুরোড।

Dhaka University Institutional Repository

আনোয়ার হোসেন, বয়সঃ ৭২, শিল্পপতি, আমলিগোলা।

৬৩. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- বশিরন বেগম, প্রাগুক্ত।

৬৪. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সাবিনা বেগম, বয়সঃ ৫৬, গৃহিণী, সেকসাহেব বাজার।

বিবি মরিয়ম, নুরুন্নাহার বিবি, প্রাগুক্ত।

৬৫. মির্জা নাথান, (১৯৭৮), বাহারিস্থান-ই-গায়েবি, খালেকদাদ চৌধুরী অনূদিত, প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ২০।

৬৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- রামা নন্দ দাস, বয়সঃ ৫৯, সভাপতি ও মাতব্বরঃ পশ্চিম ঋষিপাড়া পঞ্চায়েত ও মন্দির কমিটি ।

৬৭. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- বিদ্যুত কুমার নাগ, বয়সঃ ৫১, মালিকঃ কল্পনা বোডিং ও হোটেল, শাঁখারী বাজার।

আনন্দময় সুর, বয়সঃ ৫৭, শঙ্খবনিক, শাঁখারী বাজার।

রামা নন্দ দাস, পূর্বোক্ত।

৬৮. গঙ্গাজল ভারতের গঙ্গা নদীর জল। ঢাকার হিন্দুদের প্রায় সবার কাছেই গঙ্গাজল রক্ষিত আছে।

৬৯. ঢাকার হিন্দু মতে, দক্ষিণ দিকটি যমালয় আর উত্তর দিকটি হল দেবালয়। দেহত্যাগের পর মৃতের আত্মা বিচার-আচারের জন্য যমালয়ে যায়। কর্মফল ভাল হলে সে দেবালয়ে গমন করে বলে বিশ্বাস করা হয়।

৭০. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- বিরেশ চন্দ্র সাহা, বয়সঃ ৬৬, সভাপতিঃ মহানগরী সার্বজনিন পুজা কমিটি, বালুর ঘাট।

তোরনী ঘোষ, বয়সঃ ৮০, গৃহিণী, জয়নাগ রোড।

নেপাল বাবু, বয়সঃ ৭০, ধোপা, উমেশ দত্ত রোড।

৭১. শাঁখারীরা মৃত সধবাকে পরায় লাল শাড়ি। অপরপক্ষে সাহা, ঋষি, গোয়ালা, ধোপারা লালপেড়ে সাদাশাড়ি পরিয়ে দেয়।

৭২. শব বহনকারী মই কিনতে পাওয়া যায় না। তিনটি বাঁশ এবং দরি দিয়ে তৈরি করে নেয়া হয়।

৭৩. মৃতব্যক্তি যাতে নারায়ণের পাদপদ্ম লাভ করে এজন্য তার সাথে তুলসী গাছ বা পাতা দেয়ার নিয়ম।

৭৪. হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চাদর রামাবলী ব্রাহ্মণ পুরোহিত গায়ে জড়িয়ে পূজা করে। রামাবলী দোকানেও কিনতে পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৭৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- নারায়ণ শর্মা, বয়সঃ ৭৮, ব্রাহ্মণ পুরোহিতঃ জগন্নাথ সাহা রোড়।

রামা নন্দ দাস, প্রাগুক্ত।

৭৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার-রামা নন্দ দাস, প্রাগুক্ত।

৭৭. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- শিবলাল চক্রবর্তী, বয়সঃ৫৫, ধোপা, উমেশ দত্ত রোড।

৭৮. জেমস ওয়াইজ, পূর্বোক্ত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৮২।

৭৯. দৈনিক প্রথম আলো, ৮ নভেম্বর ২০০৯।

৮০. জেমস ওয়াইজ, পূর্বোক্ত, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ১৫৮।

৮১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সুধারানী সুর, বয়সঃ ৯০, গৃহিণী, শাঁখারী বাজার।

মিনতি বালা, বয়সঃ৭৫, গৃহিণী, শাঁখারী বাজার।

তোরণী ঘোষ, প্রাগুক্ত।

৮২.ঢাকার হিন্দুরা নদীর পানিকেও গঙ্গাজল বলে থাকে।

৮৩. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- নেপাল বাবু, প্রাগুক্ত।

৮৪. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সুমন্ত চন্দ্র দাস, বয়সঃ৭৬, সভাপতি ও মাতব্বরঃ পূর্ব ঋষিপাড়া পঞ্চায়েত ও মন্দির কমিটি।

৮৫. দলগত সাক্ষাৎকার- রেখা রানি ঘোষ, বয়সঃ ৬৩, গৃহিণী, কায়েৎটুলি।

শান্তা ঘোষ, ছাত্রি, বয়সঃ২০, জয়নাগ রোড।

রুমা ঘোষ, গৃহিণী, বয়সঃ ৪৩, কায়েৎটুলি।

তোরণী ঘোষ, প্রাগুক্ত।

৮৬. জেমস ওয়াইজ, পূর্বোক্ত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ৬৮।

৮৭. ঐ তৃতীয় খন্ড, পৃঃ৭২।

৮৮. ঐ দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ৬০।

৮৯. জেমস টেলর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫০।

৯০. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- রামা নন্দ দাস, প্রাগুক্ত।

৯১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- নেপাল বাবু, বিদ্যুৎ কুমার নাগ, প্রাগুক্ত।

৯২. জেমস ওইজয়া, পূর্বোক্ত, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ১২০।

৯৩. ঐ দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

৯৪. ঐ পৃ:৭০।

৯৫. ঐ পৃ: ৮২।

৯৬. ঐ তৃতীয় খন্ড, পৃ: ৯২।

৯৭. ঐ দ্বিতীয় খন্ড, পৃ:৬০।

৯৮. ঋষিদের মধ্যে আট-দশ বছরের যে সকল শিশু পান-সিগারেটে আসক্ত হয়ে পরে, মূলতঃ তাদের সমাধির উপরই পান-সিগারেট রাখা হয়।

৯৯. জেমস টেলর, পৃ:২৮৭।

১০০. ব্যক্তিগত ও দলগত সাক্ষাৎকার- শিলা সাহা, বয়সঃ ৫৩, গৃহিণী, বালুরঘাট।
সম্পা সাহা, বয়সঃ ৩৭, গৃহিণী, বালুরঘাট।
তৃপ্তি সাহা, বয়সঃ ৩৭, গৃহিণী, বালুরঘাট।
বিদ্যুৎ কুমার নাগ, অনন্দময় সুর, নারায়ণ শর্মা, প্রাগুক্ত।

১০১. সুধাময়ী চন্ডী, (১৪০৯), *পুরোহিত দর্পণ*, শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা,পৃ:৮৩৩।

১০২. শ্যামাচরণ চক্রবর্তী, (২০১০), *জ্ঞান মঞ্জরী*, তৃতীয় খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ:১৭৪।

১০৩. জেমস ওয়াইজ, তৃয় খন্ড, পৃ:১৩১।

১০৪. দলগত সাক্ষাৎকার- তোরণী ঘোষ, রেখা রানী ঘোষ, শান্তা ঘোষ, প্রাগুক্ত।

১০৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- আশা লতা, বয়সঃ ৭৫, গৃহিণী, পশ্চিম ঋষিপাড়া।

১০৬. দলগত সাক্ষাৎকার- শিপ্রা রানী দাস, বয়স:৫৫, কমিউনিটি মিডওয়াইফ, পূর্ব ঋষিপাড়া।
সুক্রানি, বয়সঃ ৪৪, গৃহিণী, পূর্ব ঋষিপাড়া।
সরস্বতি, বয়সঃ ৪৩, গৃহিণী, পূর্ব ঋষিপাড়া।

১০৭. 'হে ভগবান, তুমি তার আত্মার শান্তি দান কর। তাকে স্বর্গবাসী কর। তার জানা-অজানা সকল গুন্নাহ্ মাফ করে দিও।' ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- নেপাল বাবু, প্রাগুক্ত।

১০৮. শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য, (১৪১২), *শ্রাদ্ধকান্ড পদ্ধতি*, বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, কলিকাতা, পৃ:১৪।

১০৯. শিব শঙ্কর চক্রবর্তী, (২০১০), *জ্ঞান মঞ্জরী*, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ:১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

১১০. দলগত সাক্ষাৎকার- শিপ্রা রানী দাস, সুক্রানি, সরস্বতি প্রমূখ পূর্ব ঋষিপাড়ায় বসবাসকারী অধিবাসী।

১১১. দলগত সাক্ষাৎকার- সাগরিকা সুর, বয়স: ৫১, গৃহিণী, শাঁখারী বাজার।

সানন্দা সুর ঝিলিক, বয়স: ২৬, ছাত্রী, শাঁখারী বাজার।

আনন্দময় সুর, পূর্বোক্ত।

১১২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- রনজিৎ ঘোষ, বয়স: ৬৫, ব্যবসায়ী, কমল দহ রোড।

দেব নারায়ণ ঘোষ, বয়স: ৫৯, ব্যবসায়ী, জয়নাগ রোড।

১১৩. 'ভগবান, তার আত্মাকে শান্তি দান করো।' নেপাল বাবু, প্রাগুক্ত।

১১৪. 'আমার মা/বাবার শান্তির জন্য আমি এটা দিয়েছি।' নেপাল বাবু, প্রাগুক্ত।

১১৫. সাম্প্রতিককালে অনেকেই দুই প্রস্থ কাপড় ব্যবহার করে তাই স্নানের পর ভিজা কাপড় শরীরে শুকানোর প্রয়োজন পরে না।

১১৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- বিরেশ চন্দ্র সাহা, প্রাগুক্ত।

১১৭. দলগত ও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সোহাগবালা, বয়স: ৭০, উমেশ দত্ত রোড।

শ্রীমনি, বয়স: ৬৫, ধোপানী, উমেশ দত্ত রোড।

পূন্নি বালা দাসি, বয়স:৪৬, ধোপানী, উমেশ দত্ত রোড।

রুমা, বয়স: ৪৮, ধোপানী, উমেশ দত্ত রোড।

রুমা দাস, বয়স: ৫২, গৃহিণী, ঢাকেশ্বরী।

১১৮. একজ্বালা ভাত হচ্ছে চাল, ডাল ও নানারকম সবজি সহযোগে একজ্বালে রান্না করা খাদ্য বিশেষ। এটি অনেকটা সবজি খিচুরির মত। এক জ্বালে রান্না করার নিয়ম বলে ঢাকার হিন্দুদের কাছে এটি একজ্বালা ভাত হিসেবে পরিচিত। এতে সাধারণ লবনের পরিবর্তে সন্ধব লবন ব্যবহার করা হয়। ধনীরা এর সাথে ঘি মিশিয়ে খায়।

১১৯. মৃতাশৌচকালে মুগ ও মটর ডাল আহার করে থাকে। খেসারি ও মশুরি ডাল খাদ্য হিসেবে পরিহার করে।

১২০. দলগত সাক্ষাৎকার-মালতি ঘোষ, বয়স: ৬৩, গৃহিণী, কমল দহ রোড।

কল্পনা ঘোষ, বয়স: ৪২, গৃহিণী, কমল দহ রোড।

১২১. মৃতের পুত্ররা জ্ঞাতিদের মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের একজনকে বস্ত্র প্রদান করে।

Dhaka University Institutional Repository

১২২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- রতন মালা নাগ, বয়সঃ ৭৫, গৃহিণী, শাঁখারী বাজার।

১২৩. শ্যামাচরণ চক্রবর্তী, *জ্ঞান মঞ্জরী*, প্রথম খন্ড, পৃঃ ১০১।

১২৪. আচার্য্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, (১৩৯২), *গরুড় পুরাণম্*, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, পৃঃ ১২১ ।

১২৫. আচার্য্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, (১৪০১), *বরাহ পুরাণম্*, নবভারত পাবলির্শাস, কলিকাতা, পৃঃ৬০১।

আচার্য্য পঞ্চানন তর্করত্ন, *গরুড় পুরাণম্*, পৃঃ১৪৪, ৮৭।

১২৬. শ্রাদ্ধকালে পিতৃপুরুষের বৈতরণী পার হয়ে স্বর্গে যেতে হয়। শ্রাদ্ধের একটি অংশ বৃষোৎসর্গ। গরুকে সনাতন ধর্মালম্বিরা দেবতা বলে মানেন। শ্রাস্ত্র মতে, গরু কখনো দিকভ্রষ্ট হয় না। তাই বৈতরণী পার হবার জন্য কাল্পনিক গো-পুচ্ছ ধরার নিয়ম করা হয়েছে।

১২৭. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- নরেশ, বয়সঃ ৬২, ধোপা, উমেশ দত্ত রোড।

১২৮. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সুমন্ত চন্দ্র দাস, পূর্বোক্ত।

১২৯. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- কানন বালা নন্দী, বয়সঃ ৬৭, গৃহিণী, শাঁখারী বাজার।

১৩০. ফোকাশ গ্রুপ ডিসকাশন- শান্তি রানী , বয়সঃ ৬৩ , গৃহিণী, পূর্ব ঋষিপাড়া।
উর্মিলা দাস, বয়সঃ ৬৭, বৈষ্ণবী, পূর্ব ঋষিপাড়া।
শনিষ্ঠ, বয়সঃ ৬৩, গৃহিণী, পূর্ব ঋষিপাড়া।
মনি রানী, বয়সঃ ৫৫, গৃহিণী, পূর্ব ঋষিপাড়া।
সুমন্ত চন্দ্র দাস, প্রমুখ।

১৩১. জেমস টেলর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৩।

১৩২. জেমস ওয়াইজ,প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮১।

১৩৩. শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ২২৯।

১৩৪. ঐ পৃঃ২২৯।

১৩৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- রামানন্দ দাস, প্রাগুক্ত।

১৩৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- সুমিত্রা, বয়সঃ ৫৭, গৃহিণী, নগর বেলতলী লেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

মানব সংস্কৃতির বৈচিত্র এর স্বরূপ বিনির্মাণ করেছে। প্রাগৈতিহাসিক সময়কাল থেকেই প্রকৃতি, পরিবেশকে আশ্রয় করেই মানুষ প্রযুক্তির ধারণা লাভ করেছিল। "জ্ঞান" এর উৎপত্তি বা বিকাশ তখন থেকেই। তখন থেকেই মানুষ পারিপার্শ্বিকতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে মূলতঃ আপন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যই। ক্রমে মানুষ নানাভাবে জয় করেছে প্রকৃতিকে, ব্যাখ্যা করেছে, তৈরি করেছে নিজস্ব অভিজ্ঞতাবাদ। ধারণা করা হয় এই অভিজ্ঞতাবাদের আওতায় বিকাশ লাভ করেছে ধর্ম, তথা ধর্মীয় চিন্তা। প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা পশু শিকার নির্ভর আপাত "অস্থিতিশীল" জীবন যাপন থেকে তৈরি করেছে ক্রমশ স্থিতিশীল জীবনব্যবস্থা যেখানে নানা প্রপঞ্চ হিসেবে উদ্ভব ঘটেছে কৃষির ধারণা, সমাজের ধারণা, সর্বোপরি সংস্কৃতির নতুন ও বৈপ্লবিক রূপায়ণ। এই রূপায়ণ কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদেরই বিনির্মাণ, নানা আঙ্গিকে, নানা প্রেক্ষিতে যা সমাজ ও সংস্কৃতিকে বিনির্মাণ করে এবং সমাজ ও সংস্কৃতিতেই অভিযোজিত ও বিবর্তিত হয়। মানুষের অভিজ্ঞতাবাদের এই অভিযোজন ও বিবর্তন যে প্রপঞ্চ সমূহকে সংজ্ঞায়িত করেছে ধর্ম তার মধ্যে অন্যতম। পূর্বের "স্থিতিশীল সমাজের" পরিকাঠামো ও ব্যপ্তিকে বিনির্মাণ করতে ধর্মীয় চিন্তাধারা মূখ্য ভূমিকা রেখেছিল। প্রকৃতি, পরিবেশ, জীবন-মৃত্যু, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়াদিকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা থেকেই মানুষের অভিজ্ঞতাবাদ ধর্মের উৎপত্তি ঘটিয়েছিল বলে অনেকে মনে করে থাকেন। ধর্মের ধারণাটি তাই অবশ্যই স্থান-কাল-পাত্রভেদে প্রেক্ষিত সৃষ্ট এবং "সৃষ্টি"র ব্যাখ্যায় তা সবসময়ই নির্ভর করেছে সমকালীন বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা ও দর্শনের উপর। বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বলা যায় যে, যে কোন সমস্যাকে ধর্ম সমাধান করেছে পারিপার্শ্বিক সম্ভাবনাকে অনুকল্প হিসাবে চিন্তা ও চর্চার মাধ্যমে। সৃষ্টির উৎস, বিস্তার ও পরিণতি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ও প্রস্তাবনাকে ধর্ম সফলতা ও ব্যর্থতা উভয়ই অর্জন করেছে নিজস্ব প্রথাগত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। প্রাগ ইতিহাস, প্রায় ইতিহাস ও ঐতিহাসিক সময়কালে "সীমিত প্রযুক্তিগত জ্ঞানী" মানুষেরা তাই বেঁচে থেকেছে, সমাজবদ্ধ থেকেছে, যুদ্ধ করেছে আবার সন্ধিও করেছে ধর্মকে আশ্রয় করেই। ধর্মের সফলতা ও ব্যর্থতা ধর্মীয় প্রভাবের ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটাতে সক্ষম হয়নি। তাই আধুনিক ঐতিহাসিক রেঁনেসা পূর্ববর্তী সমাজকে ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতাবাদ ও ভাবাদর্শের আওতায় বিভাজন করেছে। ভারতীয় ইতিহাসের প্রাথমিক পরিক্রমাসমূহ এ কারণেই হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম যুগ হিসাবে পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য গবেষণায় 'পুরোনো ঢাকার সংস্কৃতি'র ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিত উনিশ ও বিশ শতকীয় পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান শহর ঢাকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আর এ কারণেই ভারতীয় ইতিহাসের আধ্যাত্মিকতাবাদ নির্ভর ভাবাদর্শের আওতায় বিকাশ লাভ করেছিল পুরোনো ঢাকার সংস্কৃতি, জীবনযাত্রার দর্শন, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস। যদিও আমাদের গবেষণার সময়কাল রেঁনেসা পরবর্তী বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটকেই নির্দেশ করে। তথাপি ঔপনিবেশিকতার আবর্তে আবদ্ধ পুরোনো ঢাকার সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা পূর্ববর্তী যুগের ধর্মনির্ভর মূল্যবোধকে আঁকড়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে। যার কারণে ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের মতে 'আধুনিক সময়কাল' পার করা বিশ্ব তখনো পুরোনো ঢাকার গন্ডির মধ্যে একটি 'অন্তবর্তীকালীন সময়' ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপীয় শিক্ষার প্রচলন, উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংশ্লেষণ সমাজে আধুনিকতার আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছিল সীমিতাকারেই। অধিকাংশ জনগোষ্ঠী এমনকি 'শিক্ষিত' সমাজও তখন পর্যন্ত পূর্ববর্তী যুগের মূল্যবোধকে অস্বীকার করেনি অথবা অস্বীকার করাকে সামাজিকভাবে ঝুকিপূর্ণ মনে করেছে। আর এ কারণেই জীবনযাত্রার বিভিন্ন মাত্রায় আমরা অনুসন্ধানে খুঁজে পেয়েছি নানান ধরণের লোকাচার ও চিন্তাধারাসমূহ যা মূলগতভাবে ধর্মীয় ভাবধারাকে জাহির করলেও আদর্শিকভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মীয় মূল্যবোধ এগিয়ে গেছে, কখনো কখনো সম্পূর্ণ বিপরীত চর্চাকে অনুপ্রাণিত করেছে। গবেষণার প্রথম ধাপে অনুসন্ধান -জন্মকে কেন্দ্র করে প্রাপ্ত উপাত্ত এ ধরণের বক্তব্যকেই বার বার প্রমাণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ- পুরোনো ঢাকায় মানব জন্ম কেন্দ্রিক লোকাচারগুলোর উপর আলোকপাত করা যায়। পূর্ববতী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি রজোকালীন সময়ে মহিলাদের মাঝে আনুষ্ঠানিকতা চারিত্রিকভাবে ধর্মভেদে সমরূপ। হিন্দু রজঃস্বলারা যেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে গোদভারাই পালন করছে তেমনি মুসলমান রমণীরা পালন করছে থালখিলানী। সীমিত আনুষ্ঠানিকতা ব্যতিরেকে এই দুটি লোকাচারে পদ্ধতিগত অমিল অত্যন্ত সীমিত। উল্লেখ্য, ইসলাম ধর্ম এ ধরণের লোকাচারের কোন স্বীকৃতি দেয়নি যদিও অনুসন্ধান অসংখ্য মুসলিম রমণীর সাক্ষাৎকারে এ ধরণের চর্চার কথা জানা গেছে। শুধু তাই নয় বন্ধ্যাত্ব মোচনে উভয় ধর্মের অনুসারীরা পীর ফকিরদের কাছে অহরহ সাহায্য প্রাথর্ণা করেছে। তবে হিন্দুদের মাঝে বন্ধ্যাত্ব মোচনে জামাইষষ্ঠী পূজার প্রচলন থাকলেও সমরূপ প্রথা মুসলিমদের অনুপস্থিত। ঢাকায় প্রচলিত শিশু গর্ভধারণের বিভিন্ন লক্ষণসমূহ (পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত কুমারের চাক, স্বপ্নে সাপ দেখা, ফল দেখা ইত্যাদি) উভয় ধর্মের লোকেরা সমান বিশ্বাস করেছে। গর্ভকালীন সতর্কতা সমূহের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'শরীরবন্ধ' প্রক্রিয়ায় উভয় ধর্মের নারীরা

Dhaka University Institutional Repository

একটি দিয়াশলাই-এর বাক্সে এক কোয়া রসুন, একখন্ড কয়লা, একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি, পেরেক, শুকনা মরিচ পুরে শাড়ির আঁচলে বেঁধে রাখত। এছাড়া সাধারণত মুসলিম ফকিরদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তাবিজ ধর্ম, বর্ণ ভেদে প্রায় সকল গর্ভবতীর মাঝে সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গর্ভধারণকালীন সময়ে মায়ের শরীরের পুষ্টির চাহিদা বেড়ে যায়। তাই প্রয়োজন পরে স্বাভাবিকের থেকে বেশী খাদ্যের। গর্ভকালীন এ প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে নানা উৎসব আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে মায়ের খাদ্যের ঘাটতিকে পূরণ করার চেষ্টা দেখা যায়। পাঁচ, সাত ও নয় মাসের 'সাধভক্ষণ' শুধু আনুষ্ঠানিকভাবেই মায়ের খাদ্য ঘাটতি পূরণের প্রয়াস নয় বরং নানাভাবে আগত শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করার আধুনিক তাগিদকে অনেক আগেই লোকাচারের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিয়েছে পুরোনো ঢাকার সমাজ। উল্লেখ্য, সাধভক্ষণ হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে একটি সাধারন অনুষ্ঠান যা কালক্রমে এখনো আমাদের সমাজে প্রচলিত। মায়ের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদার এ আধুনিক স্বীকৃতি বহু আগেই লোকাচারে যেমন স্বীকৃতি পেয়েছিল তেমনি নানান সংস্কার নিশ্চিতভাবেই মায়ের পুষ্টি সংস্থানকে বিঘ্নিত করেছিল বিভিন্ন পুষ্টিকর খাদ্য নিষিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে। এ খাদ্যগুলির মধ্যে চিতল- মৃগাল-ফলি-কই-টাকি-পিরবদল-বাইম-খল্লা-মেনি-বোয়াল-শোল মাছ, শসা, বাংগি, খিরা, মাছুয়া আলু, নারিকেলের পানি, ডাউয়া ফল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

শিশু জন্মের অব্যবহিত আগেই নানান কায়দায় শিশু প্রসবকে ত্বরান্বিত করার জন্য গর্ভবতীকে নানা ধরণের 'মনস্তাত্ত্বিক থেরাপি' দেয়া হত। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গর্ভবতীকে চাবি দিয়ে তালা খোলা, ঘরের সদর দরজায় পানি গড়িয়ে ফেলা, হায়তনের গাঠিঁ খোলা ইত্যাদি। এই ধরণের তৎপরতার মধ্য দিয়ে আমরা তৎকালীন সমাজের শরীরবৃত্তীয় চিকিৎসার অনগ্রসরতাকে মনস্তাত্ত্বিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে অতিক্রম করতে দেখি। প্রসব ত্বরান্বিত করার এই মনস্তাত্ত্বিক প্রচেষ্টা নানা ধরণের 'অতি বাস্তব' চিন্তাধারার আনয়ন করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, গর্ভবতী যে বাড়িতে বসবাস করে তার উপর দিয়ে যদি 'আড়ালি পাখি' উড়ে কাঁটাবনে যায় তাহলে গর্ভের শিশুর বৃদ্ধি রোধ হয় এবং তা গর্ভেই অবস্থান করতে থাকে। আবার যদি কখনো 'আড়ালি পাখি' কাঁটাবন থেকে ফুলবনে ফিরে আসে তবেই গর্ভের দ্রূণ পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে শুরু করে। এ কারণে আড়ালি পাখির উড়ে যাওয়া রোধ করতে বাড়ির ছাদে সীজ গাছ বা কাঁটাগোড়ালী গাছ, গরুর শিং ও হাড় রাখা হত। ঢাকার লোকাচারে এ অতি বাস্তবিক ধারণাগুলি মূলতঃ নানা বিশ্বাস ও দর্শনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। আধা বাস্তবিক চিন্তাগুলির কিছু কিছু চর্চা যেমন কোন কোন অর্থে আধুনিক 'মনস্তাত্ত্বিক থেরাপির' সাথে সামঞ্জস্যতা তৈরি করেছে তেমনিভাবে আড়ালি পাখির

Dhaka University Institutional Repository

মত অতি কাল্পনিক এবং এ সংক্রান্ত মিথের জন্ম দিয়েছে হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজে। হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ছটিঘরের নানান তৎপরতায়ও সাদৃশ্যতা দেখা যায়, যেমন- জননাশৌচ, ছয়ষষ্ঠী পালন, খিজির বাবার আশ্রয় প্রার্থণা, মায়ের বুকের অতিরিক্ত দুধ নদীকে দান, চোরা সংক্রান্ত মিথ ইত্যাদি প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শিশুর জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্নপ্রাশন, হাতেখড়ির বিপরীতে মুসলিমদের ছিল যথাক্রমে মুখে ভাত ও বিসমিল্লানে সাবাক বা বিসমিল্লায় বসানো অনুষ্ঠান। এছাড়া শিশুর দাঁত ওঠা, হাঁটতে শেখা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রায় একই ধরণের অনুষ্ঠানমালার প্রচলন দেখা যায়।

বিয়ের প্রতিটি উপাদান ধারণা ও পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করলে সহজেই এর উৎস ও বিকাশ সম্পর্কে ধারণা সমূহের সাথে বৈশ্বিক ধারণা সমূহের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় । বৈশ্বিক বিবর্তনে বিয়ের ধারণাসমূহের প্রাথমিক যেসকল অনুষঙ্গ ছিল যেমন, নর-নারীর কামনা, পরিবার ও প্রজন্মের স্বীকৃতি ইত্যাদি বিষয়াদি পুরোনো ঢাকার বিয়ে সংক্রান্ত চর্চার মধ্যে সেসকল বিষয়াদির উপস্থাপন দেখতে পাওয়া যায়। সামগ্রিকভাবে পুরোনো ঢাকায় বিয়ে প্রথার একটি বিশেষ ধারা দেখতে পাওয়া যায় যা বৈশ্বিক ধারার ছায়ায় গড়ে ওঠা এবং ধর্মীয় ভেদাভেদকে এড়িয়ে গিয়ে বিকশিত একটি প্রথাকে নির্দেশ করে। সমাজ নিজস্ব প্রয়োজনে পরিবার প্রথার সূচনায় আগ্রহী। এই আগ্রহ সামষ্টিক পর্যায় থেকে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যাপৃত। এ কারণে বিয়ের আগ্রহ নর-নারীর স্বাভাবিক কামনাকে পেরিয়ে সামষ্টিক আগ্রহের জায়গায় পৌছে যায়। বিয়ের আগ্রহ ও সম্ভাবনাকে বাস্তব ও প্রতীকী অর্থে অর্থবহ করার প্রবণতা তৈরি এ জাতীয় প্রেক্ষাপট থেকে। যার কারণে গায়ে প্রজাপতি বসা, বাড়ির চুলায় হাঁড়ির নিচে আগুনের ফুলকি ওড়া, দুই কাকের ঠোকরাঠোকরি, পিপড়ার দল ডিম মুখে সারিবদ্ধভাবে চলা ইত্যাদি ঐ বাড়িতে বিয়ের আগমনী বার্তা নিয়ে আসে। অপরপক্ষে, কাঙ্খিত বিয়ে না হলে মাজারে জোড়া মোমবাতি ও জোড়া মালা দেয়া, পীর ফকিরের কাছে আশ্রয় প্রার্থণা, বিয়ের কলা খাওয়া, দুলদুল ঘোড়ার দড়ি ধরা, হোসেনী দালানের মেহেদী পরা, আমাবস্যা ও পূর্ণিমার রাতে আইবুড়ো মেয়েকে ঘরের বাইরে ডেকে এনে অকস্মাৎ তার গায়ে পানি ছুড়ে ফেলা ইত্যাদির মাধ্যমে বিয়েকে নিশ্চিত করার প্রবণতা দেখা যায় উভয় ধর্মেই। এক্ষেত্রে একটি চর্চার ধর্মীয় ভেদে পার্থক্য দেখা যায় যা প্রায় সমরূপ কার্যকারণকেই নির্দেশ করে। হিন্দুরা বিয়ের আশায় যেখানে মনসাপূজা করছে সেখানে মুসলমানরা সাত বিবির কাহিনী পড়ার আসর তৈরি করছে। এই সাত বিবির আসর ইসলামি শরিয়তি প্রথাকে অনুসরণ করে না। সাত বিবির আসর ও প্রার্থণার প্রকৃতির আলোকে ধারণা করা যেতে পারে তা হিন্দু ধর্মের ব্রতকে অনুসরণ করে গড়ে ওঠা।

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বিষয় বিবাহযোগ্য পাত্র-পাত্রীর নির্বাচন। নির্বাচনে মেয়েদের অনেক ধরণের যোগ্যতা অযোগ্যতার বিষয় সম্পর্কে কথা থাকলেও ছেলেদের ব্যাপারে কোন কথাই জানা যায় না। মেয়েদের অযোগ্যতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সর্প বা নাগিনী চুল থাকা, খরমপায়া, চিরলদাঁতী, কালঠুটি, জোট ভোমরা, বিলাই চোখী, হরিণ চোখী, হস্তিপাইয়া, গাল হাসা, দীর্ঘ ঠোট ইত্যাদি। অপরপক্ষে, শীর্ণ ও লম্বা আঙুলের অগ্রভাগের তালুতে গোল বা চক্রাকার রেখা, 'ফরিদা চোখে'র মেয়েরা সুলক্ষণা বউ হয়ে থাকে। যোগ্যতা ও অযোগ্যতার পরিমাপ থেকে তৎকালে একটি শক্তিশালী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্ব অনুধাবণ করা যায় যেখানে নারীর নিতান্তই ভোগ ও জন্মদাত্রীর ভূমিকাকেই সাগ্রহে লালন করা হয়েছে। এই ধারণা লালনে শুধু পুরুষরা ভূমিকা রাখেনি, পরিবারের মা- নারী হয়েও এ ধরণের চিন্তাধারার চর্চায় কোন কোন ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে। পুরোনো ঢাকার সমাজে বিবাহ যাত্রার প্রাক্কালে রেওয়াজ করে ছেলে মায়ের মাথায় তেল দিয়ে মাথা ঠান্ডা রাখতে ব্যগ্র হয় এবং এই বলে আশ্বস্ত করে যে 'তোমার জন্য বান্দি আনতে যাচ্ছি।' নতুন বউয়ের আগমনে পারিবারিক নেতৃত্ব ও সন্তানের কাছে মায়ের গৌণ হয়ে পরার আশঙ্কায় মায়েদের অনেকক্ষেত্রে নিজ অবস্থান টিকিয়ে রাখতে নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক আচরণ করতে দেখা যায়। এছাড়া পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের পরবর্তীতে প্রতিটি আচার অনুষ্ঠানে নানা ধরণের প্রাকৃতিক উপাদানের উপস্থিতি এই ভোগ ও যৌনতাকেই তুলে ধরেছে। উদাহরণস্বরূপ- আমরা পান, দূর্বা ঘাস, সুপারি, ধান, কলা, ফুল ইত্যাদির উপস্থিতি দেখতে পাই। পান-সুপারিসহ প্রতিটি উপকরণই আদিম সংস্কৃতির সজীবতা, যৌনতা ও উর্বরতার প্রতীকী উপস্থাপনকেই তুলে ধরে। বিয়ের অনুষ্ঠানের মঞ্চেও এই ধারা অব্যাহত দেখি উভয় ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেই। হিন্দু-মুসলিম প্রত্যেকেই বিয়ের মঞ্চ তৈরিতে কলাগাছের ব্যবহার দেখা যায়। হলুদের অনুষ্ঠানে উভয় ধর্মের অনুসারীরা হলুদের পাশাপাশি সিঁদুর, সীতা বান কুলা ইত্যাদি সংগ্রহ করা যা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি এড়িয়ে স্থানীয় ধারার পরিচয় তুলে ধরে। ধর্মীয় ব্যবধান প্রকট হওয়ার সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে সিঁদুরের পরিবর্তে লিপস্টিক বা জর্দার রঙ ব্যবহার করতে দেখা যায়। এখানে উপকরণের পরিবর্তন ধর্মীয় ব্যবধানকে অনুসরণ করলেও লাল রঙের মধ্য দিয়ে রজো:রক্তের প্রতীকী উপস্থাপনকে বজায় রেখেছে। হিন্দুরা যেখানে সোন্দা কোটার গুড়া হলুদের হাঁড়ি ঠাকুর ঘরে নিয়ে সিদ্ধ করে, মুসলমানরা সেখানে দোয়া-দরূদের মাধ্যমে হলুদের হাঁড়ি জায়েজ করছে। মেহেদী প্রকৃতপক্ষে উপাদান হিসেবে ইসলামি বা মুসলিম সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করলেও পুরোনো ঢাকার মুসলমানদের বিয়েতে মেহেদী তোলা হিন্দুদের তুলসী পূজার কথা মনে করিয়ে দেয়। বিয়েতে 'জলভরণ'

Dhaka University Institutional Repository

একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে আমরা নদীকে দেখতে পাই। হিন্দু আয়োরা নদীতে পান-সুপারি ইত্যাদি নিবেদন করে জলের সংস্থান করছে, অপরপক্ষে, পর্দাপুষিদা আবদ্ধ মুসলিম নারীরা জলভরতে অবিবাহিত কিশোরদেরকে নদীর কাছে প্রেরণ করছে। এই কিশোরেরা ওজুর পর স্থানীয় ধারা অনুসরণ করে নদীতে প্রদীপ ও আমপাতা চাটায়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে দিয়েই আমরা নদী ও জলের উর্বরতার প্রতীককে পাশাপাশি দুইটি ধর্মের ধারণার আলোকে অভিযোজিত হতে দেখি। পুরোনো ঢাকায় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বিয়ের রাতে স্বামী-স্ত্রী মিলনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হল বিয়ের রাতে স্বামী স্ত্রীর যৌন সম্পর্ককে এড়িয়ে চলা। হিন্দু পুরাণের বেহুলা লক্ষীন্দর ও মনুর উপদেশের কারণে বিয়ের রাতকে পুরোনো ঢাকার লোকেরা 'কালরাত্রি' মনে করে থাকে। লক্ষীন্দর যেভাবে বিয়ের রাতে আক্রান্ত হয়েছিল সেইভাবে আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেতেই বিয়ের রাতে স্বামী স্ত্রী কাছাকাছি থাকত না। ইসলামি শরিয়তের আলোকে বিয়ে পড়ানোর পর স্বামী স্ত্রী পরস্পরের কাছে হালাল হলেও স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাবে মুসলমানরাও বিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত এই নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করেছে। হিন্দুদের অনেকেই বিয়ের পর প্রথম এক-দুই রাত কালরাত্রি পালন করত। তবে মুসলমানদের কালরাত্রি প্রথম রাত। পরের রাত থেকেই স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্কে কোনরূপ বাঁধা নিষেধ ছিল না। কালরাত্রি পালনে তারতম্য থাকলেও 'বাসী গোসল' উভয় সম্প্রদায় বিয়ের পরের দিন সম্পাদন করত। মুসলমানদের বিয়ের পরের দিন 'বাসী নালান' আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুদের বাসী গোসলের সাথে পৃথক। হিন্দুদের বাসী গোসল মূলতঃ বিয়ের একটি অংশ। বিয়ের প্রথম রাতের পর বর কনেকে প্রথমে বাসী গোসল দিয়ে বাসী বিয়ের আসর তৈরি করা হয়। এই আসরে পুরোহিত ব্রাহ্মণ শাস্ত্র অনুযায়ী পুনরায় বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেন। পক্ষান্তরে, মুসলমানরা ইজার-কবুলের মাধ্যমে বিয়ে সম্পন্ন করে এবং তা তখনই সমাপ্ত হয়। মুসলমান সংস্কৃতির বিয়ের মৌলিক ভিত্তিগুলো পুরোনো ঢাকার স্থানীয় সংস্কৃতিতে বাসী বিয়েকে বিয়োজন করেছে। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার পরিসমাপ্তি ঘটে বিসর্জনের মধ্য দিয়ে। বিয়ের আচার অনুষ্ঠানের বিভিন্ন উপকরণ যেমন- ধান, দূর্বা, ফুল, রাখী ইত্যাদি নদীতে বিসর্জন দেয় উভয় সম্প্রদায়। বিয়েকে পবিত্র রাখতে, বিভিন্ন যাদুটোনা থেকে রক্ষা পেতে অথবা নদীকে খুশি রাখতে এধরণের বিসর্জন দুই সম্প্রদায়ের লোকেরা নিয়মতান্ত্রিক সম্পন্ন করে থাকে।

'জন্মিলে মরিতে হবে' এই অমোঘ সত্যিকে ধারণ করেই মানুষ এগিয়ে চলেছে সৃষ্টির আদি থেকেই। প্রাগৈতিহাসিক গুহা মানব তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন থেকেই মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করেছে, এর সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

ধারণা তৈরি করেছে এবং ধারণাসমূহের বিবর্তনে সাংস্কৃতিক জীবনধারায় রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে জনবল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ শিকার সংস্থানে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে ধর্মের বিকাশের পর্যায়ে মানুষ প্রার্থনা করেছে শিশুর জন্মের। অর্থাৎ শিশুজন্ম বা জন্ম তাদের কাছে আশীর্বাদ, ঈশ্বরের বা স্রষ্টার উপহার। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুকে কামনা করা মানুষের আকাঙ্খা হতে পারে না। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক মানুষ মৃত্যুকে নিয়েও ভেবেছে এবং চিন্তা করেছে। যার স্বাক্ষর আমরা দেখি নব্য প্রস্তর ও লৌহ যুগের বিশেষ ও বিচিত্র কবর প্রথার মাধ্যমে। আধুনিক গবেষক ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা বিশেষ বিশেষ ধরণের কবর প্রথার ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাগৈতিহাসিককালে মৃত্যুই জীবনের শেষ কথা ছিল না, ছিল বিশ্বাস নতুন করে জন্মানোর, ছিল বিশ্বাস পুণর্জন্মের। দেখা যাচ্ছে অনাকাঙ্খিত, কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুকে মানুষ বিশ্বাস করতে চেয়েছে জন্মের সূচনা হিসাবে। মৃত্যু যখন শুধুই মৃত্যু নয় বরং তা জীবনেরই সূচনা। জন্মের শুভলগ্নকে নির্দেশ করে। প্রাগ ইতিহাসের মৃত্যু সম্পর্কিত এই ধারণাসমূহ নানাভাবে বিবর্তিত হয়ে মানব সভ্যতার বিভিন্ন মাত্রায় ও পরিসরে বিকাশ লাভ করেছে। এই বিকাশ কখনোই সমরূপ নয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মীয় দর্শনকে আঁকড়ে সমাজ ও সংস্কৃতির স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা করেছে। তবে আমাদের আলোচ্য গবেষণায় মৃত্যু সম্পর্কিত লোকাচার, ধারণা ও দর্শন তাই স্বাভাবিকভাবে ধর্মাশ্রয়ী এবং লোকাচারের ব্যাখ্যায় আমরা মৃত্যুর পরবর্তী সত্তাকে আবিষ্কার করি মৌলিক জায়গায় যা আশীর্বাদ ও অভিশাপ উভয় প্রকার পরিণতিকেই সাক্ষ্য দেয়। মৃত্যু সম্পর্কিত লোকাচার সমূহ এখানে ধর্মভেদে সমরূপ না হলেও মৌলিকতার বিশ্লেষণে অধিকাংশ আচরণেই পরিপ্রেক্ষিতের ক্ষেত্র সমান্তরাল। এ কারণেই আমরা লক্ষ করি হিন্দুরা যখন মৃত্যু পথযাত্রীকে গঙ্গাজল সেবনে সাহায্য করে মুসলমানরাও তখন মৃতকে পানি পান করায়। জল পান করানো এখানে শুধু মুর্মূষুকে পরিচর্যার সাক্ষ্য দেয় না, সাক্ষ্য দেয় যে ভাল জীবনেরই নামান্তর যা নদীমাতৃক সংস্কৃতির আকরকে প্রতিফলিত করে। পুরোনো ঢাকায় 'মৃতাশৌচ'র ধারণারও সমরূপ বিশ্বাস পরোক্ষ ও প্রকোট ভাবে উভয়ধর্মের বিশ্বাসে আশ্রয় করে নিয়েছে। এই বিশ্বাসের মূলগত ধারণায় মৃত্যু পরবর্তী আত্মার অবস্থান, প্রকৃতি ও স্বরূপকে প্রায় একইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে উভয় ধর্মে। পরিজনের মৃত্যু শোকার্থে মুসলমানরা অতীতে একুশদিন এখন তিনদিন মাথা চিরুনি করে না, তেল সাবানসহ সকল প্রসাধন পরিত্যাগ করে। অপরপক্ষে, হিন্দুরা এসময় এক কাপড়ে নগ্ন পায়ে একই রকমভাবে সকল প্রকার প্রসাধন এড়িয়ে, বিছানার পরিবর্তে মাটিতে শোয়। কুশাসন বিছিয়ে বসে। একজ্বালা ভাত খায়, প্রতিবেলায় না হলেও অন্তত একবেলায় কাকের সাথে খাবার ভাগ করে খায় এবং প্রেতাত্মার ভয় থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য গলায় ধরা (লোহার চাবি) পরে থাকে। মুসলমানরা

Dhaka University Institutional Repository

অশুভ আত্মার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘরে লোহার পেরেক পুঁতে রাখত। নিজেকে রক্ষা করার আরো কিছু পদক্ষেপ দেখা যায় যেখানে মুসলমানরা লাশ বিদায়ের পর গোসল সেরে নিমপাতা চিবাত আর হিন্দুরা শশ্মান থেকে ফিরে লোহা কামরাত, কান সেকত, পাটপাতা, নিমপাতা অথবা আদা চিবাত। উভয় ধর্মের এই ধরণের লোকাচারে নিশ্চিতভাবেই অশুভ শক্তি অথবা আত্মার কাছ থেকে নিজ নিরাপত্তা বিধানই প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য হিন্দু মিথলজিতে মৃত্যু পরবর্তী আত্মার অশুভতার কথা জানা গেলেও মুসলিম বিশ্বাসে এধরণের ধারণাকে কখনোই প্রশয় দেয়নি। মৃত্যু পরবর্তী আত্মার প্রতি প্রীতি, ভালবাসার বহি:প্রকাশও দেখা যায়। মৃতের মুসলিম পরিবার উনিশ কিংবা একুশ দিনে 'চোরাভাতের' সংস্থান করে প্রতীকীভবে। অপরপক্ষে, হিন্দুরাও শ্রাদ্ধকালীন সময়ে মৃতের প্রিয় খাবারসমূহ নদীর ধার অথবা তিন রাস্তার মোড়ে রেখে আসে। মৃতাত্মার প্রতি ভালবাসায় হিন্দুরা চল্লিশ দিনে যেমন চল্লিশা পালন করে তেমনি হিন্দুরাও শ্রাদ্ধ পালন করে থাকে। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে এক মৃতের আত্মার অথবা রূহের মুক্তি। শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষে ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিভোজনের ব্যবস্থা করা হয় পাশাপাশি চল্লিশাতেও মিলাদ শেষে মৌলভীদের খাওয়ানোর পর মেহমানদারী করা হয়। মুসলমাদের চল্লিশা শরীয়তি দৃষ্টিভঙ্গির নির্দেশনা অনুসরণ না করলেও এর প্রতি বিশ্বাস ছিল শক্তিশালী। কখনো কখনো মৃত্যুর পূর্বেই অনেকে নিজের চল্লিশা করতেন উত্তরসূরীদের উদাসীনতা ও অক্ষমতাকে মনে রেখে। হিন্দুরা মৃতাত্মাকে সন্তুষ্ট রাখতে মৃত্যু দিবসের তিথি থেকে পরবর্তী বৎসরের সেই তিথি পর্যন্ত একবছর কালাশৌচ পালনার্থে পূজাঅর্চনা, বিবাহ, নামকরণ, অন্নপ্রাশনসহ সকল প্রকার মাঙ্গলিক কর্ম পালন করা থেকে বিরত থাকে। পক্ষান্তরে, মুসলমানরা পরিজনের মৃত্যুর পর আঠার মাস পর্যন্ত সর্বপ্রকার আনন্দ-উৎসব বর্জন করে। অমঙ্গলের ভয়ে মুসলমানরা এসময় বাড়িঘর নির্মাণ, ছেলে মেয়েদের বিয়েশাদী করানো, নতুন বস্ত্র পরিধান, ভাল খাবার গ্রহণ, সফরে বের হওয়া ইত্যাদি পরিত্যাগ করে চলে। মৃত্যু পরবর্তী নানা লক্ষণের আলোকে মৃতের পরিবার সম্পর্কে ধারণা করতে দেখা যায় উভয় ধর্মেই। মুসলমানরা যেখানে মৃত্যুর পর লাশের 'বানছাড়া', চেহারার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাওয়া ও জানাজায় অধিক সংখ্যক সমবেত হওয়াকে মৃতের আমলনামা ভাল বা নেককার হবার লক্ষণ বলে মনে করে তেমনি হিন্দুরাও মৃতের চিতা ঠিকমত জ্বলাকে তার সততার লক্ষণ আর বহু ঘি ঢালার পরও চিতা ঠিকমত জ্বলে না ওঠাকে অসততার কারণ বলে মনে করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার পরিবর্তন অভিযোজন বা বিবর্তনের আওতায় ঘটে থাকে মূলতঃ সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। মানুষ তার সংস্কৃতির স্বরূপ ধারণ করেছে প্রাগইতিহাস থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে। সংস্কৃতির এই প্রক্রিয়ার মূল চালক মানুষ নিজেই এবং সূচক হিসেবে কাজ করেছে সময়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন ঘটেছে চিন্তা, ধরণা, দর্শন, যুক্তি, ধর্ম, অর্থনীতি ইত্যাদির গড়ন ও পরিকাঠামো। দৃষ্টিভঙ্গিকে যদি 'সমগ্র'র আলোকে দেখি তা হলে দেখব এই সমগ্রের প্রতিটি উপাদান অন্ত ও আন্তঃকেন্দ্রীক ক্রমশ পরিবতনশীল এবং প্রতিটি পরিবর্তনে 'সমগ্র' পরিবর্তিত হচ্ছে। আলোচ্য গবেষণায় সংস্কৃতির পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াগুলোকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে লক্ষ রাখা জরুরী। লক্ষ করলে দেখা যাবে পুরোনো ঢাকায় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিকতাবাদ নির্ভর দর্শন নানাবিধ আচারিক কর্মকান্ডের জন্ম দিচ্ছে বিশ্বাস ও চর্চার মাধ্যমে। এই বিশ্বাস সমূহের স্বরূপ ধর্মনির্ভর কিন্তু ধর্মকেন্দ্রীক নয়। গবেষণার ফলাফল পরীক্ষা নিরীক্ষণ করে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন লোকাচারের বিশ্বাস চর্চার ব্যপ্তি ধর্মীয় আবহ ও ভাবধারাকে ধারণ করলেও অতিক্রম করছে ধর্মের সামাজিক, সাংস্কৃতিক সীমানা। আমাদের আলোচ্য সময়ে এই সীমা অতিক্রম স্থানীয় ও সনাতনী ধারার চর্চার ফলেই সম্ভব হয়েছিল বলে আমরা মনে করি। কিন্তু পরবর্তীতে এই লোকাচার বা ধারণা সমূহের পরিবর্তন, নিজস্ব স্বরূপচ্যুতি ও বিলুপ্তির মূল কারণগুলোর মধ্যে ইউরোপীয় শিক্ষার বিস্তার, স্থানীয় প্রাযুক্তিক উন্নয়ন, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংক্রান্ত অধ্যয়ন এবং সর্বোপরি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব উল্লেখযোগ্য। এই সকল কারণগুলোর ক্রমাগত প্রশ্ন করেছে সমাজের লোকাচার ও বিশ্বাসের ধর্মীয় বিশ্বাস ও চর্চাকে। এ সময়ের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সমস্ত লোকাচারকে দূরীভূত করেছে বলা যাবে না। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিকাশ, ধর্মের নিত্যনতুন ব্যাখ্যা অনেক লোকাচার বিলুপ্তিতে যেমন কাজ করেছে, তেমনি অনেক বিশ্বাসকে প্রতীকী অর্থে প্রতিষ্ঠিত করেছে আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত সমাজে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

উনিশ শতকে কলকাতা অপেক্ষা ঢাকায় মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিয়ের অনুষ্ঠানে অধিক অর্থ ব্যয় হত। কিন্তু ঢাকার হিন্দু-মুসলমানদের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানাদিতে অপেক্ষাকৃত কম খরচ করা হত। শহরের ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে খুব সংখ্যক লোক শেষকৃত্যমূলক অনুষ্ঠানে মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করত। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর অধিবাসীদের মধ্যে এতৎসংক্রান্ত খরচপত্র ছিল তুলনামূলকভাবে পরিমিত। এই উপলক্ষে নিম্ন শ্রেণীর অন্তভূর্ক্ত হিন্দু-মুসলমানের খরচের নিম্নতম হার প্রদত্ত হলো:

হিন্দু নিম্ন শ্রেণীর বিবাহের সর্বনিম্ন খরচের তালিকা

খরচের বিবরণ	টাকা	আনা
ব্রাহ্মণ	১	০
বর ও কনের জন্য কাপড়-চোপড়	২	০
শঙ্খ নির্মিত বালা	১	০
চিরুণী ও সিঁদুর	০	৪
অলঙ্কারাদি	১	০
বাদ্যকরগণ	০	৪
কনের মাথার চূড়া বা চাঁদি	১	০
ধোপা	০	৪
নাপিত	০	৪
ভোজ	২	০
বিবিধ	১	০
সর্বমোট-	১০	০

উৎস: জেমস টেলর, কোম্পানী আমলে ঢাকা, পৃ: ১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের বিবাহ খরচ

খরচের বিবরণ	টাকা	আনা
কাজি	০	৮
পোষাক-পরিচ্ছদ (বর কনের)	৩	০
চিরুণী ও অন্যান্য	০	৪
চুড়ি বা বালা	০	৮
মাথার চূড়া বা চাঁদি	০	৮
নাপিত	০	৪
ভোজ	২	০
গান-বাজনা ও অন্যান্য খরচ পত্র	৩	০
সর্বমোট-	১০	০

উৎস: জেমস টেলর, কোম্পানী আমলে ঢাকা, পৃ: ১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের খরচ

খরচের বিবরণ	টাকা	আনা
শেষকৃত্য সংক্রান্ত বস্ত্রাদি	০	৮
চিতাগ্নি তৈরির জন্য একজন ডোমকে দেয়	০	৮
অগ্নিকাষ্ঠ	০	১২
সন্দাল, ঘি ও বাঁশ ইত্যাদি	০	৪
	শ্রাদ্ধপর্বঃ	
ব্রাহ্মণ	১	০
বস্ত্রদান	১	০
চাল ও ডাল	২	০
ব্রাহ্মণগণের জন্য ভোজানুষ্ঠান	১	০
পিতলের পাত্র ইত্যাদি	১	০
নাপিত	০	৪
ধোপা	০	৪
বিবিধ	০	৮
সর্বমোট-	৯	০

উৎসঃ জেমস টেলর, কোম্পানী আমলে ঢাকা, পৃঃ১৯২।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের বিবাহ খরচ

খরচের বিবরণ	টাকা	আনা
কবর খননকারী	০	১২
কবাধার, কাপড়, মাদুর, বাঁশ ইত্যাদি	১	০
মোল্লা	০	৪
চার জন মোল্লা	১	০
খাদ্য ইত্যাদি	০	৪
তাম্র থালা ও অন্যান্য	১	০
গরীবদের মধ্যে কড়ি বিতরণ	০	৪
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফাতেহা উপলক্ষে খরচ	২	৮
সর্বমোট -	৭	০

উৎস: জেমস টেলর, কোম্পানী আমলের ঢাকা, পৃ: ১৯০-১৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ৫

১৯০৮ সালে সোনা-রূপার বাজার মূল্যের তালিকা। এক বনেদি পরিবারের কন্যাকে পিত্রালয় থেকে প্রদানকৃত গহনা (সোনার জড়োয়া) এবং রূপার জিনিসের মূল্যসহ সংগৃহীত তালিকা দেয়া হল:

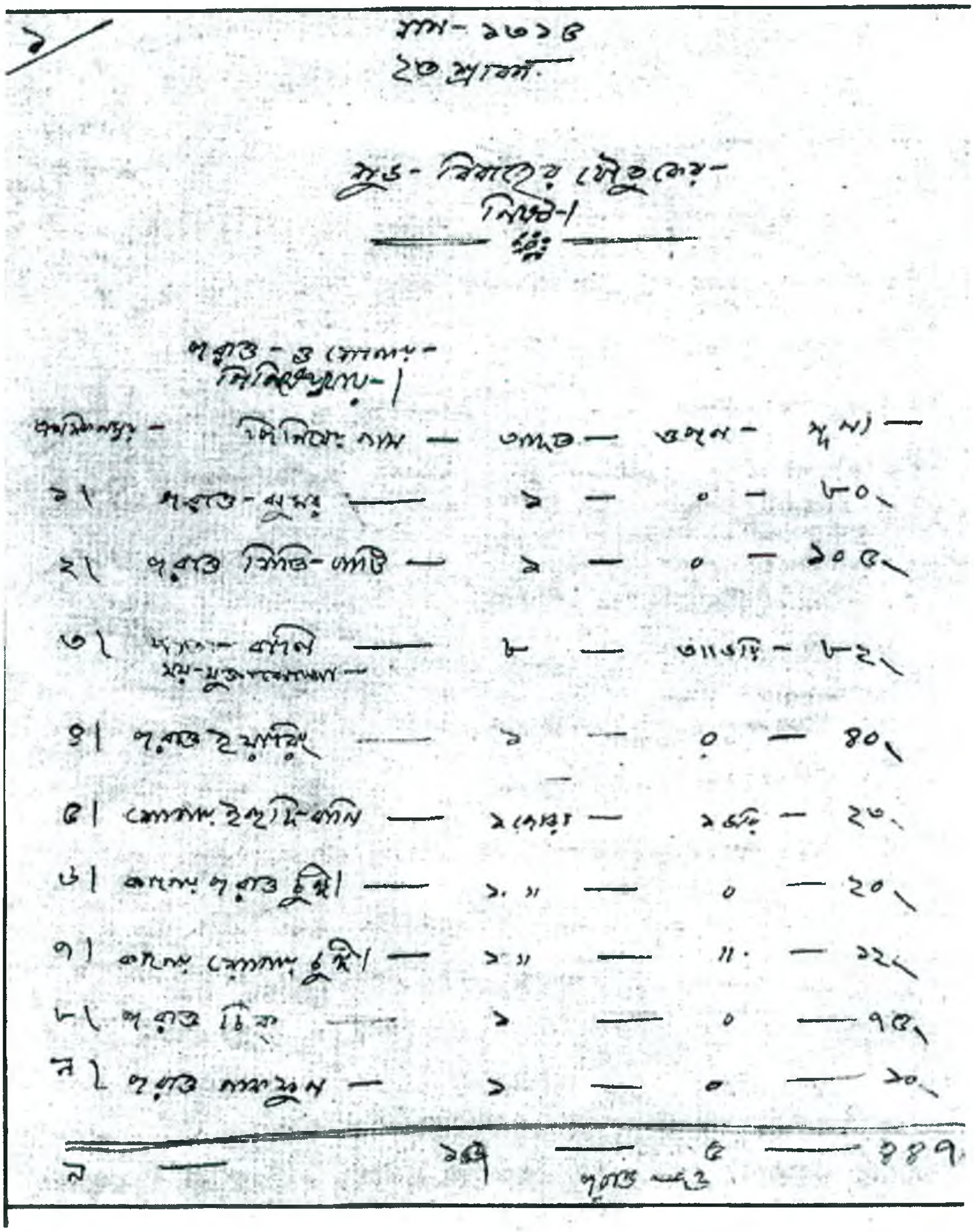

১/

সন- ১৩১৪
২৩ শ্রাবণ

শুভ- বিবাহের যৌতুকের-
নিদর্শ-।

গহনা - ও সোনার-
জিনিষপত্রের-।

ক্রমিকসংখ্যা	জিনিসের নাম	ভরি	রতি	মূল্য
১।	সোনার- ঝুমকা	১	০	৮০
২।	সোনার সিঁথি-পাটি	১	০	১০৫
৩।	[illegible] বালা ময়-মুক্তাবসান	৮	৩।৩রতি	৮২
৪।	সোনার ইয়ারিং	১	০	৪০
৫।	সোনার ইয়ারিং-বালা	১ জোড়া	১রতি	২৩
৬।	কানের সোনার চুড়ি	১	০	২০
৭।	কানের সোনার চুড়ি	১	॥	১২
৮।	সোনার টিকা	১	০	৭৫
৯।	সোনার মাদুলি	১	০	১০
৯		১৪	৫	৪৪৭

সোনার দ্রব্য

২

ইং৭১		ইং৭২ / ২৭	ইং৭১ / ৫	ইং৭২ / ৪৪৭
১০।	পুরাতন [illegible]	১	০	২০৫
১১।	মোসাম্মৎ [illegible]	১ মোড়া	৬ ভড়ি	১৫০
১২।	মোসাম্মৎ [illegible]	১ "	৩ "	৭০
১৩।	পুরাতন [illegible]	১	০	৬০
১৪।	মোসাম্মৎ [illegible]	১	১ ভড়ি	২৪
১৫।	মোসাম্মৎ [illegible]	১ মোড়া	[illegible] ভড়ি	২৫০
১৬।	মোসাম্মৎ [illegible]	১ "	[illegible]	৮৮
১৭।	মোসাম্মৎ [illegible]	৪	৫ [illegible]	১২০
১৮।	মোসাম্মৎ [illegible]	১ মোড়া	৪	১০৮
১৯।	মোসাম্মৎ [illegible]	১	১৩	৪৩২
২০।	মোসাম্মৎ [illegible]	১ মোড়া	১০	২৭০
২০		৩৫	[illegible]	২২৩৪

পুরাতন - ৮ [illegible]

উৎস: আমেতুল খালেক বেগম, আমার দেখা ঢাকা শহর: জীবন পাতার জলছবি, পৃ: ১০১-১০২।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৬

বিবাহের প্রীতি উপহার

Dhaka University Institutional Repository

"তোমরা যাতে করে এক সঙ্গে বাস করতে পার সেই জন্য তোমাদের জীবন—সঙ্গিনীকে তোমাদের থেকে আল্লাহ পয়দা করেছেন।"

—আল-কোরআন—

"খোদা-ভীতির পর ধার্মিকা স্ত্রী ছাড়া মোমিনের আর অন্য কোনও বস্তুতে মঙ্গল নাই।"

—আল-হাদিস—

Dhaka University Institutional Repository

আশীর্ব্বাদ :

নতুন যাত্রাপথে তোমরা পা বাড়িয়েছ। তোমাদের পথ চলায় যাঁর আশীর্বাদ মনে এনে দিত অপরিসীম উৎসাহ আর কর্মে জোগাত অদম্য প্রেরণা, নিয়তির অমোঘ বিধানে আজ তিনি দূরে—বহু দূরে। তাই আশীর্বাদ করার পালা পড়েছে আমার উপর। আশীর্বাদ করতে গিয়ে বার বার শুধু তাকেই মনে পড়ছে—যাঁর স্নেহের পরশ থেকে তোমরা আজ বঞ্চিত! কিন্তু মনে হচ্ছে তিনি অলক্ষ্যে থেকে তোমাদের দীর্ঘ জীবন কামনা করছেন। আর তাঁকে অনুসরণ করেই আমি দোয়া করছি তোমরা সুখী হও—তোমাদের যাত্রাপথ শুভ হউক।

তোমাদের মা

Dhaka University Institutional Repository

বড় বোনদের শুভেচ্ছা :

পরম দয়ালু করুণাময়ের ইচ্ছায়, তাহার উপর আস্থা—বিশ্বাস এবং সাক্ষী রাখিয়া আজ তুমি যাহার হাত ধরিয়া যে সংসারকে উজ্জল করিতে আসিয়েছ, আমি সেই করুণাময়ের নিকট কামনা করি তিনি তোমার আগমনে এ সংসারকে ঐশ্বর্যের আলোতে উজ্জল করিয়া তোলেন।

তোমাদের নব-দম্পতির দাম্পত্য জীবন জ্যোৎস্না রাতের মত উজ্জল হোক, করুণাময়ের নিকট এই দোয়া করি—আমিন।

তোমাদেরই
বড় বোনেরা

Dhaka University Institutional Repository

ভাই ও ভাবী :

ভাই, আজ তুমি বর সেজে চলেছ একজনকে বরণ করতে, সেই একজনই হবে মোদের ভাবী, যিনি আদর, সোহাগ, স্নেহ মমতায় মোদের ভরিয়ে রাখবে, তাই বলে ভাবীর গুণমুগ্ধ হয়ে আমাদের ভুলোনা যেন।

ভাবী :

এতদিন তুমি লাগামহীন ঘোড়ার মত বেড়াচ্ছিলে। আজি এ বসন্তের শীত বেলায় তোমার নবগৃহে ও নব-জীবনে পদার্পন হলো এ গৃহ তোমারই আপনার, তুমি একে আপন করে নাও। আমাদের ভাইটিকে আদর যত্নে মুগ্ধ করে রাখ, ভুলিয়ে দাও যত দুঃখ বেদনা। সুখে দুঃখে এক সাথে থেকো।

আমরাও তোমার কাছে আজ সোহাগ পেতেই আশা করি ; আজকের দিনে তোমার শুভ কামনা করি।

তোমাদের স্নেহের :

আবদুর রসিদ আজাদ, বেগম রসিদ আজাদ,

আবুল বাসার ও হালিমা।

Dhaka University Institutional Repository

আবদার ঃ

মামুজান,

আমরা আপনার কচি কচি ভাগ্না-ভাগ্নী। আজ আপনার শুভ বিবাহ লগনে আমাদের মনে কতইনা আনন্দ। মামীজানকে স্বাগতম জানা'তে আমাদের মনে যে আনন্দ আজ বিরাজ করছে সেই আনন্দ যেন চিরস্থায়ী হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। মামীকে পাওয়ার পর আমাদের আনন্দে ও স্নেহে যেন ভাটা না পড়ে, তাহলে আমাদের কচি কচি মনে দুঃখের দাগ পড়ে যাবে এবং আমাদের কচি মনের আনন্দ অকালেই ঝরে পড়বে।

আপনাদের দাম্পত্য জীবন সুখী হউক—অক্ষয় হউক। আমীন।

আপনারই—

সালমা, আনার, হামিদা,

রীনা, আফরোজা, আলাউদ্দিন,

ও সলিম।

Dhaka University Institutional Repository

চাচীজান,

চাচী মোদের দেখলে পরে
মানুষ যে তাই হিংসা করে।
মানিক যে তার গায়ে ঝোলে
আমাদেরকে রাখবে কোলে।
মায়ের দুঃখ এবার ভুলব বলে
খোদার ইচ্ছায় চাচি আসলে।

এলাহী বক্স আজাদ, তারেক, আহাম্মদ ওসমানী, সাহিদা ও মুক্তা।

Dhaka University Institutional Repository

দোয়া ঃ

হে খোদা,

আজ তোমারই লীলায় এ দু'টি প্রাণ
এক হলো, তুমি এদের সঠিক পথে চালনা
করে সুখে ও শান্তিতে রাখ।
প্রভু, তোমারই আশীর্বাদ এ প্রাণে
হলো মিলন,
সুখে যেন থাকে প্রভু
এ দু'টি কোমল প্রাণ।

Dhaka University Institutional Repository

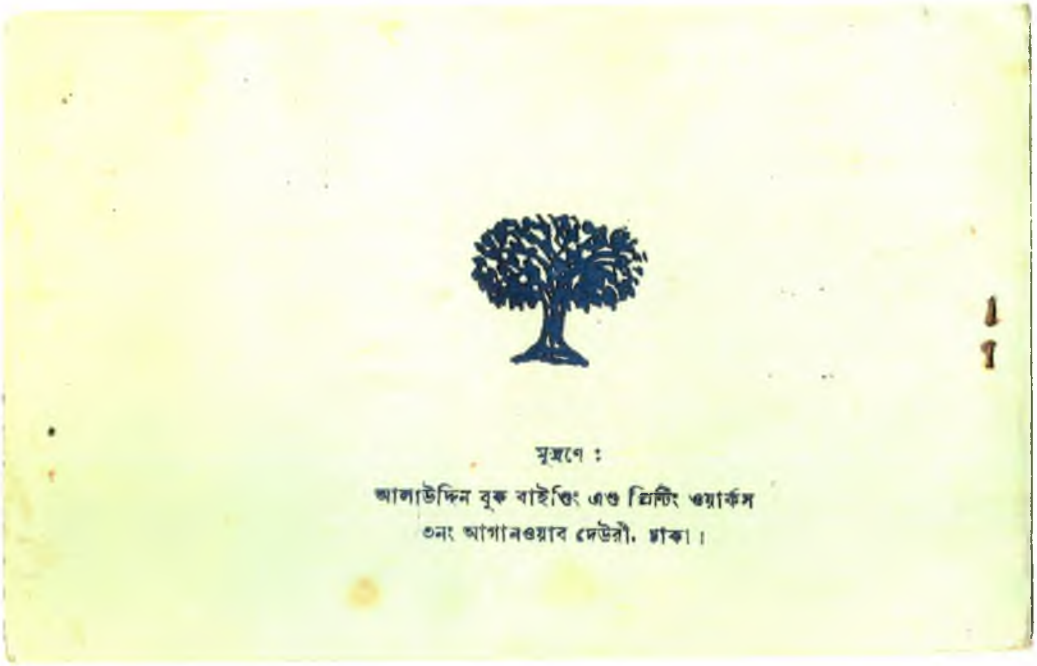

মুদ্রণে :
আলাউদ্দিন বুক বাইণ্ডিং এণ্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩নং আগানওয়াব দেউরী, ঢাকা।

উৎস: রাহেমা বেগম- বেচারাম দেউরি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৭

কান ফুঁড়ানির গান

মায় বলে ফুলজান, ফুলজান
বাপে বলে জি।
একটি মাসে তিনটি নাকফুল ক্যামনে হারাইলি,
রসের ফুলজান লো।
আপনা ইচ্ছায় বইছচ বিয়া,
জিনিস লইছচ কি?
আলসি লইছি, কালসি লইছি
আরো লইছি নথ,
লক্ষ টাকার কাবিন লইছি মোহরানার হক।
রসের ফুলজান লো।

উৎস: জুইমা হিজরা, আমলিগোলা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৮

বিয়ের গান

সারোতা কাহা ভুল গায়ি ছোটি নানাদিয়া
তারে নারে ধাইয়া
মায় বেচারা পান খাবে চুনা চাটে সাইয়া
তারে নারে ধাইয়া
মায় ভুল গায়ি সারোতা কাহা ছোটি নানাদিয়া
তারে নারে ধাইয়া
একছাল্লা মেরা বাগিচামে গেরা
বাগিচা ভাইয়া দে দো
মায় তোর বালা হারিয়া
সারোতা কাহা ভুল গায়ি ছোটি নানাদিয়া
তারে নারে ধাইয়া
একছাল্লা মেরা সিকসিনমে গেরা
দারোগা ভাইয়া দে দো
মায় তোর বালা হাড়িয়া
সারোতা কাহা ভুল গায়ি ছোটি নানাদিয়া

উৎস: সেলিমা রহমান- উর্দুরোড, আফসানি বেগম- রহমতগঞ্জ, জারিনা- চকবাজার, সাহানি- খাজে দেওয়ান।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৯

সাপ সংক্রান্ত মিথ

শ্রুতীয় জনৈক্য নারীর গর্ভে একটি সাপ জন্ম নিয়েছিল। পরিবারের অন্য সদস্যদের মত জন্মদাত্রী মা-ও ভয়ে সাপ সন্তানটির কাছে যেত না। তবে শিশু সাপটির পিতা তার প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সে তার সাপ সন্তানের জন্য পিঁজরা তৈরি করিয়ে সেটার ভেতর তাকে প্রতিপালন করে। প্রতিদিন তাকে বাটি ভরে দুধ খাওয়াত। শিশু সাপটি একটু বড় হলে তার জন্য প্রতিদিন একটি মুরগি, কিছুদিন পর প্রতিবেলায় একটি করে মুরগি খেতে দেয়া হত। এক পর্যায় দুই দিন অন্তর সাপটির একটি আস্ত খাসির প্রয়োজন পরত। হঠাৎ একদিন পিতা মারা গেল। সাপ সন্তানের দেখভাল করার আর কেউ রইল না। সাপটি ক্ষুধার জ্বালায় পিঁজরা কেটে বেড়িয়ে পরে জঙ্গলে। বেশ কয়েক বছর পর পরিবারের ওয়ারিশদের মাঝে সম্পদ বন্টনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। সেই পরিবারে ওয়ারিশ ছিল ছয়জন। ছয় ভাগের উদ্দেশ্যে সম্পদ বন্টনকালে দেখা যায় প্রতিবারই সাত ভাগে বন্টন সম্পন্ন হচ্ছে। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য ওয়ারিশগণ মহল্লার সর্দার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের শরণাপন্ন হয়। এবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায় সকলে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পরে। অবশেষে বয়োজ্যেষ্ঠ একজন মায়ের কাছে জানতে চায় তাদের পরিবারে আরো অন্য কোন ওয়ারিশ আছে কিনা। তখন মায়ের মনে পরে সাপ সন্তানটির কথা। মা স্মরণ করতেই বন্টন সভায় একটি বিরাটাকার অজগর সাপের আগমন ঘটে। উপস্থিত সবাই প্রচন্ড ভীত হয়ে পরে। কিন্তু মা সবাইকে এই বলে আশ্বস্ত করে যে সাপটি কারো কোন ক্ষতি করবে না। এসময় সাপটি ফনা তুলে একের পর এক বন্টননামা দেখতে থাকে। অত:পর বেশ কিছুক্ষণ মায়ের সংস্পর্শের আশায় অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু মায়ের পক্ষ থেকে কোনরূপ সাড়া না পেয়ে লেজ দিয়ে নিজ ভাগের অংশটুকু মায়ের অংশের সাথে মিলিয়ে দিয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করে। আর কোন দিনও ফিরে আসেনি।

উৎস: আহম্মদি আক্তার, আমলিগোলা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১০

অষ্টাদশ, উনিশ ও বিশ শতকে ঢাকার জনসংখ্যা:

উৎসর	ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা
১৭০০	৯০০,০০০
১৮০০	২০০,০০০
১৮১৪	২০০,০০০
১৮২৪	৩০০, ০০০
১৮৩৮	৬৮,০০০
১৮৬৭	৫১,৬৩৬
১৮৭২	৬৯,২১২
১৮৮১	৮০,৩৫৮
১৮৯১	৮৩,৩৫৮
১৯৯১	১০৪,৩৮৫
১৯১১	১২৫১,৭৩৩
১৯২১	১৩৭,৯০৮
১৯৩১	১৬১,৯২২
১৯৪১	২৩৯,৭২৮
১৯৫১	৩৩৫,৯২৮
১৯৬১	৫৬০,১৪৩
১৯৭৪	১৬,৮০,০০০
১৯৮১	৩৪,৪০,০০০
১৯৯১	৬১,৫০,০০০
২০০১	৩,৮৯,৮৭,১৪০
২০১১	৪,৭৪,২৪,৪১৮

উৎস: *মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকের ঢাকা, পৃ:৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

*শরীফ উদ্দিন আহমদ, 'নগরায়ন ও নগন সংস্কৃতি,' সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃ: ৪২৮-৪২৯।

* B. C. Allen, Eastern Bengal District Gazetters- Dacca, 1912, p,58.

*Statistical yearbook of Bangladesh, 23rd edition, Bangladesh Bureau of statistics, p, 23.

* Bangladesh Bureau of Statistics. (2012). *Community Report: Dhaka Zila, June 2012.* Ministry of Planning.

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থ:

আউয়াল, ইফতিখার-উল সম্পাদিত, (২০০৩), *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী: বিবর্তন ও সম্ভাবনা*, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা।

আখতার, শাহীদা, (১৯৯৭), *গায়ে হলুদ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আমিন, সোনিয়া নিশাত, (২০১০), *ঢাকা শহর জীবনে নারী*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

আহমদ, আবুয্ যোহা নূর, (১৯৭৫), *উনিশ শতকে ঢাকার সমাজ জীবন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আহমদ, ওয়াকিল, (১৯৯৭), *উনিশ শতকে বাঙ্গালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আহমদ, ওয়াকিল, (২০০১), *বাংলার লোক-সাংস্কৃতি*, গতিধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

আহমদ, মনোয়ার, (২০০৮), *ঢাকার পুরোনো কথা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আহমদ, মালিনী ও মুখ্যোপাধ্যায়, সোমা, *মুসলিম মেয়েদের বিয়ের গান*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা।

আহমেদ, রাজিউদ্দিন, (১৯৯৫), *পুরনো ঢাকার জীবনযাত্রা ও প্রাথমিক কথা*, প্যারাগণ পাবলিশার্স, ঢাকা।

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন, (২০০১), *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ঢাকা।

আহসান, সৈয়দ আলী, (২০০৩), *ষাট বছর আগের ঢাকা*, বাতায়ন প্রকাশনা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ইমাম, আলী, (২০০৯), *জাহাঙ্গীর নগর থেকে ঢাকা*, সৃজনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ইয়াসমিন, ফিরোজা সম্পাদিত, (২০১০), *ঢাকাই উপভাষা প্রবাদ-প্রবচন কৌতুক ছড়া*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, নিমতলা, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম, এম মোফাখখারুল ও মাহমুদ, ফিরোজ, (২০১২), *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল: অর্থনীতি ও সংস্কৃতি*, দ্বিতীয় খন্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, নিমতলা, ঢাকা।

ইসলাম, নজরুল, (১৪০২), *বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা।

ইসলাম, রফিকুল, (২০০১), *ঢাকার কথা ১৬১০-১৯৪৭*, আহামদ পাবলিশিং হাউস, জিন্দাবাহার, ঢাকা।

ইসলাম, সিরাজুল সম্পাদিত, (২০০৭), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, নিমতলী, ঢাকা।

ইসলাম, মাহমুদা, (১৯৯৬), *বিয়ে*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ওয়াইজ, জেমস, (১৯৯৯), *পূর্ববঙ্গের জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, অনুবাদ-ফওজল করিম, মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, আইসিবিএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

করিম, আবদুল, (২০০৩), *মোগল রাজধানী ঢাকা*, ড. মোহাম্মদ মুহিবউল্লাহ ছিদ্দিকী অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

করিম, এফ, (২০০৮), *ঢাকাইয়া রসিকতা*, ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল, (১৯৯০), *চক বাজারের কেতাবপট্টি*, ঢাকা নগর জাদুঘর, ঢাকা।

কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল, (২০০৮), *ঢাকার ইতিবৃত্ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি*, গতিধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

কুন্ডু, গোরাচাঁদ, (১৯৯১), *লোক-শ্রুতির মনঃকুলাচার সমীক্ষা*, বেস্ট বুক্স্, কলকাতা।

ক্যাম্পবেল, জোসেফ, (১৯৯৫), *মিথের শক্তি*, খালিকুজ্জামান ইলিয়াস অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ক্লে, আর্থার লয়েড, (১৯৯০), *ঢাকা: ক্লে, র ডায়েরী ১৮৬৬-১৮৬৭*, মুনসাতীর মামুন সম্পাদিত, ঢাকা নগর জাদুঘর, ঢাকা।

খবীর, আহমেদ মীর্জা, (১৯৯৫), *শতবর্ষের ঢাকা*, রাশেদ হাসান, ঢাকা।

খাতুন, হাবিবা ও খাতুন হাফিজা সম্পাদিত, (২০১০), *ঢাকাই খাবার*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, নিমতলা, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

খান, এ এইচ, (২০০৯), *বিয়ে*, পঞ্চম সংস্করণ, বাংলাদেশ কালচারাল ফোরাম, ঢাকা।

খান, এ এইচ, (২০০৫), *কালের সাক্ষী ঢাকা*, আবু জাফর অনূদিত, খোসরোজ কিতাব মহল, বাংলাবাজার, ঢাকা।

খালেকুজ্জামান, মোঃ, (২০০২), *বিজন জনপদ থেকে রাজধানী ঢাকা*, দিব্য প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা।

গেডেডস, প্যাট্রিক, (১৯৯০), *ঢাকা নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রতিবেদন* ১৯১৭, ঢাকা নগর জাদুঘর, গ্রীণরোড, ঢাকা।

গোস্বামী, নৃপেন্দ্র, (১৩৮১), *ভারতীয় সমাজ ও বিবাহ*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

ঘোষ, বিনয়, (২০০০), *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০-১৯০০*, বুক ক্লাব, ঢাকা।

চক্রবর্তী, বরুন কুমার, (১৯৯৫), *লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

চক্রবর্তী, বরুন কুমার, সম্পাদিত, (১৯৯৫), *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা।

চক্রবর্তী, শিব শঙ্কর, (১৪১৮), *সুদর্শন ফুল পঞ্জিকা*, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, ঢাকা।

চক্রবর্তী, শিব শঙ্কর, (১৯৯৫), *হিন্দু বিবাহ*, আনন্দ পাবলির্শাস, ঢাকা।

চট্টোপাধ্যায়, শ্রীলেখা সম্পাদিত, (১৯৯৭), *মেয়েলী ব্রত*, প্যাপিরাস, কলকাতা।

চৌধুরী, মোমেন, (১৯৯৯), *বাংলাদেশের লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান জন্ম ও বিবাহ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

জলিল, মুহাম্মদ আবদুল, (১৯৯৪), *বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের মেয়েলী গীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

জাব্বার, আবদুল, (১৯৮৪), *বাংলার চালচিত্র*, বর্ণালী, ঢাকা।

ঝাঁ, শক্তিনাথ, (১৯৯৬), *মুসলমান সমাজের বিয়ের গান*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

টেলর, জেমস, (১৯৭৮), *কোম্পানী আমলে ঢাকা*, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

তায়েশ, মুনশী রহমান আলী, (২০০৭), *তাওয়ারিখে ঢাকা*, ড.এ.এম.এম. শরফুদ্দীন অনূদিত ও সম্পাদিত, দিব্য প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা।

নাথান, মির্জা, (১৯৭৮), *বাহারিস্থান-ই-গায়েবি*, খালেকদাদ চৌধুরী অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

পাঠান, মুহাম্মদ হাবিবুল্লা, (২০০০), *নরসিংদি গাজীপুরের লোকঐতিহ্য বিবাহ ও মেয়েলী ছড়া-গীত*, গ্রন্থ সুহৃদ প্রকাশন, নরসিংদী।

ফ্রয়েড, সিগমুন্ড, (১৯৯৩), *টোটেম ও টাবু*, ধনপতি বাগ অনূদিত, সুবর্ণ রেখা, কলিকাতা।

বসাক, শীলা, (১৯৯৮), *বাংলার ব্রতপার্বণ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

বসু, অমিতাকুমারী, (১৯৫৭), *বিচিত্র বিবাহ*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা।

বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, (১৯৮৭), *বাংলার লৌকিক দেবতা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

বার্ট, এফ. বি. বাডলী, (২০০৬), *প্রাচ্যের রহস্য নগরী ঢাকা*, রহীম উদ্দিন সিদ্দীকী অনূদিত, সাহিত্য প্রকাশনালয়, বাংলাবাজার, ঢাকা।

বিদ্যাবিনোদ, কালীকিশোর সংকলিত, (২০০৮), *মেয়েদের ব্রতকথা*, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা।

বেগম, আমেতুল খালেক, (২০১১), *আমার দেখা ঢাকা শহর: জীবন পাতার জলছবি*, জ্যোৎনা পাবলিশার্স, ঢাকা।

বেগম, শাহীন, (২০০৪), *ভ্রূণের আর্তনাদ*, মহানগর প্রকাশনী, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী, (১৯৯৪), *নিয়তিবাদ: উদ্ভব ও বিকাশ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ক্যাপ, কলকাতা।

মজুমদার, কেদারনাথ, (২০০৮), *ঢাকার বিবরণ ও ঢাকা সহচর*, গতিধারা, বাংলাবাজার।

মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ সম্পাদিত, (১৯৯২), *ঢাকার লোক কাহিনী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মর্গ্যান, লুইশ হেনরী, (১৪০১), *এনসিয়েন্ট সোসাইটি*, অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, দীপায়ন, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

মাইতি, প্রদ্যোত কুমার, (১৯৮৮), *বাংলায় লোকধর্ম ও উৎসব পরিচিতি*, পূর্বাদি প্রকাশনী, কলকাতা।

মামুন, মুনতাসীর, (২০০১), *উনিশ শতকের ঢাকা*, অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মামুন, মুনতাসীর, (২০০৬), *উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সমাজ*, সাহিত্য বিলাস, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মামুন, মুনতাসীর, (২০০৩), *ঢাকা সমগ্র-১*, অন্যন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মামুন, মুনতাসীর, (২০১০), *ঢাকার স্মৃতি-৯*, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা।

মামুন, মুনতাসীর, (১৯৯৪), *হৃদয়নাথের ঢাকা শহর (নতুন ও পুরাতন)*, ব্রাক প্রকাশনা, ঢাকা।

মালেক, আবদুল সংকলিত ও সম্পাদিত, (২০০৭), *ঢাকা রচনাপঞ্জী সংকলন*, ঢাকা কেন্দ্র, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা।

মিত্র, সনৎকুমার সম্পাদিত, (১৯৯৫), *মেয়েলি ব্রত বিষয়ে*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

মুরশিদ, গোলাম, (২০০৬), *হাজার বছরের বাঙ্গালি সংস্কৃতি*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, সূত্রাপুর, ঢাকা।

মোহসীন, কে. এম ও আহমেদ, শরীফ উদ্দিন সম্পাদিত, (২০০৭), *সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, নিমতলী, ঢাকা।

রফিক, রফিকুল ইসলাম, (২০০৮), *ঢাকায় বিনোদন*, বর্তমান সময়, বাংলা বাজার, ঢাকা।

রহমান, মীজানুর, (২০১১), *ঢাকা পুরাণ*, প্রথমা প্রকাশন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

রহমান, হাকিম হাবিবুর, (১৯৯৮), *আসুদ গানে ঢাকা*, খাজা মঈনউদ্দিন অনূদিত, কৃষ্ণচূড়া প্রকাশনী, ঢাকা।

রহমান, হাকিম হাবিবুর, (১৯৯৫), *ঢাকা পাচাস বারাস পহেলে*, ড. মোহাম্মদ রেজাউল করিম অনূদিত, প্যাপিরাস, ঢাকা।

রহমান, হাকিম হাবিবুর, (১৯৯৫), *ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে*, অনুবাদ- হাশেম সূফি, ঢাকা ইতিহাস গবেষনা কেন্দ্র, ঢাকা।

রহিম, এম. এ, (১৯৮২), *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রামানুজন, এ. কে. এইচ. সংকলিত ও সম্পাদিত, (১৯৯৮), *ভারতের লোককথা*, মহাশ্বেতা দেবী অনূদিত, ন্যাশলান বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া।

রায়, নীহাররঞ্জন, (১৩৫৯), *বাঙালীর ইতিহাস: আদি পর্ব*, বুক এমপোরিয়াম, কলকাতা।

রায়, বঙ্গেশ্বর, (১৯৯০), *ঢাকা আমার ঢাকা*, কলকাতা।

রায়, যতীন্দ্রমোহন, (২০০৭), *ঢাকার ইতিহাস*, বইপত্র, বাংলাবাজার, ঢাকা।

রাহমান, সেলিমা, (১৯৯৪), *ঢাকা আমার ঢাকা*, সম্রাজ্ঞী প্রকাশনা, আরামবাগ, ঢাকা।

শরীফ, আহমদ, (১৯৯২), *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব*, সাহিত্যলোক, কলকাতা।

সাহা, অবিনাশ, (১৩৬৫), *ঢাকাই গল্প*, প্রকাশ মহল, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা।

সিদ্দিকী, আশরাফ, (১৯৭৮), *লোকায়ত বাংলা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সিদ্দিকী, আশরাফ, (১৯৯৫), *লোক সাহিত্য*, মল্লিক ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।

সুর, অতুল, (১৯৯৪), *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, সাহিত্যলোক, কলকাতা।

সুর, অতুল, (১৩৮০), *ভারতের বিবাহের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সেন, পরিতোষ, (১৩৮৬), *জিন্দাবাহার*, প্যাপিরাস, কলকাতা।

সেন, সৌমেন, (২০০৩), *লোক সংস্কৃতি তত্ত্বজিজ্ঞাসা*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা।

সেনগুপ্ত, পল্লব, (১৯৮৪), *পূজা-পার্বণের উৎসকথা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

সেনগুপ্ত, পল্লব, সম্পাদিত, (১৯৯৫), *লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি*, দ্বিতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

সোলায়মান, সায়েম সম্পাদিত, (২০০৮), *আমার সাত দশক-শিল্পপতি আনোয়ার হোসেনের আত্মজীবনী*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ধানমন্ডি, ঢাকা।

হাফিজ, আবদুল, (১৯৯৪), *লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।

হায়াৎ, অনুপম, (২০০১), *নবাব পরিবারের ডায়েরিতে ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ চট্টগ্রাম-ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

হায়াৎ, অনুপম, (২০০১), *পুরোনো ঢাকার সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হুমায়ুন, রাজিব, (২০১০), *পুরোনো ঢাকার ভাষা*, মিনিওয়ার্ল্ড, মীরপুর, ঢাকা।

হোসেন, নাজির, (১৯৯৫), *কিংবদন্তির ঢাকা*, ৩য় সংস্করণ, থ্রি ষ্টার কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ, ঢাকা।

হোসেন, মোঃ মোশারফ, (২০০৮), *এই প্রথম এই শেষ রাজধানী ঢাকা-বাংলাদেশ*, বিজয় প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা।

হিন্দু শাস্ত্রীয় গ্রন্থঃ

চক্রবর্তী, শিব শঙ্কর, (২০১০), *জ্ঞান মঞ্জরী*, আনন্দ পাবলিশার্স, ঢাকা।

চন্ডী, সুধাময়ী, (১৪০৯), *পুরোহিত দর্পণ*, শ্যামারচরণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা।

তর্করত্ন, আচার্য্য পঞ্চানন সম্পাদিত, (১৩৯২), *গরুড় পুরাণম*, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা।

তর্করত্ন, আচার্য্য পঞ্চানন সম্পাদিত, (১৪০১), *বরাহ পুরাণম*, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা।

তর্করত্ন, শ্রী পঞ্চানন সম্পাদিত, (১৯৯৩), *মনুসংহিতা*, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু সম্পাদনা ও অনুবাদ, (২০০৪), *মনুসংহিতা*, সদেশ, কলকাতা।

ভট্টাচার্য, শ্যামাচরণ, (১৪১২), *শ্রাদ্ধকান্ড পদ্ধতি*, বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, কলকাতা।

মুসলিম শাস্ত্রীয় গ্রন্থঃ

আবদুল্লাহ, শায়খ ওয়ালীউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে, (২০০৮), *মেশকাত শরীফ*, মাওলানা ফজলুর রহমান অনূদিত, মাওলানা মুহাম্মদ ওবায়েদ ইবনে সালেহ সম্পাদিত, মীনা বুক হাউজ, সূত্রাপুর ঢাকা।

আলবানী, মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, (২০১০), *আহকামুল জানায়িয বা জানাযার নিয়ম-কানুন*, হুসাইন বিন সোহ্‌রাব ও শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান অনূদিত, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, নর্থ সাউথ রোড, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাহী, মাওলানা ইউসুফ, (২০০০), *আসান ফেকাহ*, আব্বাস আলী খান অনূদিত ও সম্পাদিত, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

তিরমিযী, ইমাম আবূ ঈসা, (১৯৯৬), *জামে আত-তিরমিযী*, মুহাম্মদ মূসা অনূদিত ও সম্পাদিত, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, (২০০২), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

বুখারী, ইমাম, (২০০০), *সহীহ আল বুখারী*, মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব সম্পাদিত, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

শাহরুখ, মুহাম্মদ নাসীল সংকলিত, (২০১০), *ফিকহুত তাহারা: পবিত্রতা অর্জনের বিধান*, উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রম।

কোষ-গ্রন্থ ও অভিধান:

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন সম্পাদিত, (২০১২), ঢাকা কোষ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, নিমতলী, ঢাকা।

ইসলাম, সিরাজুল সম্পাদিত, (২০০৩), *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, নিমতলী, ঢাকা।

চক্রবর্তী, বরুন কুমার সম্পাদিত, (১৯৯৫), *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা।

মামুন, মুনতাসীর, (২০০৪), *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, প্রথম খন্ড, অন্যন্যা, বাংলা বাজার, ঢাকা।

মামুন, মুনতাসীর, (২০০৯), *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, দ্বিতীয় খন্ড, অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

শহীদুল্লাহ, মুহাম্মদ (প্রধান সম্পাদক), (১৯৯২), *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শহীদুল্লাহ, মুহাম্মদ (প্রধান সম্পাদক), (১৯৬৫), *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি গ্রন্থ:

Ahmed, Sharif uddin & Rabbani, A K M Golam (2010), *Dhaka: A Selected Bibliography,* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka.

Ahmed, Sharif Uddin (ed) (2009), *Dhaka Past Present Future* 2nd ed, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka.

Azam, Khwaja Mahomed (1990), *Tha Panchayat system of Dhaka,* Dhaka City museum, Dhaka.

Banglapedia, Bangla & English combind CD Edition- 2007.

Choudhury, Abdul Momin, (2006), *Site and Surrounding; Hundred years of Bangabhaban*, Press wing Bangabhaban, Dhaka.

Hafiz, Roxana & Rabbani, A K M Golam editor, (2011), *400 Years of Capital Dhaka and Beyond*, Volume III: *Urbanization and Urban Development*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka.

Hassan, Delwar (ed), (2008), *Commercial History of Dhaka,* Dhaka Chamber of Commerce and Industry, Dhaka.

Islam, Md. Anwarul (2010), *Environment of Capital Dhaka Plants Wildlife Gardens Parks Open Spaces Air Water Earthquake,* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka.

Islam, Nazrul (1990), *Dhaka metropltan fring: Land and housing development,* Dhaka City museum, Dhaka.

Khatun, Hafiza (2003), *Dhakaiyas on tha Move,* Academic press and publisheres Ltd, Dhaka.

Rabbani, A K M Golam (1997), *mughal Outpost Dhaka: From to Metropolis,* Dhaka: university press Limited, Dhaka.

Suhrawardy, Shaista (1992), *Behind the Veil,* Oxford University Press, Karachi.

Taifoor, Syed Md (1956), *Glimpses of old Dhaka,* Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

Taylor, James (2010), *A Sketch of the topography ,and statistics of Dacca* 2nd ed, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka.

সংবাদ সাময়িকী/ পত্র-পত্রিকা:

আসাদ, মোহাম্মদ, 'পঞ্চায়েত কবরস্থান', *ত্রৈমাসিক ঢাকা*, ঢাকা, বর্ষ ১, সংখ্যা ৪, ডিসেম্বর ২০০৮।

আসাদুজ্জামান, রব, মোহাম্মদ আব্দুল ও ভূইয়া, মোশারফ হোসেন, 'ঢাকা মহানগরীর বিবর্তনে ভূরূপ তাত্ত্বিক প্রভাব', *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ঢাকা, সংখ্যা ২৩-২৪।

খাতুন, আয়েষা, 'মুসলিম ব্রতাচার', *লোক সংস্কৃতি গবেষণা*, কলকাতা, বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৪, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩।

খাতুন, হাফিজা, 'ঢাকাইয়া পরিবারে অন্তঃনগর অভিগমনে স্ত্রীর সম্পত্তির ভূমিকা', *নগরায়ণে বাংলাদেশ*, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জুলাই ২০০২।

খান, মুহাম্মদ সিদ্দিক, 'প্রাচীন ঢাকা নগরীর মুসলিম সমাজ', *মাহে নও*, বর্ষ ১৫, সংখ্যা ১২, মার্চ ১৯৬৪।

চৌধুরী, আসাদ, 'ঢাকায় যাই রে', *ঢাকা সমিতি স্মরনিকা*, ঢাকা, ৯ এপ্রিল ২০০৪।

চৌধুরী, ফারুখ, 'ঢাকা আমাদের ঢাকা', *ত্রৈমাসিক পথরেখা*, ঢাকা, সপ্তম, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১৪।

নাজিমউদ্দিন, এস এম, 'ঢাকার সেকাল ও একাল', *ঢাকা সমিতি স্মরনিকা*, ঢাকা, ২৮ জুলাই ২০০৭।

পাল, সমর, 'বিয়ের গীতে গালি', *ধমনি*, কলকাতা, সাহিত্য-সংস্কৃতির দ্বিমাসিক পত্রিকা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১ (গালি সংখ্যা), ফেব্রুয়ারি ২০১২।

ফাতেমা, সায়েদা, 'নগর ঢাকা ও তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (১৯১১ পর্যন্ত)', *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ঢাকা, সংখ্যা ৩১-৩২, ১৪১৫-১৬।

ভট্টশালী, নলিনীকান্ত, 'ঢাকা নগরীর জন্ম কথা', *মাসিক বসুমতি*, কার্তিক ১৩৫০।

ভূঁইয়া, নুরুদ্দীন, 'ঢাকার সর্দারদের কথা', *ঢাকা সমিতি স্মরনিকা*, ঢাকা, ৯ এপ্রিল ২০০৪।

মামুন, মুনতাসীর, 'গ্রাম ও শহরঃ ঔপনিবেশিক আমলে পূর্ববঙ্গ', *ত্রৈমাসিক পথরেখা*, ঢাকা, সপ্তম, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১৪।

মামুন, মুনতাসীর, 'ঢাকার জন-এলাকার ইতিহাস', *ত্রৈমাসিক পথরেখা*, ঢাকা, সপ্তম, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১৪।

মাসুদ, রানা মুহম্মদ, 'ঢাকার পঞ্চায়েতঃ ঢাকাবাসীর প্রীতিপূর্ণ ও গৌরবময় অতীত', *ত্রৈমাসিক ঢাকা*, ঢাকা, বর্ষ ১, সংখ্যা ৪, ডিসেম্বর ২০০৮।

মুন্নী, শাহ্নাজ, গায়ে হলুদ, *পাক্ষিক প্রকৃতি*, ঢাকা, বর্ষ ২, সংখ্যা- ১২, ১ এপ্রিল ১৯৯৮।

রফিক, রফিকুল ইসলাম, 'সেকালের ঢাকাঃ উৎসব ও বিনোদন', *ঢাকা সমিতি স্মরনিকা*, ঢাকা, ৯ এপ্রিল ২০০৪।

রহমান, অদিতি, 'ঢাকার বিয়ে', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ৩ এপ্রিল ১৯৯৮।

রহমান, এ কে এম সাইফুর ও শরীফ, আহমেদ, 'ঢাকার ভূমিরূপের ইতিহাসঃ একটি মোগল রাজধানীর প্রাথমিক ভূ-প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যালোচনা', *প্রত্নতত্ত্ব*, সংখ্যা ১৪, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, জুন ২০০৮।

রহমান, সেলিনা, 'আদি ঢাকা ও ঢাকার সংস্কৃতি', *ত্রৈমাসিক ঢাকা*, ঢাকা, বর্ষ ১, সংখ্যা ৩, সেপ্টেম্বর ২০০৮।

শরীফ, আহমদ, 'বাঙালী মুসলিম ও হিন্দুঃ ধর্মসমন্বয়', *লোক সংস্কৃতি গবেষণা*, কলকাতা, বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৪, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩।

শাহনাওয়াজ, এ কে এম, 'প্রাচীন বাংলায় বাঙালীর জীবনধারা ও ধর্মচিন্তা', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ঈদ সংখ্যা ২০১০।

সরকার, দীনেশ চন্দ্র, 'ঢাকা নগরীর নাম', *লোক*, ঢাকা, ক্রোড়পত্রঃ বাংলার জনপদ, সাধারণ সংখ্যা, নভেম্বর ২০০২।

সরকার, যতীন, 'বাঙালি সমাজে লোকধর্মের প্রভাব', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, বর্ষ ৫২, সংখ্যা ২, এপ্রিল-জুন ২০০৮।

সাহা, চয়নিকা, 'বিয়েঃ হিন্দু রীতি', *সচিত্র বাংলাদেশ*, ঢাকা, নভেম্বর ১-১৫, ২০০৮।

সুর, অতুল, 'বাঙালী মুসলমানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়', *লোক সংস্কৃতি গবেষণা*, কলকাতা, বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৪, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩।

হাননান, মোহাম্মদ, 'হারিয়ে যাচ্ছে বিয়ের রীতিনীতি', *সচিত্র বাংলাদেশ*, ঢাকা, নভেম্বর ১-১৫, ২০০৪।

হাফিজ, বাদরিয়া বিনতে , 'মুমূর্ষর প্রতি কর্তব্য ও মৃতের গোসল', *জায়া জননী*, ঢাকা, সংখ্যা ২, বর্ষ ২, ৩১ জুলাই ২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

হাসান, খন্দকার মাহমুদুল, 'ঢাকার হারিয়ে যাওয়া খাল-নদী', *সাপ্তাহিক ২০০০*, ঢাকা, ঈদ সংখ্যা ২০১২।

হোসেন, মিল্লাত, আহমদ, তানজিল ও শাওন, আলী আসিফ, 'বেকার হযে পড়েছে ডিসিসির ডোম', *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ৮ নভেম্বর ২০০৯।

হোসেন, মিল্লাত, 'নগর ঐতিহ্য: রকমারি শরবতের কথা' *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ঢাকায় থাকি পৃষ্ঠা, ৩০ আগাস্ট ২০০৯।

অপ্রকাশিত রচনা:

দাস, গৌরাঙ্গ লাল, (২০০৮), *বিবাহ*।

দাস, গৌরাঙ্গ লাল, (২০০৮), *সিঁদুর শাঁখা ও নোয়া*।

বাতুল, কানিজ-ই, (২০১০), *ঢাকার সংস্কৃতি*।

অভিসন্দর্ভ:

ইসলাম, হাবিবা, *পুরনো ঢাকার আচার অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস*, এম. ফিল অভিসন্দর্ভ, মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, অক্টোবর ২০০১।

জাহান, সৈয়দা নওয়ারা, *ঢাকা শহরের জনসংখ্যার ধরণ: একটি প্রায়োগিক সমীক্ষা*, এস. এস. সি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৭।

সিরাজী, জীনাত আরা, *ঢাকার শিয়া সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি এবং উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যে তাদের অবদান*, এম. ফিল অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ওয়েব সাইট:

www.dhakacity.org/graveyard

http://www.dhakatown.net/

http://Entourage-bd.com

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য প্রদানকারীর তালিকা

নাম	বয়স	পেশা/পদবী	এলাকা
আক্তারী বেগম	৬৭	গৃহিণী	শেখ সাহেব বাজার
আঙ্গুরি বিবি	৮০	গৃহিণী	নবাবগঞ্জ
আঙ্গুরী বেগম	৬৫	গৃহিণী	আমলিগোলা
আজিমবক্স	৬৫	মাওলা বক্স সর্দারের ছেলে	ফরাশগঞ্জ
আনন্দময় সুর	৫৭	শঙ্খবণিক	শাঁখারীবাজার
আনসারি বেগম	৬৫	গৃহিণী	খাজে দেওয়ান
আনার বেগম	৮৪	গৃহিণী	বংশাল
আনোয়ার হোসেন	৭২	শিল্পপতি	আমলিগোলা
আনোরা বেগম	৬০	ঘটক	নবাবগঞ্জ
আফসানি বেগম	৯৫	গৃহিণী	রহমতগঞ্জ
আমিনা	৫৮	নালানয়ালি	নবাবগঞ্জ
আয়মন নেছা	১০০	গৃহিণী	আমলিগোলা
আরফাননেসা	৮৪	গৃহিণী	আমলিগোলা
আলতাফ হোসেন	৫৭	ব্যবসায়ী	আমলিগোলা
আলাউদ্দিন মালিক	৫৪	শিল্পপতি	উর্দুরোড
আশরাফউদ্দিন মালিক	৬০	ব্যবসায়ী	উর্দুরোড
আশালতা	৭৫	গৃহিণী	পশ্চিম ঋষিপাড়া
আহাম্মদি আক্তার	৬৫	সেলাই প্রশিক্ষিকা	বুদ্দুপাড়া আমলিগোলা
ইয়াসমিন বেগম	৩২	রান্না প্রশিক্ষক	নবাবগঞ্জ
উর্মিলা দাস	৬৭	বৈষ্ণবী	পূর্ব ঋষি পাড়া
কল্পনা ঘোষ	৪২	গৃহিণী	উমেশ দত্ত রোড
কল্পনা রানি	৪৩	গৃহিনী	পশ্চিম ঋষিপাড়া
কানন বালা নন্দি	৬৭	গৃহিণী	শাঁখারী বাজার
কামালউদ্দিন মালিক	৫৭	শিল্পপতি	উর্দুরোড
কৃষ্ণ সুর	৫৫	কারিগর	শাঁখারী বাজার
খোতেজা বেগম	৮০	গৃহিণী	চৌধুরী বাজার
খোশনাহার	৫৭	গৃহিণী	হাজারীবাগ
গুলশানারা	৪৫	সেলাই প্রশিক্ষক	নবাবগঞ্জ
গোল নাহার	৭৫	গৃহিণী	নিমতলী
জরিনা বিবি	১০০	গৃহিণী	হাজারীবাগ
জাহানারা বেবী	৪৭	গৃহিণী	ইসলামপুর

জাহিদ হোসেন	৪৭	ব্যবসায়ী	আমলিগোলা
জুইমা	৭৫	হিজরা	জগন্নাথ সাহা রোড
জুম্মন মিয়া	৭৫	ক্বাসীদা গায়ক	মিডফোর্ট
জেসমিন	৭৫	বাবুর্চি	আমলিগোলা
তহুরা খানম	৬৬	গৃহিণী	সাতরোজা
তৃপ্তি সাহা	৩৭	গৃহিণী	বালুরঘাট
তোরনী ঘোষ	৮০	গৃহিণী	জয়নাগ রোড
দিপক কুমার নাগ	৬০	ব্যবসায়ী	শাঁখারী বাজার
দীপু সাহা	৬৩	গৃহিণী	লক্ষিবাজার
দেব নারায়ণ ঘোষ	৫৯	ব্যবসা	জয়নাগ রোড
দোলারি	৮০	গৃহিণী	চুড়িহাট্টা
নরেশ	৬২	ধোপা	উমেশ দত্ত রোড
নাঈমা ইশবাল	৪৩	গৃহিণী	আমলিগোলা
নাগিনা	৬৫	গৃহিণী	আমলিগোলা
নাজমা খানম	৬২	গৃহিণী	উর্দুরোড
নাজির হোসেন নাজির	৭০	মাজেদ সর্দারের ছেলে	নাজিরা বাজার
নারায়ণ শর্মা	৭৮	ব্রাহ্মণ পুরোহিত	জগন্নাথ সাহা রোড
নাসিমা পারভীন	৩৭	চাকুরী	হাজারীবাগ
নুরজাহান	৭০	গৃহিণী	চুড়িহাট্টি
নুরুন নাহার	৫৩	গৃহিণী	আরমানিটোলা
নুরুন্নাহার	৫৮	গৃহিণী	হাজারীবাগ
নুরুন্নাহার বিবি	৭০	মিসেস কাদের সর্দার	ইসলামপুর
নেকলেস বেগম	৬৩	নালানয়ালি	নবাবগঞ্জ
নেপাল বাবু	৭০	ধোপা	উমেশ দত্ত রোড
পিয়ারি বেগম	৭৫	গৃহিণী	চুড়িহাট্টা
পূন্নি বালা দাসি	৪৮	ধোবানী	উমেশ দত্ত রোড
পেয়ারি বেগম	৫৭	গৃহিণী	আগামাছি লেন
ফরিদা পারভিন	৫৬	চাকুরী	বালুরঘাট
ফাতেমা আক্তার	৫০	গৃহিণী	আমলিগোলা
ফাতেমা জাকির	৪৩	গৃহিণী	হাজারিবাগ
ফাতেমা বেগম	৫৭	গৃহিণী	বেগম বাজার
ফিরোজা	৭৫	গৃহিণী	সাতরোজা
ফুলি বেগম	৭৭	গৃহিণী	আমলিগোলা
ফেরদোস জাহান	৫৩	গৃহিণী	চুড়িহাট্টা
বশিরন	৬০	আরবী ওস্তাদমা	আমলিগোলা

বিদ্যুত কুমার নাগ	৫১	মালিক	কল্পনা বোর্ডিং ও হোটেল শাঁখারীবাজার
বিবি	৬৫	গৃহিণী	বালুরঘাট
বিবি আয়েশা	৯০	গৃহিণী	রহমতগঞ্জ
বিবি মরিয়ম	৫৭	গৃহিণী	চকবাজার
বিরেশ চন্দ্র সাহা	৬৬	সভাপতি	মহানগরী সার্বজনিন পূজা কমিটি
মনজুরুল আলম	৬৫	চাকুরী	উর্দুরোড
মনি রানী	৫৫	গৃহিণী	পূর্ব ঋষিপাড়া
মনিরালা	৫৭	গৃহিনী	ওয়াইজঘাট
মনোরা	৬০	নালানয়ালি	নবাবগঞ্জ
মালতি ঘোষ	৬৩	গৃহিণী	কমল দহ রোড
মাহফুজা আলম	৪৫	গৃহিণী	হাজারীবাগ
মাহমুদা রহমান মিতু	৩৭	গৃহিণী	নবাবগঞ্জ
মাহেবুব	৭৬	ব্যবসা	বেগম বাজার
মাহেলা বেগম	৫৩	গৃহিণী	খাজে দেওয়ান
মিতালি নাগ	৪০	গৃহিণী	শাঁখারী বাজার
মিনতি বালা	৭৫	গৃহিণী	শাঁখারী বাজার
মিনা	৬০	গৃহিণী	নবাবগঞ্জ
মেহজাবিন	৪১	গৃহিণী	বেচারাম ডেররি
মেহেরুনন্নেসা	৮৪	গৃহিণী	হাজারীবাগ
মোনালিসা মনি	৩৩	গৃহিণী	ওয়াইজঘাট
মোসতারি বেগম	৬১	গৃহিণী	তাতীবাজার
মোহাম্মদ হোসেন	৮৩	শিল্পপতি	আমলিগোলা
মোহাম্মাদ হারুন	৭৩	ব্যবসায়ী	রহমতগঞ্জ
রতন মালা নাগ	৭৬	গৃহিণী	শাঁখারীবাজার
রনজিৎ ঘোষ	৬৫	ব্যবসায়ী	কমল দহ রোড
রূপবানু	৭২	গৃহিণী	বংশাল
রুমা	৪৮	ধোবানী	উমেশ দত্ত রোড
রুমা ঘোষ	৪৩	গৃহিণী	কায়েৎটুলি
রুমা দাস	৫২	ধোবানী	ঢাকেশ্বরী
রাজিয়া বেগম	৬৫	গৃহিণী	নবাবগঞ্জ
রাজিয়া বেগম	৬৫	গৃহিণী	লালবাগ
রাফিয়া খাতুন	৪৫	গৃহিণী	বংশাল
রামা নন্দ দাস	৫৯	সভাপতি ও মাতব্বর	পশ্চিম ঋষিপাড়া পঞ্চায়েত

			ও মন্দির কমিটি
রাশিদা খাতুন	৭৩	গৃহিণী	পোস্তা
রাশিদা বেগম	৬৪	গৃহিণী	ইমামগঞ্জ
রিনা রানি	৩৩	গৃহিণী	পশ্চিম ঋষিপাড়া
রেখা রানি ঘোষ	৬৩	গৃহিণী	কায়েৎটুলি
রোকসানা	৫৪	গৃহিণী	নাজিমউদ্দিন রোড
লালে বেগম	৭৭	গৃহিণী	বংশাল
শনিষ্ঠ	৫৭	গৃহিণী	পূর্ব ঋষি পাড়া
শফিউল্লা	৬০	দারোয়ান	আমলিগোলা
শরফুদ্দিন	৬১	ব্যবসায়ী	কলতা বাজার
শান্তা ঘোষ	২০	ছাত্রী	জয়নাগ রোড
শান্তি	৬৩	গৃহিণী	পূর্ব ঋষি পাড়া
শান্তি রানি	৪৮	গৃহিনী	পূর্ব ঋষিপাড়া
শাবনাম	৬২	গৃহিণী	রাসা বাজার
শাহীন আক্তার	৪৮	লেখিকা	আমলিগোলা
শিপ্রা রানী দাস	৫৫	কমিউনিটি মিডওয়াইফ	পূর্ব ঋষিপাড়া
শিবলাল চক্রবর্তী	৫৫	ধোপা	উমেশ দত্ত রোড
শিলা চক্রবর্তী	৫৫	ধোপা	উমেশ দত্ত রোড
শিলা সাহা	৫৩	গৃহিণী	বালুরঘাট
শ্রী মনি	৬৫	ধোবানী	উমেশ দত্ত রোড
সঞ্জয় ঘোষ	৩৯	ব্যবসায়ী	জয়নাগ রোড
সত্যজিৎ ঘোষ	৫২	ব্যবসায়ী	কমল দহ রোড
সমিরন	৫৭	গৃহিণী	ভাট মসজিদ
সম্পা সাহা	৩৭	গৃহিণী	বালুরঘাট
সরস্বতি	৪৩	গৃহিণী	পূর্ব ঋষিপাড়া
সাকিয়া জামাল	৪৫	সেলাই প্রশিক্ষিকা	জগন্নাথ সাহা রোড
সাগরিকা	৫১	গৃহিণী	শাঁখারিবাজার
সানন্দা সুর ঝিলিক	২৬	ছাত্রী	শাঁখারী বাজার
সাবিনা বেগম	৫৪	গৃহিণী	শেখ সাহেব বাজার
সাবেরা বেগম	৫৬	গৃহিণী	বংশাল
সামসুদ্দিন	৮২	ব্যবসায়ী	নাজিরা বাজার
সায়মা	২৮	শিক্ষিকা	নবাবগঞ্জ
সায়ান সুর	২৩	ছাত্র	শাখারীবাজার
সালাউদ্দিন	৬৫	ব্যবসায়ী	রাসা বাজার
সালেহা	৬০	আয়া	আমলিগোলা

Dhaka University Institutional Repository

সাহানি	৬৫	গৃহিণী	খাজে দেওয়ান
সুকলা নাগ	৪৫	গৃহিণী	শাঁখারী বাজার
সুক্রানি	৪৪	গৃহিণী	পূর্ব ঋষিপাড়া
সুধারাণী সুর	৯০	গৃহিণী	শাঁখারী বাজার
সুফিয়া বেগম	৮০	গৃহিণী	লালবাগ
সুমন্ত চন্দ্র দাস	৭৬	সভাপতি ও মাতব্বর	পূর্ব ঋষিপাড়া পঞ্চায়েত ও মন্দির কমিটি
সুমিত্রা	৫৮	গৃহিণী	নগরবেলতলী লেন
সুরাইয়া	৬৫	গৃহিণী	শেখ সাহেব বাজার
সুলতানারা	৭৫	গৃহিণী	মৌলভীবাজার
সেতারা	৬৭	গৃহিণী	লালবাগ
সেলিনা শাজাহান	৩৬	গৃহিণী	নাজিমউদ্দিন রোড
সেলিমা রহমান	৬৫	গৃহিণী	উর্দুরোড
সোনাবানু	৭৪	গৃহিণী	মৌলভীবাজার
সোলকা রানি	৪৫	গৃহিণী	পশ্চিম ঋষিপাড়া
সোহাগ বালা	৭০	ধোবানী	উমেশ দত্ত রোড
স্বপন ঘোষ	৩৫	ব্যবসায়ী	কমল দহ রোড
হাজি আলতাফ হোসেন		সাবেক ওয়ার্ড কমিশনার	আমলিগোলা
হাজি লাট মিয়া	৭৬	ব্যবসায়ী	চুড়িহাট্টা
হাজিরা বেগম	৪৫	গৃহিণী	ভাট মসজিদ
হাজেরা বেগম	৯০	গৃহিণী	কেরানীগঞ্জ
হানিফা	৭০	গৃহিণী	সিদ্দিক বাজার
হাফিজা বেগম	৪৫	গৃহিণী	ভাট মসজিদ
হাবিবুর রহমান	৮১	ব্যবসায়ী	উর্দুরোড
হাসনা হেনা	৪৭	গৃহিণী	সিদ্দিক বাজার
হাসমি বেগম	৬০	গৃহিণী	ইসলামপুর
হিরা বেগম	৫০	গৃহিণী	নবাবগঞ্জ
হেলেন সরকার	৫২	শিক্ষিকা	আমলিগোলা
হোসনা বানু	৫৮	গৃহিণী	রহমতগঞ্জ
হোসেন আক্তার	৫৭	শিল্পপতি	আমলিগোলা

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রমালা

Dhaka University Institutional Repository

সাতোশা

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ আমলে পিতলের ছোট বদনায় নবজাতককে দুধ পান করানো হত

Dhaka University Institutional Repository

ছটিঘর

Dhaka University Institutional Repository

নবজাতকের গোসল

Dhaka University Institutional Repository

ছটির অনুষ্ঠান

Dhaka University Institutional Repository

অন্নপ্রাশন

মাসি ও কাকিরা শিশুকে হলদি স্নান করাচ্ছে

মন্দিরে শিশু পুরোহিতের কোলে

শিশুর মুখে অন্ন তুলে দেয়া হচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

মামা ভাত অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিশুর মামাকে সাজাচ্ছে মাসিরা

শিশুর জ্যেষ্ঠ মামা শিশুকে কোলে নিয়ে খাওয়াচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

গড়গড়া অনুষ্ঠান

Dhaka University Institutional Repository

জন্মদিন

মুসলিম পরিবারে শিশুর জন্মদিন

হিন্দু পরিবারে কেক কাটার পূর্বে ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ

Dhaka University Institutional Repository

মানতি চুল

Dhaka University Institutional Repository

বিসমিল্লানে সাবাক বা বিসমিল্লায় বসান

Dhaka University Institutional Repository

কান ছেদাই অনুষ্ঠান

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানি বা সুন্নাতে খতনা

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

রঙ খেলা

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

শুভ বিবাহ

মুসলমান সম্প্রদায়ের বিয়ের চিত্রমালা

Dhaka University Institutional Repository

বাতপাক্কা বা কথাপাকা

Dhaka University Institutional Repository

রূপার খোপার কাটা ও রূপার মল

ব্রিটিশ আমলের বিয়ের শাড়ি

Dhaka University Institutional Repository

রূপার জরিতে কারুকার্য করা ব্লাউজ

Dhaka University Institutional Repository

রূপার নেউতাবাটা, পানদান ও পান পরিবেশনকারী পাত্র ।

কাঠের অলংকার বকস্

বিয়ের নথ

Dhaka University Institutional Repository

সোন্দা কুটাই

দই-মাছ

Dhaka University Institutional Repository

গায়ে হলুদ

গায়ে হলুদের আসন

Dhaka University Institutional Repository

অতিথিদের বরণের উদ্দেশ্যে অপেক্ষারত নারীরা

প্রতিপক্ষকে ব্যঙ্গ করে সংগীত পরিবেশন

Dhaka University Institutional Repository

কনের গায়ে হলুদ

Dhaka University Institutional Repository

বরের গায়ে হলুদ

Dhaka University Institutional Repository

গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ

Dhaka University Institutional Repository

গায়ে হলুদের রাতে নাচ-গান পরিবেশন

Dhaka University Institutional Repository

সধবা নারীরা বরের গায়ে হলুদ মাখাচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

বরের হাতে মেহেদী

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ে

বিয়ের দিন নাপিত কর্তৃক বর ও তার ভাইদের ক্ষৌর কর্ম সম্পন্ন

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের দিন ভাবীরা কোলে করে বরকে গোসল করাতে নিয়ে যাচ্ছে

বিয়ের গোসলের পূর্বে শেষ তেলাই সম্পন্ন

Dhaka University Institutional Repository

বর স্নান

বরের মায়ের 'নখ খুটা'

Dhaka University Institutional Repository

স্নান শেষে বরের মায়ের নযর নামানো

বন্ধুরা বরকে কোলে করে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

দুলাভাই ও বন্ধুরা বরকে শেরওয়ানি পরিধান করাচ্ছে

দই মংগল

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ যাত্রার প্রাক্কালে বর মায়ের মাথায় তেল মাখছে

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ে বাড়ি

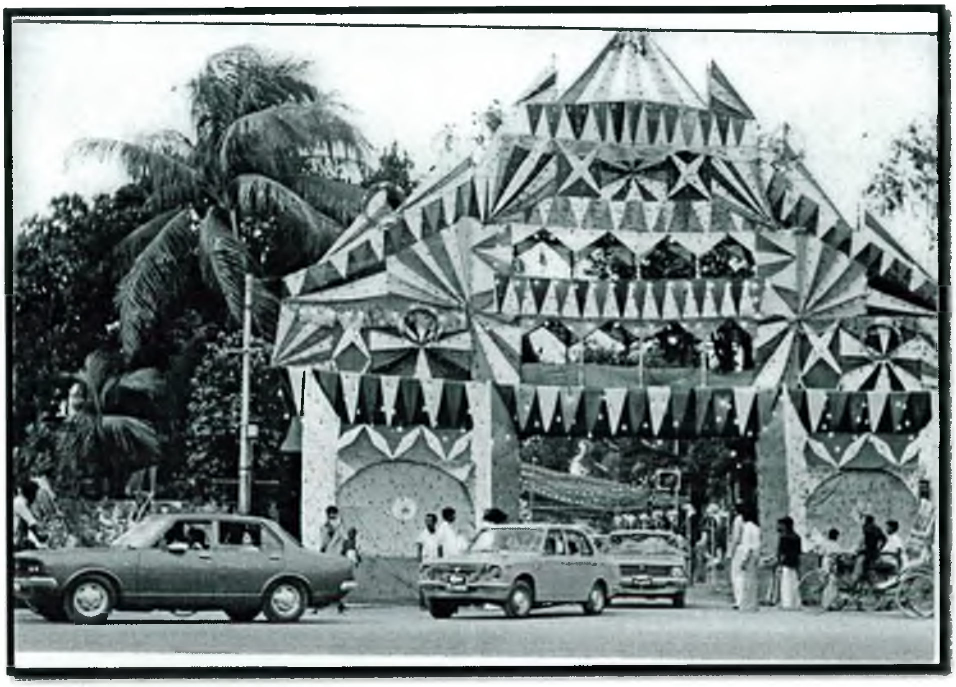

Dhaka University Institutional Repository

অতিথি বরণ

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ে বাড়ির অতিথি

Dhaka University Institutional Repository

কনে সাজ

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের রান্না

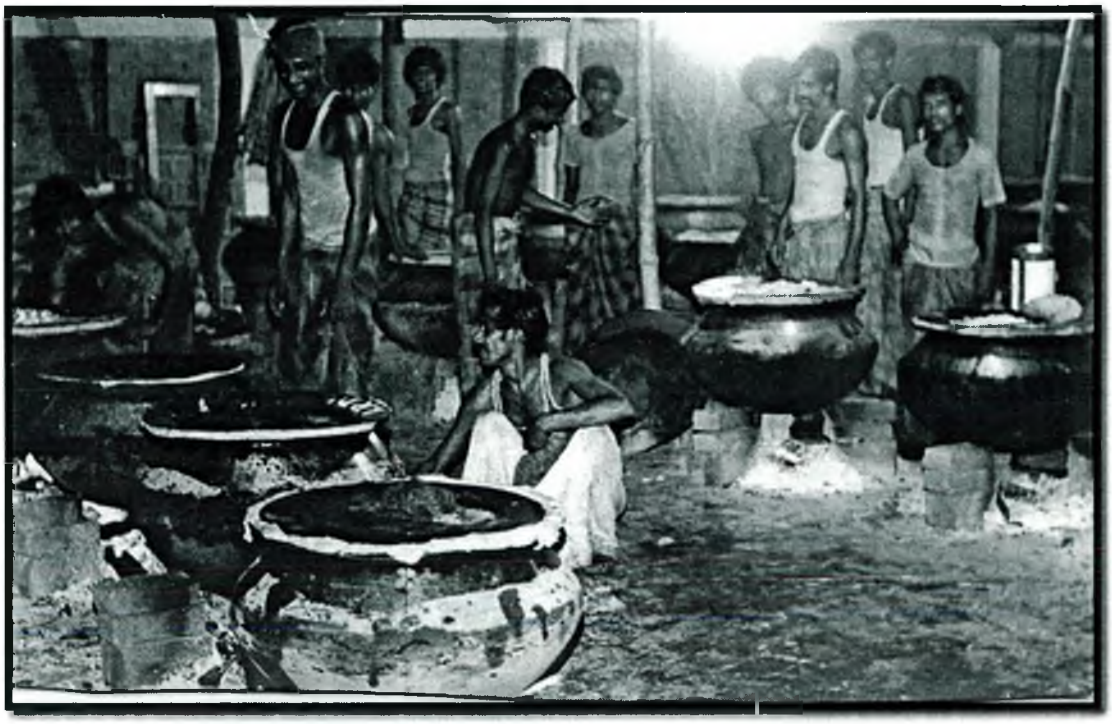

Dhaka University Institutional Repository

বর আগমন

Dhaka University Institutional Repository

বর অভ্যর্থনা

বর বরণ

Dhaka University Institutional Repository

কনের সম্মতি গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

অতিথি আপ্যায়ন

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষীরবুজনি বা ক্ষীরমুজনি

কনে বিদাই

Dhaka University Institutional Repository

বধূবরণ

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের পোষাকে হুরবানু ও খাজা আজাদ

উৎস: অনুপম হায়াৎ, নওয়াব পরিবারের ডায়েরিতে ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি, পৃঃ২৭।

মাজেদ সর্দারের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাজির হোসেন নাজিরের বিবাহ দিনের ছবি

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ের চিত্রমালা

Dhaka University Institutional Repository

শাঁখারীদের ইন্দ্রহলুদ অনুষ্ঠান

Dhaka University Institutional Repository

কনেপক্ষের সধবারা জামাইছানের পর বরকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে

বৃদ্ধি অনুষ্ঠানে মৃত পিতৃপুরুষের নামে জল ও পিন্ড দান

Dhaka University Institutional Repository

কোল লওনী অনুষ্ঠানে বরকে কোলে নিয়ে আশীর্বাদ

বর সজ্জা

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ যাত্রার পূর্বে মায়ের হাতে বরের সন্দেস ও দুধ পান

বরযাত্রী

Dhaka University Institutional Repository

দর্পন হাতে শাঁখারী বর

বিবাহ মন্ডপে কনের পিতা কর্তৃক দান কার্য অনুষ্ঠিত

Dhaka University Institutional Repository

দানের বস্ত্র বরকে পরিধান করাচ্ছে বরের দুলাভাই ও বন্ধুরা

ঘিয়ের প্রদীপ দিয়ে কনের বরকে বরণ

Dhaka University Institutional Repository

বরের বিয়ের পিঁড়ির চারপাশ কনের সাত প্রদক্ষিণ

মালাবদল

Dhaka University Institutional Repository

কন্যাদান

Dhaka University Institutional Repository

কড়ি ও পাশা খেলা

Dhaka University Institutional Repository

বরযাত্রীদের আপ্যায়ন

নববধূসহ স্ব গৃহে বরের প্রত্যাবর্তন। বাড়ির সদর দরজায় বরের হলুদের ধূতি বিছানো।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ষীয় নারীরা সংগীত পরিবেশন রত

বরের মা কর্তৃক বধূবরণ

Dhaka University Institutional Repository

ভাত কাপড় অনুষ্ঠান

Dhaka University Institutional Repository

ভাত কাপড় অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে নববধূর আহার্য গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

শাঁখারীদের বৌভাত অনুষ্ঠান

Dhaka University Institutional Repository

আশীর্বাদ

সাহা কনেকে গুরুদেবের আশীর্বাদ

কনেকে শাশুড়ির আশীর্বাদ

Dhaka University Institutional Repository

সাহা'দের গায়ে হলুদ

বর সজ্জা

Dhaka University Institutional Repository

বর যাত্রার পূর্বে মায়ের কোলে বসে দুধ পান

দর্পন হাতে বরের আগমন

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের সদরে বর

বিবাহ মন্ডপে যাবার পূর্বে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের আশীর্বাদ

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ আসরে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাথে বরের মন্ত্র উচ্চারণ

বিয়ের পাড়ানোর আগ মুহূর্তে

Dhaka University Institutional Repository

রসিকতা সম্পর্কীয়রা বরকে বিয়ের পিঁড়িতে তুলছে

বিয়ের পিড়িতে বর-কনে

Dhaka University Institutional Repository

বরের চারপাশে কনের প্রদক্ষিণ

মালা বদল

Dhaka University Institutional Repository

কন্যাদানের প্রাক্কালে পুরোহিতের মন্ত্র পাঠ

কন্যাদান

Dhaka University Institutional Repository

কলাগাছের চারপাশ সাতপাকে ঘোরা

বিয়ের যজ্ঞ আগুনে বর-কনের খই ছিটানো

Dhaka University Institutional Repository

বর কর্তৃক নববধূর সিঁথিতে সিঁদুর প্রদান

Dhaka University Institutional Repository

বাসী বিয়ে

বাসী বিয়ের যজ্ঞানুষ্ঠান

বাসী বিয়ে সম্পন্নের পর পুরোহিতকে প্রণাম

Dhaka University Institutional Repository

বাসী বিয়ে সম্পন্নের পর বর-কনের সামনে খাদ্য পরিবেশন

বাসী বিয়ের পর শ্বশুড়ালয়ে যাত্রা প্রাক্কালে বরের হাতে নববধূর অন্ন গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

মায়ের পুত্র ও পুত্রবধূকে বরণ

শাশুড়ি হাতে পুত্রবধূর জল পান

Dhaka University Institutional Repository

বাসী বিয়ের পরদিন শ্বশুড়ালয়ে নববধূর মাছ কাটা

Dhaka University Institutional Repository

বৌভাত অনুষ্ঠান

Dhaka University Institutional Repository

বৌভাতে আগত অতিথিদের আপ্যায়ন